সালজুক রাজত্বের ইতিহাস

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

সালজুক রাজত্বের ইতিহাস

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ মোজাম্মেল হক

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা-খুলনা-চট্টগ্রাম

www.bjilibrary.com

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ২৩ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২৬০

স্বত্ব ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী

১ম প্রকাশ

রজব	১৪২০
কার্তিক	১৪০৬
নভেম্বর	১৯৯৯

বিনিময় ঃ ১২০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

سلاجقه -এর বাংলা অনুবাদ

SALJUK RAJTTAR ETIHASH by Sayeed Abul A'la Moudoodi. Translatred by Mohammad Mozammal Hoque Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 120.00 Only.

www.bjilibrary.com

সূচীপত্র

ভূমিকা

সালজুক ইতিহাসের ভিন্ন যুগ ৭
আব্বাসীয় রাজত্বের পতন ৯
সালতানাতের ক্রমাবনতি ১০
তাহেরিয়া ১২
তুলুনিয়া ১২
সাফ্ফারিয়া ১২
আলাবিয়া ১৩
সামানিয়া ১৩
সাজিয়া ১৩
যাইয়ারিয়া ১৪
ইখশেদিয়া ১৪
খিলাফতের এখতিয়ারসমূহের বিভক্তি ১৪
উমাইয়াদের খিলাফত দাবী ১৫
বুয়াই খান্দানের উত্থান ১৫
ফাতেমীদের উত্থান ১৭
গজনবী শক্তি ১৭
সালজুকদের আগমন ১৮
সালজুক শাসনের প্রথম দিকে ইসলামী দুনিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা ১৮
সালজুকদের আগমনে যে বিপ্লব সাধিত হয়েছিল ১৯
সালজুকদের বৈশিষ্ট্যসমূহ ২০
আব্বাসীয় খলীফাদের সাথে সম্পর্ক ২২
সালজুকদের পতন ২৩
বাতেনী আন্দোলন ২৪
ক্রুসেড যুদ্ধের শুরু ২৪
সালজুকদের ধ্বংস ২৫
সালজুক শাসনের ছয়টি যুগ ২৬

সালজুক ইতিহাসের উৎসসমূহ

১. তারীখে বায়হাকী ২৯
২. যায়নুল আকবার ৩০
৩. যুবদাতুন নুসরা ৩০
৪. রাহাতুস সুদুর ৩১
৫. তারীখুল কামেল ৩২
৬. ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান ৩৩
৭. আল মুখতাসার ফী আখবারিল বাশার ৩৩
৮. তারীখে গুযীদাহ ৩৩
৯. রওজাতুস সাফা ৩৪
১০. হাবীবুস সিয়ার ৩৪
১১. মুখতাসার সালজুকনামা ৩৪
১২. তারীখে সালাজুকায়ে কিরমান ৩৫
১৩. তবকাতে নাসেরী ৩৫
মানচিত্রের ভৌগলিক ব্যাখ্যা ৩৭
খাযলাজিয়া বা খারলুখিয়া অঞ্চল ৩৭
তুগুযগুয বা তাগাযগায অঞ্চল ৩৭
কিরঘিয অঞ্চল ৩৮
কায়মাকিয়া অঞ্চল বা কায়মাকদের অঞ্চল ৩৮
দিয়ারে গুযযিয়া বা গুযদের অঞ্চল ৩৮

www.bjilibrary.com

প্রথম অধ্যায়
আবির্ভাব যুগ
(চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগ)

সালজুক খান্দানের বংশ পরিচয়	৪১
গুয কওমের অবস্থা	৪১
সালজুকের পিতার পরিচয়	৪৩
সালজুকের প্রাথমিক জীবন	৪৩
দেশ ছেড়ে হিজরত	৪৪
ইসলামী ভূখণ্ডে আগমন	৪৫
সালজুকের ইসলাম গ্রহণ	৪৫
প্রভাব প্রতিপত্তির বিস্তার	৪৬
সালজুকের মৃত্যু	৪৭
সালজুকের সন্তান	৪৭
তুগরুল বেগ এবং চাগরী বেগের অবস্থা	৪৮
সামানিয়া সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি	৪৯
মধ্য এশিয়ায় তুর্কীদের যুগ	৫১
মাহমুদ গযনবীর আগমন	৫২
আরসালান ইবনে সালজুকের গ্রেফতারী	৫৩
আরসালানের কওমের লোকদের খুরাসানে প্রবেশ	৫৫
খোরাসানে তাদের বিদ্রোহ	৫৬
মাহমুদের ইনতিকাল ও মাসউদের সিংহাসন লাভ	৫৭
সালজুক তুর্কমানদের সাথে মাসউদের আচরণ	৫৮
তগরুল বেগ ও আলী তগীন খাঁর লড়াই	৬১
গযনবীদের বিরুদ্ধে উভয়ের ঐক্য	৬২
বোখারার ওপর আলতুনতাশের হামলা	৬২
হারুন ইবনে আল্‌তুনতাশের বিদ্রোহ	৬৩
হারুন এবং সালজুকদের ঐক্য	৬৩
সালজুকদের ওপর শাহ মালেকের হামলা	৬৪
খাওয়ারিজম শাহের হত্যা	৬৫
মাসউদের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভুল	৬৫
সালজুকদের খোরাসানে আগমন	৬৮
গযনবীদের অস্বস্তি	৭০
পরামর্শ সভা	৭১
সালজুকদেরকে বহিষ্কারের ফন্দি	৭২
যুদ্ধ এবং গজনবীদের পরাজয়	৭৩
অস্থায়ী সন্ধি	৭৫
সন্ধির প্রভাব	৭৭
গোলযোগের পুনরাবৃত্তি	৭৮
আরো দাবী-দাওয়া	৭৯
গজনবী আমীর উমরাদের অবহেলা	৮০
ভারতবর্ষ আক্রমণ ও তার ফলাফল	৮০
চূড়ান্ত যুদ্ধ	৮১
নিশাপুরে তুগরীলের সিংহাসনে আরোহণ	৮২
এক নজরে উত্থান যুগ	৮৩

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রতিষ্ঠা যুগ ঃ তুগরীল বেগ
৪২৯ হিজরী থেকে ৪৫৫ হিজরী
১০৩৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১০৬৩ খৃষ্টাব্দ

নিশাপুরে তুগরীলের দরবার	৮৭
শান্তি প্রতিষ্ঠা	৮৮
মাসউদ কর্তৃক খুরাসান পুনরুদ্ধারের শেষ চেষ্টা	৮৯
ক্রমাগত ভুল	৯০
উলিয়াবাদের যুদ্ধ	৯১
সালজুকদের যুদ্ধ সম্মেলন	৯২
তাল্‌খ আবের যুদ্ধ	৯৩
যে বিজয় পরিণতিতে পরাজয়	৯৪
সন্ধির জন্য আলোচনা	৯৪
যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি	৯৭
মাসউদের নিশাপুরে প্রবেশ	৯৮
করুণ প্রত্যাবর্তন	৯৯
মাসউদের চরম পরাজয়	১০০
তুগরীলের শাহী ঘোষণা	১০১
খলীফার কাছে আবেদন	১০২
দেশের বিভক্তি	১০৩
বলখ বিজয়	১০৪
খাওয়ারিজম অধিকার	১০৭
রায়, হামদান, জুরজান ও তাবারিস্তান অধিকার	১০৮
জিবাল অধিকার	১০৯
বুওয়াইহিয়া শাসনের সাথে সমঝোতা	১০৯
সন্ধি চুক্তির নবায়ন	১১১
রোমান ও আবখাযদের সাথে যুদ্ধ	১১৩
বুয়াইহিয়া খান্দানে অনৈক্য	১১৪
ইস্পাহান বিজয়	১১৫
একের পর এক গৃহযুদ্ধ	১১৬
খলীফার দরবারে সালজুক দূত	১১৭
আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া বিজয়	১১৭
বাসাসিরীর সৃষ্ট গোলযোগ	১১৮
তুগরীলের বাগদাদ অধিকার	১২০
বুয়াইহিয়া খান্দানের শাসনের অবসান	১২২
খলীফার খান্দানের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক	১২৩
বাসাসিরীর গোলযোগ	১২৪
খলীফার সাথে তুগরীলের সাক্ষাত	১২৫
ইবরাহীম ঈনালের বিদ্রোহ	১২৬
বাসাসিরীর বাগদাদ অধিকার	১২৭
বাসাসিরীর উৎখাত এবং খলিফার বাগদাদ প্রত্যাবর্তন	১২৮
ইরাকের দিওয়ানী	১৩০
খলীফার কন্যার সাথে তুগরীলের বিবাহ	১৩০
কন্যা বিদায়	১৩৩
তুগরীলের মৃত্যু	১৩৪
তুগরীলের চরিত্র	১৩৪
তুগরীলের সাফল্যের কারণসমূহ	১৩৬
তুগরীলের সালতানাতের ব্যবস্থাপনা	১৩৬

তৃতীয় অধ্যায়

উত্থান যুগ ঃ আল্প আরসালান

৪৫৫ হিজরী থেকে ৪৬৫ হিজরী

১০৬৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১০৭২ খৃষ্টাব্দ

বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধের মূলোৎপাটন ১৪২
রায় অধিকার এবং আমীদুল মালেকের গ্রেফতারী ১৪৩
বাগদাদে খুতবা পাঠ ১৪৩
খৃষ্টান আর্মেনিয়া এবং গুর্জিস্থানের ওপর আক্রমণ ১৪৪
মধ্য এশিয়া (ট্রান্স অক্সাইন) ও তুর্কিস্থান ১৪৬
মালেক শাহের অভিষেক ১৪৬
কিরমান ও ফারেসের বিদ্রোহ ১৪৭
শাম, হিজাজ ও ইয়ামানের ওপর সালজুকদের প্রভাব ১৪৮
রোমের কাইজারের সাথে যুদ্ধ ১৫১
খলীফার খান্দানের সাথে আত্মীয়তা ১৫৭
বাগদাদে নতুন রেসিডেন্ট নিয়োগ ১৫৮
সুলতানের শাহাদাত ১৫৯
আল্প আরসালানের চরিত্র ১৬১

চতুর্থ অধ্যায়

উন্নতি যুগ (ক্রমাগত)

মালেক শাহ (৪৬৫ হিজরী থেকে ৪৮৫ হিজরী)

১০৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১০৯২ খৃষ্টাব্দ

খানে সমরখন্দের বিদ্রোহ ১৬৫
গজনবীদের বিদ্রোহ ১৬৬
কাওয়ার্দ বেগের বিদ্রোহ ও তার মূলোৎপাটন ১৬৬
নিজামুল মুলকের ক্ষমতা বৃদ্ধি ১৬৭
খলীফার দরবার থেকে সালতানাতের পরোয়ানা ১৬৮
তিরমিয অধিকার এবং খানে সমরখন্দের আনুগত্য প্রকাশ ১৬৮
দামেশক বিজয় ১৬৯
মিসরের ওপর ব্যর্থ আক্রমণ ১৭০
তাকেশের বিদ্রোহ ১৭১
খলীফা ও সুলতানের মধ্যে বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা ১৭৩
বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার রাজনৈতিক ফলাফল ১৭৪

www.bjilibrary.com

ভূমিকা

সালজুক বংশের রাজত্বের ইতিহাস ইসলামের মহত্ব ও মর্যাদার এক গুরুত্বপূর্ণ যুগের ইতিহাস। আব্বাসীয় রাজত্বের রাজনৈতিক পতনের পর সালজুক সালাতানাতই অধিকাংশ মুসলিম অঞ্চলকে একটি কেন্দ্রের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। সালজুকী সালতানাতই চীন সীমান্ত থেকে নিয়ে ভূমধ্য সাগরের তীর পর্যন্ত এবং এডেন থেকে খাওয়ারিযম ও আবখার পর্যন্ত অঞ্চলের সবগুলো মুসলমান কওমকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল এবং এশিয়ার যে অঞ্চলটি তদানীন্তন সময়ে শুধু ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতিরই নয় বরং গোটা দুনিয়ার সভ্যতা-সংস্কৃতির নেতৃত্ব দিচ্ছিলো। তাকে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করে মানব সভ্যতার বিনির্মাণে যথাযথ ভূমিকা পালনের উপযুক্ত বানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু যে বিষয়টি এই সালতানাতের ইতিহাসকে আমাদের কাছে আরো অধিক গুরুত্ববহ করে তোলে তাহলো, এ যুগটিই মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতির সর্বশেষ যুগ। আমরা দেখতে পাই, শেষবারের মত এ যুগেই মুসলমানরা বিশ্বমানবতার নেতা ও পথপ্রদর্শক হিসেবে সমস্ত জাতির আগে আগে অগ্রসর হচ্ছে। শক্তি ও সম্পদ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, জ্ঞান ও শিল্পকলা, বিশ্লেষণ ও গবেষণা এবং নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতা এক কথায় সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রাধান্য এই যুগ শেষ হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে যদিও দীর্ঘকাল ব্যাপী ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়েছে, বড় বড় আলেম তৈরী হয়েছে। বড় বড় দিগ্বিজয়ী এবং প্রশাসকের আবির্ভাব ঘটেছে। বিশাল বিশাল সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ভারতবর্ষ, মিসর ও রোমে বড় বড় জাঁকালো দরবার জমেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও বাস্তব অবস্থা হলো, তাতারীদের হাতে ধ্বংসাত্মক আঘাত খাওয়ার পর ইসলামের অনুসারীদের মন-মস্তিষ্ক এবং হাত পায়ের শক্তি এমনভাবে নিঃশেষ হয়েছে যে, এর পরে তারা আর পৃথিবীতে সামাজিক জীবনে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শাসন কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়নি। এ দিকটি বিচার করে আমরা বলতে পারি, সালজুকদের ইতিহাস ইসলামের সর্বশেষ সোনালী যুগের ইতিহাস। বিশ্ব ইতিহাসে এর বিশেষ এক অবস্থান আছে।

সালজুক ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ

এ যুগের "সূচনা কাল" হিজরী পঞ্চম শতকের প্রারম্ভে শুরু এবং সপ্তম শতকে এর সমাপ্তি। প্রায় তিন শ' বছরের এই সময়কালে সালজুকদের শক্তি ও কর্তৃত্ব অনেক উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। ৪২৯ হিজরী

www.bjilibrary.com

মোতাবেক ১০৪৩ ঈসায়ী সন থেকে ৫৫২ হিজরী মোতাবেক ১১৫৭ ঈসায়ী সন পর্যন্ত (১২৩ বছর) সময়কালটি সালজুক ইতিহাসের সর্বোত্তম যুগ। এ সময়ে তুগরুল, আল্প আরসালান, মালেক শাহ, বারকিয়ারুক, মুহাম্মাদ এবং সানজারদের মত নৃপতিগণ শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। ইতিহাসে এরা মহান সালজুক বলে খ্যাত। তাদের পরে বিশাল সালজুক সালতানাত টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং বিভিন্ন ইসলামী দেশে কিছুসংখ্যক সালজুক ক্রীতদাস এবং রাজকুমার কিছুসংখ্যক স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করে। এসব রাষ্ট্রের মধ্যে কিরমান, ইরাক, শাম এবং রোম ছিল নিরংকুশভাবে সালজুকদের দ্বারা শাসিত। এসব অঞ্চলের সালজুক শাসকদেরকেই যথাক্রমে কিরমানের সালজুক, ইরাকের সালজুক, শামের সালজুক এবং রোমান সালজুক বলে অভিহিত করা হয়। মহান সালজুকদের শাসন যুগের বিভিন্ন সময়ে এসব রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন হয় এবং পরে বিভিন্ন সময়ে আবার তা বিলুপ্ত হয়। নীচে উল্লেখিত তালিকা থেকে বিষয়টি জানা যেতে পারে ঃ

ইরাক ও কুর্দিস্তানের সালজুকগণ ৫১১ হিজরী থেকে ৫৯০ হিজরী
মোতাবেক ১১১৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১১৯৪ খৃষ্টাব্দ।

শামের (সিরিয়া) সালজুকগণ ৪৮৭ হিজরী থেকে ৫১১ হিজরী
মোতাবেক ১০৯৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১১১৭ খৃষ্টাব্দ।

কিরমানের সালজুকগণ ৪৩৩ হিজরী থেকে ৫৮৩ হিজরী
মোতাবেক ১০৪১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১১৮৭ খৃষ্টাব্দ।

রোমান সালজুকগণ ৫৭০ হিজরী থেকে ৭০০ হিজরী
মোতাবেক ১০৭৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৩০০ খৃষ্টাব্দ।

বড় ও ছোট এসব সালজুকদের যুগের অবস্থা ও ঘটনাবলীই এ পুস্তকের বিষয়বস্তু। কিন্তু ঐতিহাসিকসুলভ রুচির প্রতি লক্ষ্য রেখে এ বিষয়ের পূর্বাপর সূত্র খুঁজে পাওয়ার জন্য সালজুকগণ যাদের নিকট থেকে রাজ্য লাভ করেছিলেন এবং যাদের হাতে তা দিয়ে গিয়েছিলেন। সে বিষয়টি বর্ণনা করা জরুরী বলে মনে হয়। তাছাড়া এ বিষয়ও বর্ণনা করা আবশ্যক যে, সালজুক রাজত্বের প্রতিষ্ঠার সময় ইসলামী বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থা কি ছিল ? সালজুকদের আগমনের কারণে তাতে কি পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল ? তাদের রাজনীতির বিশেষ এবং উল্লেখযোগ্য দিক কি ছিল এবং ইতিহাসের দৃশ্যপট থেকে বিদায় নেয়ার মুহূর্তে তারা ইসলামী বিশ্বকে কি পরিস্থিতির মধ্যে রেখে গিয়েছিল ? প্রারম্ভেই এসব বিষয় সম্পর্কে একটি সার্বিক বক্তব্য পাঠ করে নিলে ইতিহাসের ছাত্র ও আগ্রহী পাঠকগণ সালজুকদের শাসনযুগ সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হবেন এবং তাদের ইতিহাস উত্তমরূপে বুঝতে সক্ষম হবেন।

www.bjilibrary.com

আব্বাসীয় রাজত্বের পতন

একথা সবারই জানা যে, আব্বাসীয়রা রাজত্বলাভের জন্য আরবদের বিরুদ্ধে আজমী তথা অনারবদের ব্যবহার করেছিল এবং তাদের সাহায্যে উমাইয়া খিলাফতকে ধ্বংস করে হাশেমী খিলাফত কায়েম করতে সফল হয়েছিলো। এই আজমীরা প্রথম দিকে আব্বাসীয় খলীফাদের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্যে আরবদের বিরুদ্ধে অনারব মনোবৃত্তি ও ভাবধারা সৃষ্টি হয় (কিংবা বলা যেতে পারে যে, দেখা দেয়) এবং তা বৃদ্ধি পেতে পেতে এতটা শক্তি সঞ্চয় করে যে, অনারবরা খসরু পারভেজ এবং নওশেরওয়াঁ যুগের সোনালী স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। মামুন ও আমীনের মধ্যেকার গৃহযুদ্ধে এই আরব ও অনারব শক্তি সম্পূর্ণ রূপে দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি উপাদান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তারা মামুন ও আমীনের জন্য নয়, বরং আরব ও অনারব দু'টি ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের জন্য লড়ছিলো। মু'তাসিমের যুগ পর্যন্ত পৌঁছতে না পৌঁছতে তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও কোন্দল সালতানাতের জন্য একটি স্পষ্ট বিপদ হয়ে দেখা দেয়। এ দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির সংঘাত ও সংঘর্ষ বন্ধ করা এবং তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে দমনের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় এ বিষয়টিই তখনকার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। প্রয়োজনের সময় আরব ও অনারব উভয় শক্তিকে দমন করার জন্য সালতানাতের কাজে লাগতে পারে এরূপ একটি তৃতীয় পক্ষকে (অর্থাৎ তুর্কী) শক্তিশালী[১] করে গড়ে তোলাকেই মু'তাসিম এর সর্বোত্তম প্রতিকার বলে মনে করলেন ঃ

রাজনৈতিক বিচারে এ চাল যতটা কার্যকর ছিল ততটাই ছিল বিপজ্জনক। কেননা পরস্পর বিরোধী দু'টি শক্তির মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য তৃতীয় আরেকটি শক্তিকে গড়ে তোলার পরিষ্কার অর্থ ছিল, সালতানাতের মূল ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি তাদের হাতের মুঠোয় চলে যাওয়া। তা সত্ত্বেও সেই তৃতীয় শক্তিটি যদি বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গড়ে উঠতো এবং সতর্কতার সাথে

১. আব্বাসীয় খলীফাদের অবস্থা ছিল বনী উমাইয়াদের অবস্থার সম্পূর্ণ উল্টা। আব্বাসীয়দের মধ্যে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর রক্তের সংমিশ্রণ ছিল। কারো মাতৃকুল ছিল আরবীয়, কারো তুর্কী, কারো ইরানী, কারো বাবরী, আবার কারো সাকলবী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব মায়ের তাদের ছেলেদের ওপর অস্বাভাবিক প্রভাব থাকতো। এ কারণে তারা কোনো কোনো সময় তাদের মায়ের জাতি গোষ্ঠীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তো। এভাবে তারা নিজেদের রাজনৈতিক পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়িত করার জন্য মাতৃকুলের সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করতো। আমীনের মাতৃকুল ছিল আরবীয়। তাই সে আরববাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিল এবং সালতানাতের আরবীয় গোষ্ঠী ছিল তার সাহায্যকারী। মামুনের মা ছিল ইরানী। তাই সে ইরানীদের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। ইরানীদের সাহায্যে আরব শক্তিকে দমন করে সে সিংহাসন লাভ করেছিল। মু'তাসিমের মা ছিল তুর্কী। তাই সে তুর্কীদের প্রতি আকৃষ্ট ছিল এবং নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সে তুর্কীদেরই বেছে নিয়েছিল।

www.bjilibrary.com

তাদেরকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা করা হতো তাহলে ব্যবস্থার বিপজ্জনক দিকটা অনেকটা হ্রাস পেতে পারতো।[১] কিন্তু মু'তাসিম এই সূক্ষ্ম বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। সে তার পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপদানের জন্য একই জাতির লোকদের সংগঠিত করে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তুললে জাতি ও বংশগত ঐক্যের কারণে যা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আরব ও আজম উভয় শক্তির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে রূপান্তরিত হলো।[২] এই সেনাদল ছিল এমন একটি হাতিয়ার যা ব্যবহার করার জন্য তার চেয়েও শক্তিশালী হাতের প্রয়োজন ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ মু'তাসিমের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কেউ-ই এর উপযুক্ত ছিল না। একে ব্যবহার করা তো দূরে থাক এর ক্ষতির হাত থেকেও সালতানাতকে রক্ষা করার মত কেউ ছিল না। ফলে অন্যদের দমন করার উদ্দেশ্যে যে শক্তিকে গড়ে তোলা হয়েছিল তা তার সংগঠকদেরকেই অবদমিত ও কুক্ষিগত করে ফেললো এবং সালতানাতের প্রকৃত মালিক আব্বাসীয়রা না হয়ে তাদের তুর্কী ক্রীতদাসেরা হয়ে বসলো।

সালতানাতের ক্রমাবনতি

হিজরী তৃতীয় শতকের প্রথম চতুর্থাংশের কথা। মু'তাসিমের জীবদ্দশায়ই এই বিপজ্জনক রাজনৈতিক চালের অশুভ ফলাফল প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। এ সময় তাকে তুর্কীদের জন্য স্বতন্ত্র একটি শহর (সামার্‌রা বা সুর্‌রা মান রাআ) গড়ে তুলতে হলো। কারণ বাগদাদের সুসভ্য বাসিন্দাদের পক্ষে এই অসভ্য জংলী সেনাদের সাথে মিলেমিশে জীবনযাপন করা অসম্ভব ছিল। তাছাড়া মু'তাসিম যে সময় রোমানদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জিহাদে লিপ্ত ঠিক সেই সময় রাজধানীতে তাঁর পদচ্যুতি ও হত্যার ষড়যন্ত্র যার মূল উৎস ছিল তুর্কীদের ক্রমবর্ধমান শক্তির বিরুদ্ধে সালতানাতের উচ্চপর্যায়ের ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের ক্রোধ ও আক্রোশ। সর্বশেষে মু'তাসিমের প্রিয়ভাজন তুর্কী নেতা আফশীনের ষড়যন্ত্র এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দিল যে, এ বৃক্ষ ভবিষ্যতে কি ধরনের ফল উৎপন্ন

---

১. মু'তাসিম অবশ্য মাগরেবের অধিবাসীদের সমন্বয়ে একটি বাহিনী গড়ে তুলেছিলো। কিন্তু তা তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। তুর্কীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করা যেমন এ বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য ছিল না। তেমনি কোনো বড় উদ্দেশ্যে কাজে লাগানোর মত যথেষ্ট শক্তিশালীও তাকে করা হয়েছিল না।

২. নবীন এই তুর্কী উপাদানের উত্থানের মধ্যে ইসলামী রাজনীতি ও তাহযীব-তামাদ্দুনের জন্য সর্বাধিক বড় ক্ষতি ছিল এই যে, তাদের মধ্যে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহণ ও আত্মস্থ করার যোগ্যতা ছিল সবচেয়ে কম। তাদের যাযাবর জীবন মুসলমানদের সভ্য জীবনের সাথে পাল্লা দিতে অক্ষম ছিল। এমন কি তাদের মধ্যেকার উল্লেখযোগ্য একটি সংখ্যা নিষ্ঠাবান মুসলমানও ছিল না। শুধু রাজত্ব ও ক্ষমতার উদ্দেশ্যে তারা কপটভাবে ইসলামের ঘোষণা দিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে আফশীনের কাহিনী সবারই জানা।

www.bjilibrary.com

করবে। মু'তাসিমের পরে ওয়াসেকের জন্য এই ক্রমবর্ধমান বিপদকে বাধা দেয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু তিনি চোখ বন্ধ করে পিতার কর্মনীতি অনুসরণ করে চললেন এবং তাঁর সংক্ষিপ্ত শাসনযুগে তুর্কীদের এতটা শক্তিশালী করে দিলেন যে, তাঁর ইনতিকালের পর উত্তরাধিকারের প্রশ্ন দেখা দিলে তুর্কী সর্দার ওয়াসিফ সালতানাতের সমস্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের মতের বিরুদ্ধে মুতাওয়াককিলকে সমর্থন করে বসলো এবং তাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে সফল হলো। তুর্কী উপদল এ সময়ই সর্বপ্রথম রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে হস্তক্ষেপ করলো।[১] এরপর পুরা এক শতাব্দীকাল পর্যন্ত তুর্কী ক্রীতদাসরা সালতানাতের মালেক মোখতার হয়ে রইলো এবং খলীফাদেরকে কাঠের পুতুলের ন্যায় উঠাতে বসাতে থাকলো।[২] তারা মুতাওয়াককিলকে হত্যা করলো, মুসতাইনকে এত উত্যক্ত করলো যে, তিনি সামার্‌রা থেকে বাগদাদ পালিয়ে গেলেন এবং তারা তাকে ফিরে আসতে বললেও যখন তিনি আসলেন না তখন তাকে পদচ্যুত করে হত্যা করলো। মু'তাযকে তারা চরম অপমানজনকভাবে পদচ্যুত, বন্দী এবং হত্যা করে।[৩] মুহতাদী তাদের শক্তি খর্ব করার চেষ্টা করলে তারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং তাঁকে গ্রেফতার ও বন্দী করে। কাহেরকে তারা পদচ্যুত করে অন্ধ করে দেয় এবং মুত্তাকীকে অন্ধ করে পদচ্যুত করে। সেই যুগে খলীফারা বাগদাদের আসল শাসক ছিলেন না, বরং প্রভুর বৈশিষ্ট্যধারী এসব ক্রীতদাসরাই ছিল প্রকৃত শাসক।[৪]

---

১. যদিও ওয়াসিকের হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণ বৈধ ছিল। কিন্তু সে ভবিষ্যতে সৈন্যদের হস্তক্ষেপের অবৈধ ও বিপজ্জনক পথের দরযা উন্মুক্ত করে দিল।

২. এ ঘটনাটি বেশ প্রসিদ্ধ যে, মু'তায বিল্লাহকে খিলাফতের মসনদে বসানো হলে তাঁর দরবারের উমরাগণ গণকদের ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, খলীফার আয়ুষ্কাল কতদিন হবে এবং তিনি কতদিন যাবত শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারবেন ? তখন একজন বিদ্রূপ করে বলেছিল, এসব জ্যোতিষীর চেয়ে আমিই তা ভাল জানি। সবাই তাকে বললো ঃ তাহলে তুমিই বলে দাও। সে বললো ঃ যতদিন তুর্কীদের মর্জি হবে ততদিন।

৩. তারা মু'তাযের সাথে অত্যন্ত ভয়ানক ও নিষ্ঠুর আচরণ করে। তারা তাঁকে তাঁর কক্ষ থেকে পা ধরে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যায় এবং ডাণ্ডার আঘাতে জর্জরিত করে। পরিধেয় কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে ফেলে এবং প্রচণ্ড রোদে দাঁড় করিয়ে রাখে। বেচারা এ সময় বার বার এক পা মাটিতে রেখে আরেক পা উঠাতে থাকে। পরে তাঁকে সেখান থেকে আঘাত করতে করতে নিয়ে যায় এবং পানাহার ছাড়াই তিনদিন পর্যন্ত বন্দী রাখে। অতপর ভূগর্ভস্থ একটি কক্ষে বন্দী করে চুনকাম করে তার দরযা বন্ধ করে দেয়।

৪. এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মন্ত্রীত্ব তখনও ইরানীদের করায়ত্ত ছিল। ইবনে ওয়াহাব, ইবনুল ফুয়াত, আলী ইবনে ঈসা এবং ইবনে মুকলা ছিলেন সে যুগেরই নামযাদা উজীর। কিন্তু তুর্কীদের সামনে তারা ছিল অসহায়। কেননা সামরিক শক্তি ছিল তাদেরই হাতে। আর তাদেরকে তুর্কীদের আর্থিক দাবী বিনাবাক্যে পূরণ করতে হতো। অন্যথায় খলীফাদের যে ভয়াবহ পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে তাদের পরিণাম তার চেয়েও ভয়াবহ হতো।

www.bjilibrary.com

তাহেরিয়া

তুর্কী দাসদের এই আধিপত্যে অসন্তুষ্ট এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতায় সাহসী হয়ে বিভিন্ন ইসলামী প্রদেশের তুর্কী, আরব এবং অনারব গর্ভনররা স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীনতার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠতে থাকে। ক্রমান্বয়ে তারা নিজেদের আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে। এভাবে আব্বাসীয় খিলাফতের কাঁটছাঁট ও ক্রমাবনতী শুরু হয়ে যায়। সর্বপ্রথমে খোরাসানের গভর্নর তাহের ইবনে আবদুল্লাহ স্বাধীনভাবে চলার পন্থা অনুসরণ করে। ২৪০ হিজরী মোতাবেক ৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তাহেরের পিতা আবদুল্লাহর ইনতিকাল হলে ওয়াসেক ইসহাক ইবনে ইবরাহীম আল-মুসআবীকে খোরাসানের গভর্নর নিয়োগ করতে মনস্থ করেন। কিন্তু তাহেরের ক্ষমতা অত্যন্ত মযবুত বুঝতে পেরে নিজের ফরমান বাতিল করতে বাধ্য হন। খোরাসান এভাবে কার্যতঃ স্বাধীন হয়ে যায় এবং এর অধীনতামূলক মর্যাদা শুধু এতটুকু অবশিষ্ট থাকে যে, একজন শাসকের মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত শাসক প্রয়োজন ও নিয়ম রক্ষার খাতিরে খলীফার নিকট থেকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সনদপত্র লাভ করা প্রয়োজন বলে মনে করতেন।

তুলুনিয়া

২৫৪ হিজরী মোতাবেক ৮৬৮ খৃষ্টাব্দে আহমদ ইবনে তুলুন মিসরের গভর্নর নিয়োজিত হন এবং স্বল্পকালের মধ্যেই মিসর ও শামে তাঁর স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন যা ২৯২ হিজরী মোতাবেক ৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তার পরিবারের হাতে থাকে।

সাফ্ফারিয়া

তৃতীয় শতকের মধ্যভাগে ইয়াকূব ইবনে লাইস নামক এক কাঁসারী সিস্তানে তার ভাগ্য পরীক্ষা শুরু করেন এবং ২৫৩ হিজরী মোতাবেক ৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সমগ্র প্রদেশের শাসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ২৫৯ হিজরী মোতাবেক ৮৭২ খৃষ্টাব্দে সে তাহেরিয়ার নিকট থেকে খোরাসান দখল করে নেয় এবং সিন্ধু থেকে পারস্য ও তাবারিস্তান পর্যন্ত তার শাসন কর্তৃত্ব কায়েম করেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত সে বাগদাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হয় কিন্তু মু'তামিদের ভাই মুওয়াফ্ফিকের হাতে পরাজিত হয়ে ফিরে আসে। তার পরিবার ইতিহাসে সাফ্ফারিয়া নামে পরিচিত। স্বায়ত্বশাসনের ক্ষেত্রে তারা তাহেরিয়া ও তুলুনিয়াদের তুলনায় আব্বাসীয় খেলাফতের প্রভাব প্রতিপত্তি থেকে অনেক বেশী স্বাধীন ছিল। পরবর্তী সময়ে আমর ইবনে লাইস যদিও বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে খলীফা মু'তামিদের নিকট থেকে খোরাসান,

www.bjilibrary.com

ফারেস, কুর্দিস্তান এবং সিস্তানের শাসন কর্তৃত্বের পরোয়ানালাভ করেছিলেন কিন্তু পরোয়ানালাভের পূর্বে তার শাসন কর্তৃত্ব যেমন ছিল পরোয়ানালাভের পরও তেমনি ছিল।

আলাবিয়া

উত্তরে দায়লাম, তাবারিস্তান এবং গিলান অঞ্চলে আলাবী বংশের সর্দাররা তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে এবং ২৫০ হিজরী মোতাবেক ৮৬৪ খৃষ্টাব্দে হাসান ইবনে যায়েদ আলাবী যথারীতি তার নিজের ইমামতের দাবী করে নিজের নামে মুদ্রা ব্যবস্থা ও খুতবা চালু করে। ষাট বছরের অধিক সময়কাল পর্যন্ত এ অঞ্চল আব্বাসীয় খিলাফতের অধীনতা থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকে। অবশেষে ৩১৬ হিজরী মোতাবেক ৯২৮ খৃষ্টাব্দে তাবারিস্তান অঞ্চল তার হাত ছাড়া হয়। তবে এরপরও দীর্ঘ দিন পর্যন্ত গিলান ও দায়লামের ওপরে তার প্রভাব ও কর্তৃত্ব টিকে থাকে। তারই প্রভাবে দায়লামীদের মধ্যে শিয়া মতবাদ বিস্তার লাভ করে। পরবর্তীকালে এই শিয়া মতবাদ পূর্বাঞ্চলীয় খিলাফতের কেন্দ্রবিন্দুতে সোয়াশ' বছর পর্যন্ত শাসন চালায়।

সামানিয়া

তৃতীয় শতকের মধ্যভাগে মধ্য এশিয়ায় সামানী বংশ তার শাসন কর্তৃত্ব কায়েম করে। মধ্যখানে সাফ্ফারী সালতানাত প্রতিবন্ধক হয়ে থাকায় দূরবর্তী এই প্রদেশটি খেলাফতের কেন্দ্রভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাহেরীদের প্রভাবাধীন সামানী বংশ নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে শুরু করে। ২৬১ হিজরী মোতাবেক ৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইসমাঈল ইবনে আহমদ সমরখন্দের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তিনি একজন স্বাধীন বাদশার মতই স্বাধীন ছিলেন।

তিনি ২৯০ হিজরীতে (৯০৩ খৃষ্টাব্দে) সাফফারীয়াদের নিকট থেকে খোরাসান ছিনিয়ে নেন এবং কাশগড় থেকে পারস্য উপসাগরের উপকূল ভাগ পর্যন্ত এবং হিন্দুস্থানের সীমান্ত থেকে বাগদাদের আশপাশের এলাকা পর্যন্ত তাঁর সালতানাতের সীমা বিস্তৃত করেন। তার বংশধরগণ ৩৮৯ হিজরী (৯৯৯ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন।

সাজিয়া

২৭৬ হিজরী সনে মুহাম্মাদ ইবনে আবিস্ সাজ আজারবাইজানের গভর্নর নিযুক্ত হন এবং অল্প দিনের মধ্যেই স্বেচ্ছাচারী শাসকের মত কাজ-কর্ম শুরু করেন। তাঁর বংশধরগণ ৩১৮ হিজরী (৯৩০ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত আর্মেনিয়া এবং

www.bjilibrary.com

আজারবাইজানে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। অতপর দ্বিতীয়বারের মত এ এলাকায় সরাসরি আব্বাসীয়দের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

যাইয়ারিয়া

৩১৬ হিজরীতে (৯২৮ খৃষ্টাব্দ) মারদাবীজ ইবনে যাইয়ার তাবারিস্তান ও জুরজানে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন এবং ইসপাহান ও হামদান দখল করে হুলওয়ান পর্যন্ত নিজ রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন। কিন্তু এর পর পরই বুয়াই খান্দানের ক্ষমতা ও আধিপত্য শুরু হয়। এ কারণে যাইয়ার বংশের শক্তি প্রতিপত্তি তাদের সামনে দমে যায়। তা সত্ত্বেও পঞ্চম শতকে প্রথমার্ধের শেষ পর্যন্ত তারা জুরজান ও তাবারিস্তানে তাদের শাসন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়।

ইখশেদিয়া

তুলুনিয়া খান্দানের পরে ৩২৩ হিজরীতে (৯৩৫ খৃষ্টাব্দে) ইখশেদিয়াগণ মিসরে তাদের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ৩৩০ হিজরীতে (৯৪১ খৃষ্টাব্দ) শাম এবং হিজাজ অঞ্চলকেও তাদের অধীনস্ত এলাকার অন্তর্ভুক্ত করেন। এ খান্দান ৩৫৮ হিজরী (৯৬৯ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত এ অঞ্চল শাসন করেন।

খিলাফতের এখতিয়ারসমূহের বিভক্তি

এতদিন পর্যন্ত ছাঁটকাট ও বিভক্তি চলছিলো দূর-দূরান্তের প্রদেশসমূহে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তা থেকে নিরাপদ ছিল। আব্বাসীয় খলীফা দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও বাগদাদে রাজনীতির বাগডোর তাঁদের হাতেই ছিল এবং বাগদাদ ছাড়াও আরব, আল-জাযিরা, আজারবাইজান, আর্মেনিয়া এবং ভারত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত সরাসরি তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু শক্তি ছাড়া সালতানাতের এই অবশিষ্ট অংশ বেশীদিন দখলে রাখা কঠিন ছিল। সুতরাং আর রাদী বিল্লাহর সময়ে (৩২২ হিজরী মোতাবেক ৯৩৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ৩২৯ হিজরী মোতাবেক ৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) ওয়াসেত ও বসরার গভর্নর মুহাম্মদা ইবনে আবুর রায়েক খলীফাকে রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্মের ব্যাপারে কার্যত সম্পর্কহীন করে দেন এবং খলীফার নিকট থেকে আমীরুল উমারার উপাধি লাভ করে রাষ্ট্রীয় শক্তি এমনভাবে নিজের কুক্ষিগত করে নেন যে, খলীফার মর্যাদা একজন বেতনভোগী আধ্যাত্মিক নেতার চেয়ে আর বেশী কিছু অবশিষ্ট থাকে না।[১] কিছুদিন পর আমীরুল উমারার এ পদমর্যাদাও তুর্কী দাসদের হাতে চলে যায় এবং খলীফার শাসন কর্তৃত্ব কেবল রাজপ্রাসাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

---

১. আমীরুল উমারার পদমর্যাদাটি মূলতঃ সামরিক অফিসারের পদ। কিন্তু আমি দেখতে পাই যে, এর প্রভাববলয় সেনাবাহিনীর বাইরে রাজনীতির বিষয়ক সবকিছুকেই গ্রাস করছিল। বিশেষতঃ দাইলামীদের যুগে আমীরুল উমারাগণ সালতানাতের সবকিছু থেকেই খলীফাদের বে-দখল করেছিল।

www.bjilibrary.com

উমাইয়াদের খিলাফত দাবী

স্পেনের উমাইয়া শাসক তৃতীয় আবদুর রহমান ৩১৭ হিজরীতে কর্ডোভার সিংহাসনে সমাসীন হন। এ সময়ে তিনি তার খিলাফতের ঘোষণা করেন। স্পেনের সরকার যদিও পূর্বেও কখনো আব্বাসীয় খিলাফতকে মেনে নেয়নি।[১] তথাপি তখন পর্যন্ত তারা আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে খিলাফতের দাবী থেকে বিরত ছিল। কিন্তু পূর্বাঞ্চলীয় খিলাফত তার অবশিষ্ট ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে বসলো। তখন তার পশ্চিমা প্রতিপক্ষগণের মনে প্রকাশ্যে তাদের পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকারলাভের সাহস জেগে উঠলো। এটা ছিল আব্বাসীয় খিলাফতের জন্য একটা বড় আঘাত। এর পূর্বে সুরক্ষিত ছিল, আঘাত আসছিল কেবল সালতানাতের ওপর, কিন্তু খিলাফত পুরাপুরি সুরক্ষিত ছিল।

বুয়াই খান্দানের উত্থান

এর পর পর দু'টি ঘটনা সংঘটিত হয় যা সুন্নী[২] খিলাফতকে অর্ধমৃত করে দেয়। প্রথম ঘটনাটি হলো বুয়াই খান্দানের উত্থান। আর দ্বিতীয় ঘটনা হলো নিকট প্রাচ্যের দিকে ফাতেমীদের অগ্রাভিযান। প্রথমোক্ত খান্দান ছিল দায়লামের সাহসী ও যুদ্ধ নিপুণ গোত্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তারা নিজেদেরকে ইরানের প্রাচীন মাসানী রাজবংশের সাথে সম্পর্কিত করতো। চতুর্থ শতাব্দীর ফিতনাপূর্ণ পরিস্থিতি তার মধ্যেও ভাগ্য পরীক্ষার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে এবং এর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা আবু সুজা বুয়াই অপরিচিতির অন্ধকার থেকে বেরিয়ে খ্যাতি ও ক্ষমতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা-সাধনা শুরু করেন। প্রথম দিকে আলাবী ও সামানীদের মধ্যেকার যুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে তাদের শক্তি সংহত হয়। অতপর তার তিন পুত্র আলী, হাসান এবং আহমদ তাবারিস্তান ও জুরজানের শাসক মারকাবীজ ইবনে যাইয়ারের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করে। অল্প কিছুকাল যেতে না যেতেই তিনি মারদাবীজের নিকট থেকে আলাদা হয়ে নিজের নামেই রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা শুরু করেন এবং ৩২০ হিজরী (৯৩২ খৃষ্টাব্দ) এবং ৩২৩ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে তারা তিনজন ইস্পাহান, সিরাজ এবং আররাজান পর্যন্ত তাদের প্রভাব বিস্তার করে। এ সময় আলী ফারেস অঞ্চলের এবং হাসান আল জিবাল অঞ্চলের মালিক মোখতার হয়ে যায় আর আহমদ পূর্ব ও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ৩২৪ হিজরীতে (৯৩৫ খৃষ্টাব্দ) তিনি কিরমান দখল করেন এবং ৩৩৪ হিজরীতে (৯৪৫ খৃঃ) অগ্রসর হতে হতে

১. কখনো কখনো পরিবেশ-পরিস্থিতি ও অবস্থা অনুসারে এবং লোক দেখানোর জন্য তাদের বিরুদ্ধে যেসব ঘটনাবলী প্রকাশ পেয়েছে তা দেখে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঠিক হবে না যে, স্পেনের উমাইয়া শাসকগণ কোনো সময় বাগদাদকেই প্রকৃতপক্ষে বৈধ খলীফা বলে মেনে নিয়েছে।

২. এ ক্ষেত্রে 'সুন্নী' খিলাফত শব্দটি 'শিয়া' ও ফাতেমী বংশের ইমামতের বিপরীত পারিভার্ষিক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

বাগদাদে প্রবেশ করেন। মাথানত করে তাকে স্বীকার করে নেয়া ছাড়া খলীফা মুসতাকফীর জন্য আর কোনো উপায় ছিল না। তিনি তাকে আমীরুল উমারার পদমর্যাদা ও মুইযযুদ্দৌলা উপাধি দান করেন এবং তার দুই ভাইকেও ফারেস ও আল-জিবাল শাসন করার পরোয়ানা লিখে দেন। খিলাফতের দরবার থেকে আলী ইমাদুদ্দৌলা এবং হাসান রুকুনুদ্দৌলা উপাধি লাভ করেন। এভাবে বাগদাদের ওপর বুয়াই খান্দানের শাসন কায়েম হয় এবং প্রায় একশ' বছর পর্যন্ত তারা আল-জাযিরা, ইরাক ও পশ্চিম ইরান শাসন করেন। তারা তুর্কী দাসদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অবসান ঘটান। দেশে নিয়মতান্ত্রিক সরকার কায়েম করেন এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখেন। কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক দিয়ে তারা ছিলেন শিয়া। তাই সুন্নী খলীফা (আকীদাগতভাবে তার খিলাফত স্বীকার করতো না) এবং যেসব এলাকার জনবসতির অধিকাংশ সুন্নী ছিল সেসব এলাকার ওপর তাদের আধিপত্য একদিকে আব্বাসীয় খিলাফতের উৎসমূল দুর্বল করে দেয় এবং অপর দিকে ধর্মীয় বিরোধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে দেয়। তাদের শাসনামলে এমন অনেক রীতিনীতি চালু যা সুন্নীদের দৃষ্টিতে জঘন্য বিদআত বলে পরিগণিত হতো। তাদের শাসনকালেই মুহাররাম মাসের ১০ তারিখকে শোক দিবস হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়, তাজিয়া নিয়ম চালু করা হয় এবং খোলাফায়ে রাশেদার প্রথম তিন খলীফাকে প্রকাশ্যে গালি-গালাজ করা শুরু হয়। এসব বিষয় নিয়ে শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে চরম ঝগড়া-বিবাদ শুরু হয় এবং এ নিয়ে অধিকাংশ সময়ই বাগদাদের মাজারে হাংগামা ও মাথা ফাটাফাটি হতে থাকে।[১]

---

১. ইতিহাসের একটি নাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, বুয়াই খান্দান আব্বাসীয় খিলাফতের কেন্দ্রবিন্দুতে পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করার পরও আব্বাসীয় খলীফাকে পদচ্যুত করে মিসরের ফাতেমী খলীফাদের আনুগত্য গ্রহণ করলো না কেন? আমার মতে এর কারণ ছিল দু'টি। এক, যথেষ্ট শক্তি ও শান-শওকত থাকা সত্ত্বেও তারা এমন বাহুবলের অধিকারী ছিল না যে, পূর্বাঞ্চলী মুসলিম জাহানের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে উপেক্ষা করে আব্বাসীয় খিলাফতকে উৎখাত করতে পারতো। তাদের নিজেদের সালতানাতের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ছিল সুন্নী। তাছাড়া তাদের সালতানাত সংলগ্ন যেসব ইসলামী দেশ তারাও সবাই সুন্নী আকীদা-বিশ্বাসের অনুসারী ছিল। তাই তারা যে শুধু আব্বাসীয় খিলাফতের বিরোধিতা করতে সাহস পেতো না তাই নয়। বরং তারা কার্যত খিলাফতের সামনে মাথা নত করে তার পূর্ব আনুগত্য প্রকাশ করতে নিজেদের বাধ্য ও অসহায় মনে করতো। দুই, কোনো ফাতেমী খলীফার আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করা তাদের আপন স্বার্থের অনুকূলেও ছিল না। সুতরাং মুইযযুদ্দৌলাকে মিসরীয় খলীফার সাথে আলোচনা করার পরামর্শ দেয়া হলে তিনি এই ভেবে তা থেকে বিরত থাকেন যে, তার সেনাবাহিনী এবং রাজকর্মচারীগণের সবাই শিয়া। তারা মনে-প্রাণে ফাতেমীদেরকে খিলাফতের উপযুক্ত বলে বিশ্বাস করে। তাই তার আশংকা ছিল, তারা সবাই যদি ফাতেমী খলীফার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে তাহলে তার ও তার খান্দানের কোনো ক্ষমতা ও কর্তৃত্বই আর অবশিষ্ট থাকবে না।

www.bjilibrary.com

ফাতেমীদের উত্থান

একদিকে শিয়া শাসকগণ সুন্নী খিলাফতের কেন্দ্রে দখল জমিয়ে বসেছিল। অপর দিকে আব্বাসীয়দের আসল প্রতিপক্ষ খিলাফতের দাবীদার ফাতেমী খান্দান সয়লাবের গতিতে মিসর, সিরিয়া ও হিজাযের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তারা ৩৫৬ হিজরীতে (৯৬৯ খৃঃ) মিসর দখল করে নেয়। এর কয়েক বছর পর সিরিয়া এবং হিজাযও তাদের দখলে চলে যায়। ফলে মক্কা ও মদীনায় আব্বাসী খলীফাদের পরিবর্তে ফাতেমী খলীফাদের নামে খোতবা পড়া হতে থাকে। এটা ছিল আব্বাসীয় খিলাফতের ওপর সর্বপ্রথম আঘাত। সালতানাত হস্ত ছাড়া হওয়ার পর আব্বাসীয়দের জন্য মুদ্রা এবং খোতবা ছিল এমন এক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ইসলামী বিশ্বের ওপর তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় ছিল। এ ক্ষেত্রে তাদের ওপর প্রথম আঘাত হানে স্পেনের উমাইয়া শাসকগণ। কিন্তু তা তেমন গুরুতর কোনো আঘাত ছিল না। কারণ, আগে থেকেই স্পেন আব্বাসীয় খিলাফতের অধীন ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় আঘাতটি ছিল এমন যা আব্বাসীয় খিলাফতকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছিয়ে দেয়। এ ক্ষেত্রে মিসর ও সিরিয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী দেশসমূহই যে কেবল আব্বাসীয়দের হাত ছাড়া হয়েছিল তাই নয়, বরং তার চেয়েও বড় বিপদ ছিল এই যে, ইসলামী বিশ্বের মূল আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় কেন্দ্র মক্কা এবং মদীনায় প্রতিদ্বন্দ্বী খলিফার নামে খোতবা পাঠ শুরু হয়েছিল যার কারণে আব্বাসীয় খিলাফত একেবারেই অর্ধমৃত হয়ে পড়েছিল। এছাড়াও শেষ পর্যন্ত এমন একটি অবস্থা উদ্ভব হয় যে, খোদ খলীফাকেই বাগদাদ ছেড়ে পালাতে হয় এবং খিলাফতের রাজধানীতেই পূরা একটি বছর ধরে মিসরের শিয়া খলীফার নামে খোতবা পড়া হতে থাকে।

গজনবী শক্তি

চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে গজনী থেকে আরো একটি শক্তির উত্থান ঘটে যা ভারতবর্ষ থেকে ইরাক পর্যন্ত গোটা মধ্য এশিয়াকে উলট-পালট করে দেয়। এ শক্তিটি ছিল সবুক্তগীনের পুত্র মাহমুদের শক্তি। তিনি ৩৮৮ হিজরীতে (৯৯৮ খৃঃ) গজনীর সিংহাসনে বসার পর সামানী রাজশক্তির নামকাওয়াস্তের আনুগত্যের জোয়াল ঘাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেন। সরাসরি খলীফার নিকট থেকে খোরাসান ও গজনী শাসন করার পরোয়ানা হাসিল করেন এবং প্রায় ৩৩ বছরের মধ্যে তাঁর সালতানাতের সীমানা পাঞ্জাব, আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, খোরাসান, রায় এবং ইস্পাহান পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। অসীম সাহসী এই দিগ্বিজয়ীর শক্তিশালী হাত সমসাময়িক ইসলামী দুনিয়ার সব সমস্যার সমাধান করতে পুরোপুরি সমর্থ ছিল। কিন্তু সে তার শক্তিকে দেশ জয় ও শাসনের কাজে ব্যয় করা বেশী পসন্দ করলেন এবং ইসলামী বিশ্বের সমস্যাসমূহ অপর

www.bjilibrary.com

এক উদীয়মান শক্তির জন্য রেখে দিলেন যা তার জীবদ্দশায়ই বেড়ে উঠতে শুরু করেছিল। তার মৃত্যুর পরই এ শক্তিটি মঞ্চে আবির্ভূত হয়।

সালজুকদের আগমন

উদীয়মান এই নবীন শক্তিটি ছিল সালজুকদের শক্তি। সালজুকদের ইতিহাসই এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। পঞ্চম শতকের প্রারম্ভে সাদামাটা এই তুর্কমানগণ উত্তরের অসভ্য অঞ্চলসমূহ থেকে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। এ অঞ্চলের বিকৃত অবস্থা সংস্কারের জন্য তাদের সতেজ ও উষ্ণ রক্তের প্রয়োজন ছিল সমধিক। তারা নিজেদের শক্তি সুসংহত করতেই শতাব্দীর প্রথম সিকি ভাগ ব্যয় করে। দ্বিতীয় সিকি ভাগে তারা শাহী মসনদে সমাসীন হয় এবং তৃতীয় সিকি ভাগে তারা গোটা পূর্বাঞ্চলের মালিক হয়ে বসে। তাদের আগমনকালে খিলাফতের পূর্বাঞ্চল যেভাবে বিভিন্ন শক্তির হাতে বিভক্ত ছিল নীচের চিত্র থেকে তার সঠিক অবস্থা বুঝা যায়ঃ

গজনবিয়া—আফগানিস্তান, খোরাসান, খাওয়ারিজম, আল-জিবাল, রায় প্রভৃতি অঞ্চল।

ইলাকিয়া—মধ্য এশিয়া, তুর্কিস্তান।

বনু কাকওয়াই—ইস্পাহান, হামদান, ইয়াযদ, নিহাওয়ান্দ যাইয়ারিয়া-জুরজান, তাবারিস্তান।

যাইয়ারিয়া—জুরজান, তাবারিস্তান।

বুয়াই খান্দান—ইরাক, ফারেস, কিরমান, আল-জাযিরা।

বনু উকাইল—মওসেল, মাদায়েন, আমবার, সিরিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল।

বনু মিরদাস—হালাব, আর্ রাহবা, আর রাক্কা, মামবিজ।

বনু মারওয়ান—দিয়ারে বকর, কীফা, মাইয়াফারেকীন।

বনু মাযইয়াদ—হুল্লাহ, ইরাকের প্রত্যন্ত অঞ্চল।

মিসরের ফাতেমী—শাম, হেজায।

সালজুক শাসনের প্রথম দিকে ইসলামী দুনিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা

এদের মধ্যে গজনবিয়া এবং বনু কাকওয়াই আব্বাসীয় খলীফাদের এতটুকু আনুগত্য করতো যে, তাদের শাসকগণ নিজ প্রজাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য খলীফাদের নিকট থেকে নিজের সরকারের জন্য স্বীকৃতি নিয়ে নিতো। বুয়াই খান্দান ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক দিয়ে শিয়া হওয়ার কারণে আব্বাসীয় খিলাফতকে স্বীকারই করতো না। তাই প্রকৃতপক্ষে তারা আব্বাসীয় খলীফাদের প্রতি অনুগতও ছিল না এবং তাদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্যও রাখতো না। তবে

www.bjilibrary.com

রাজনৈতিক অবস্থা আনুগত্য ও সম্মান দেখাতে তাদেরকে বাধ্য করে রেখেছিল। বনু উকাইল আব্বাসীয় খিলাফত এবং বুয়াই সালতানাতের অধীনতা স্বীকার করতো বটে কিন্তু কার্যত ছিল স্বাধীন। বনী মারওয়ান ছিল শিয়া তাই তারা ফাতেমী খলীফাদের অনুগত ছিল। মিসরের ফাতেমীয়া খলীফারা ছিলেন প্রকাশ্যে আব্বাসীয়দের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপক্ষ। তাদের শক্তি ক্রমশঃ এত বৃদ্ধি পাচ্ছিলো যে, একবার বাগদাদেও তাদের নামে খোতবা পড়া হয়েছিল। এ বিষয়টি আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। এভাবে কেন্দ্রীয় শক্তির অথর্ব হয়ে পড়া, ইসলামী দেশসমূহের ছোট-বড় সালতানাতে বিভক্ত হয়ে যাওয়া এবং নিজেদের মধ্যে একাদিক্রমে পারস্পরিক লড়াই ঝগড়ায় মত্ত থাকার কারণে লেগে থাকা বিশৃঙ্খলার স্বাভাবিক ফল ছিল এই যে, মুসলমানদের প্রাচুর্য রাজনীতি এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি পতনোন্মুখ হতে শুরু করলো। ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা হ্রাস পেল। জ্ঞানান্বেষণ এবং জ্ঞান-গবেষণার জন্য ভ্রমণ ও গমনাগমনের দূরহতা বেড়ে গেল। রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং সালতানাতসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত অর্থনৈতিক জীবনের শৃঙ্খলাকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করলো। এতে সামগ্রিকভাবে ইসলামী সভ্যতা ও তামাদ্দুনের উন্নয়ন শুধু স্তিমিত হয়ে যায়নি।[১] বরং এর সাথে সাথে পৃথিবীর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও অনেকটা কমে যায়। তাই যে রোমান সাম্রাজ্য মু'তাসিমের হাতে ধ্বংস হতে হতে রক্ষা পেয়েছিল তা এ সময় এত দুঃসাহসী হয়ে উঠে যে, দক্ষিণে ইন্তাকিয়া এবং পূর্বে আর্মেনিয়া পর্যন্ত সে তার সীমা বাড়িয়ে নিয়েছিল আর কোনো কোনো সময় তার টহল সেনাদল ইবনে উমর দ্বীপ এবং রা'সূল আইন পর্যন্ত এসে পড়তো।

সালজুকদের আগমনে যে বিপ্লব সাধিত হয়েছিল

এ পরিস্থিতিতে সালজুক খান্দান খোরাসান অভিমুখে অগ্রাভিযান শুরু করে। ৪২৯ হিজরীতে (১০৩৭ খৃষ্টাব্দ) তুগরুল বেগ খোরাসানে বাদশাহীর ঘোষণা করলেন। কয়েক বছরের মধ্যে বলখ, খাওয়ারিজম, জুরজান, তাবারিস্তান, আল জিবাল, হামদান, দায়নাওয়ার, হুলওয়ান, রায় এবং ইস্পাহান একের পর এক তাঁর অধিকৃত হতে থাকে। ৪৪৭ হিজরীতে (১০৫৫ খৃষ্টাব্দে) তিনি নিজে রাজধানী বাগদাদ দখল করেন এবং ইনতিকালের পূর্বে আমুদরিয়া নদীর তীর থেকে ফোরাতের তীর পর্যন্ত তাঁর সালতানাতের বিস্তার ঘটান। অতপর আলপ আরসালান তাঁর সালতানাতকে পূর্বে জান্দ এবং পশ্চিমে হলব

১. সেই সময় যদিও ইসলামী সভ্যতার মধ্যে যৌবনের শক্তি অবশিষ্ট ছিল যার কারণে তার সুস্থ শরীরে রোগ-ব্যধিজনিত সুস্পষ্ট কোনো অবক্ষয় দেখা দেয়নি। তথাপি রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার স্বাভাবিক পরিণাম থেকে তার রক্ষা পাওয়ার কথা নয় এবং অতি শক্তিশালী কোনো সভ্যতাও রক্ষা পেতে পারে না। অন্তত এ সত্যকে স্বীকার করতে হবে যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা এককেন্দ্রিক হওয়ার ক্ষেত্রে তার গতি যত দ্রুত ও তীব্র হতো বিশৃঙ্খলা ও বিভেদের পরিবেশে তা ততটা বেগবান হওয়ার কথা নয়।

www.bjilibrary.com

পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। এশিয়া মাইনরের একটা বড় অঞ্চল তিনি দখল করেন। পুনরায় মক্কা ও মদীনায় আব্বাসীয় খলীফাদের নামে খোতবা চালু করেন এবং রোমের কাইজার চূড়ান্তভাবে পরাজিত পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শান-শওকত পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর মালিক শাহের যুগে এই সালতানাত তার বিস্তৃতির চরম সীমায় উপনীত হয়। অর্থাৎ পশ্চিমে ভূমধ্য সাগরের উপকূল, পূর্বে চীন সীমান্ত, দক্ষিণে ইয়ামান এবং উত্তরে খাওয়ারিজম ও আবখায পর্যন্ত সমস্ত ইসলামী দেশ ও অঞ্চল একই শাসক, একই আইন এবং একই রাজনৈতিক ব্যবস্থার শাসনাধীন হয়। গোটা রাষ্ট্রে পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসার ঘটে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঝর্ণাধারা উৎসারিত হতে থাকে। সালতানাতের সাহায্য-সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞানী-গুণী ও মনীষীরা দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করতে থাকেন এবং স্বল্পকালের মধ্যে ইসলামী বিশ্বের চেহারা পাল্টে যায়। এ যুগেই আমীদুল মুলক, নিজামুল মুলক, মুয়াইয়েদুল মুলক শারফুদ্দীন নওশেরওয়াঁ ইবনে খালেদ, কামালুল মুলক এবং মাজদুদ্দীন ইয্যুল মুলকের মত প্রশাসকের আবির্ভাব ঘটে। এ যুগেই কাসীমুদ্দৌলা আক সুনকুর, খাছ বেক বুলুখজুরী, ইমাদুদ্দীন জংগী, আতাবেক ইল্‌দগুজ, সা'দুদ্দৌলা গওহার আইন এবং সাদাকা ইবনে মাজইয়াদের মত সমর বিশারদ ও সেনাধ্যক্ষদের জন্ম হয় এবং ইমাম গাযালী (র), আবু ইসহাক সিরাজী, ইমামুল হারামাইন আবুল মা'আলী আল জুয়াইনী, আবদুল করীম শাহরিস্তানী, আবুল হাসান ফারগানী, আবু বকর শাশী, সাইফুদ্দীন আমেদী, ইলমুদ্দীন সাখাবী, আসীরুদ্দীন আবহুরী, উমর খাইয়াম, ইবনে জাওযী, আবু বকর সাম'আনী, যামাখশারী, মায়দানী, হারীরী, রাগেব ইস্পাহানী, আবদুল কাহের জুরজানী, আবু যাকারিয়া তাবরিযী এবং আবুল বাকা উকবুরীর মত উলামা ও মনীষীবৃন্দ জন্ম লাভ করেন। শায়খ আবদুল কাদের জিলানী, খাযা আবু ইউসুফ চিশতী, খাজা কুতুবুদ্দীন মওদূদ চিশতী, আবুল কাসেম কুশাইরী, শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী এবং শেখ ফরীদুদ্দীন আত্তারের মত বুজর্গানে দ্বীনও এ যুগেই জন্মলাভ করেন। এ সময় ইসলামের ফুল বাগানে এমন সব ফুল প্রস্ফুটিত হয় যা না ফুটলে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি নিসন্দেহে অপূর্ণাংগ থেকে যেতো।

সালজুকদের বৈশিষ্ট্যসমূহ

সালজুক সুলতানদের যেসব বৈশিষ্ট্যের কারণে এসব গৌরবময় সাফল্য বা সাফল্য অর্জিত হয়েছিল তাহলো, দীর্ঘদিন পর্যন্ত তারা তাদের বেদুইন জীবনের সারল্য ও আড়ম্বরহীনতা বজায় রেখেছিল এবং নগর জীবনের আচার-আচরণ গ্রহণ করলেও শুধু ততটুকু করেছিল যতটুকু করলে তুর্কমানী সেনা জীবনের প্রাণসত্তা নষ্ট হতে না পারে। রাষ্ট্রীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তারা

বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ লোককে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেছেন এবং তাঁদেরকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কদর করতে তারা কোনো প্রকার কার্পণ্য করেননি। তাঁদের তত্ত্বাবধানে নিশাপুর, ইস্পাহান, বাগদাদ এবং আরো অনেকস্থানে বড় বড় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আলেম-উলামা ও জ্ঞানী-গুণীদের উৎসাহিত করা হয়েছে এবং সালতানাতের পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন করা হয়েছে। এসবের সাথে রাজনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল এই যে, আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে তারা ছিলেন অত্যন্ত পাকা সুন্নী এবং ধর্মীয় ব্যাপারে অধিকাংশ জনতার মতামত অনুসারে চলাই ছিল তাঁদের নীতি। তাই প্রজাদের মধ্যে তাঁরা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁদের এই বৈশিষ্ট্যকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। সুতরাং হামদুল্লাহ মুসতাউফী লিখেছেন ঃ

ইসলামী যুগে কোনো কোনো শাসকগোষ্ঠী কতকগুলো দোষে দোষী ছিলেন। যেমন, বনী উমাইয়া শাসকগণ যিন্দিক, মু'তাযিলা মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। আব্বাসী খলীফাদের কেউ কেউ মু'তাযিলা এবং বনী লাইস ও বনী বুয়াই রাফেজী ছিলেন। গজনবী ও খাওয়ারিজম শাহীগণও অনুরূপ ছিলেন। কিন্তু সালজুক শাসকগণ এসব দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত ছিলেন। তারা সুন্নী আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন। তারা ছিলেন দানশীল, দয়ালু ও প্রজাহিতৈষী।[১]

আরো একজন লেখক ইবনুর রাওয়ানদী লিখছেন ঃ

সালজুক শাসকদের বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল অত্যন্ত মযবুত। তারা দীনের প্রশিক্ষণ দিতেন। তারা জনকল্যাণকর কাজে যেমন মাদরাসা, খানকা ও মসজিদ নির্মাণ, সরাইখানা তৈরী, মক্কা শরীফ অভিমুখী পথে খাল খনন, আলেমদের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা দান এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের সাহচর্যের জন্য অর্থ ব্যয় করতেন। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপে জনগণকে সচেতন করার জন্য তারা চেষ্টা করতেন। তাছাড়া জ্ঞানী গুণী ও আলেমদের সাথে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালাতেন। এটা ছিল সালজুক সুলতানদের বৈশিষ্ট্য। এভাবে বিশেষ করে ইরাক ও খোরাসানে বহুসংখ্যক আলেম সৃষ্টি হয়েছিল এবং ফিকাহর বহু গ্রন্থ লিখিত হয়েছিল। এতে বে-দীনরা আশাহত হয়েছে এবং দুষ্টরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ইসলামী শরীয়তের বিধান মেনে নিতে ও মুফতীদের অনুগত হয়েছে। শাসক, মন্ত্রী ও আমীর-উমরাগণ শরীয়তের বিধান মোতাবেক রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যয় করতেন। এভাবে তাদের অধিনস্থ সমস্ত অঞ্চলে তা চালু হয়ে যায়।[২]

---

১. তারীখে গুযীদাহ, লাইডেনে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা-৪৩৪

২. রাহাতুস সুদূর, লাইডেনে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা-২৯-৩০।

www.bjilibrary.com

আব্বাসীয় খলীফাদের সাথে সম্পর্ক

ইসলামী রাজনীতিতে সালজুকদের আগমনে একটি বিশেষ পরিবর্তন ঘটলো এই যে, আব্বাসীয় খিলাফতের প্রায় নিবু নিবু প্রভাব-প্রতিপত্তি পুনরায় অনেকটা বহাল হলো। তারা যদিও আব্বাসীয়দেরকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়নি, কিন্তু তারা যেহেতু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের খিলাফতকে স্বীকার করতো, তাই খিলাফতের পদমর্যাদার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন, খলীফার আনুগত্য এবং খিলাফতের অধিকারী পরিবারের উচ্চমর্যাদা ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখার দিক দিয়ে তারা অন্যসব শাসক পরিবারের চেয়ে অধিক তৎপরতা দেখিয়েছেন। তুর্কী উমরা ও বুয়াই খান্দানের যুগে খলীফাদেরকে যেভাবে লাঞ্ছিত করে পদচ্যুত করা হতো এবং তাদেরকে হত্যা করা, অন্ধ করা ও বন্দী করার ঘটনা ব্যাপকভাবে সংঘটিত হতো সালুজক শাসন যুগে তার চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে খলীফারা যখন তাঁদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিরোধমূলক হস্তক্ষেপ করতেন তখন তাদের পক্ষ থেকেও কঠোরতা দেখানো হতো। মালেক শাহ এবং মুক্তাদীর মধ্যে বিরোধ, মুস্তারশিদ ও রাশেদের সাথে মাসউদের লড়াই এবং মুহাম্মাদ ও মুকতাফীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব এ ধরনের ঘটনারই অংশ। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সালজুক সুলতানগণ সামগ্রিকভাবে আব্বাসীয় খলীফাদের সাথে এমন শিষ্ট ও সম্মানজনক আচরণ করতেন যার দৃষ্টান্ত অন্যখানে খুব কমই দেখা যায়। তুগরুল প্রথমবার যখন খলীফা কায়েম বিআমরিল্লাহর সাথে সাক্ষাত করেন তখন খলীফার প্রাসাদের দহলিজ থেকে পায়ে হেঁটে অগ্রসর হন এবং খলীফার সামনে গিয়ে ভূমি চুম্বন করে দণ্ডায়মান হন। মালিক শাহের মত পরাক্রমশালী শাসকও খলীফা মুকতাদীর ওপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যখন তিনি খলীফার দরবারে পৌঁছেন তখন কয়েকবার ভূমি চুম্বন করেন। তাঁর বসার জন্য চেয়ার আনা হলে তিনি আদবের খাতিরে বসতে অস্বীকৃতি জানান, খলীফার হস্ত চুম্বন করার আবেদন জানান। কিন্তু তা মঞ্জুর না হওয়ায় কেবল খলীফার অঙ্গরী বা মোহর চোখে লাগানোকেই যথেষ্ট মনে করেন। এ ছিল খলীফাদের সাথে সালজুক সুলতানদের আচরণ। অথচ সেই সময় খলীফাদের শুধু নৈতিক শক্তি ছাড়া কোনো বস্তুগত শক্তি ছিল না। হয়তো এতে কিছু আন্তরিকতাও থেকে থাকবে। কিন্তু একথা না মেনে পারা যায় না যে, ভক্তি-শ্রদ্ধার এই বহিঃপ্রকাশের পরে অধিকাংশ আহলে সুন্নাতের হৃদয়-মনে একটা বিশেষ প্রভাব পড়তো এবং সর্বসাধারণের পসন্দনীয় এ কাজটি তাঁদের রাজনৈতিক ভিত্তিকে আরো শক্তিশালী করার কারণ হতো।

www.bjilibrary.com

এ প্রভাব বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সালজুকরা খলীফার পরিবারের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও স্থাপন করেছিল।[১] তাই তুগরল আরসালান খাতুনকে (আল্প আরসালানের বোন) খলীফা কায়েমের সাথে বিয়ে দেন এবং অনেক চেষ্টা-তদবির করে নিজেও তাঁর কন্যাকে বিয়ে করেন। তাছাড়া আল্প আরসালান খলীফা মুকতাদীর সাথে তাঁর কন্যাকে বিয়ে দেন এবং পরবর্তী সময়ে মালেক শাহ ও তাঁর কন্যাকে মুকতাদীর সাথে বিয়ে দেন। সুলতান মুহাম্মাদের শাসনকালে মুসতাযহির বিল্লাহর সাথে মালেক শাহের আরেক কন্যার বিয়ে হয়। আত্মীয়তার এসব বন্ধন সালতানাত ও খিলাফতের মধ্যে একটি কল্যাণকর সম্পর্ক হিসেবে প্রমাণিত হয় এবং সামাজিকতার এসব ব্যাপার রাজনীতিতে একটি ইতিবাচক উপাদানের সংযোজন ঘটায়।

সালজুকদের পতন

প্রকৃতি যদি এতটা অকৃপণ হতো যে, মালেক শাহের পরে তাঁর মত আরো দুই-তিনজন শাসক অন্তত জন্মাতেন তাহলে হয়তো ইসলামী বিশ্বের পতন ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর মত ততটা দ্রুতগতিতে হতো না। পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধে নিজামুল মুলকের সুব্যবস্থাপনার কারণে যে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য আরো দুই তিনজন নিজামুল মুলক ও মালেক শাহের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মহান ব্যক্তিগণ এ ক্ষেত্রে সর্বদাই দুর্ভাগ্যবান হয়েছেন যে, তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য কোনো মহান ব্যক্তিকে পাওয়া যায়নি। ৪৮৫ হিজরীতে (১০৯২ খৃষ্টাব্দ) মালেক শাহের মৃত্যুর সাথে সাথে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী উপাদানসমূহ আগ্নেয়গিরির লাভার মত ছড়িয়ে পড়ে। মালেক শাহের চার পুত্র মাহমুদ, বার কিয়ারুক, মুহাম্মাদ এবং সানজার পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তুরকান খাতুন এবং তাজুল মুলকের ষড়যন্ত্র প্রথমত এ আগুন প্রজ্জ্বলিত করে এবং একবার প্রজ্জ্বলিত হওয়ার পর তা এমনভাবে সবকিছুকে গ্রাস করে যে, দীর্ঘ তের বছর পর্যন্ত তা জ্বলতে থাকে এবং সালজুক সালতানাতের প্রাণসত্তাকে জ্বালিয়ে নিঃশেষ না করা পর্যন্ত নির্বাপিত হয়নি। দীর্ঘস্থায়ী এ গৃহযুদ্ধের অগণিত ক্ষতির সবচেয়ে বড় যে ক্ষতি হয়েছে তাহলো, এতে সালজুক সালতানাতের বুনিয়াদ নড়বড়ে করে দেয় এবং জাতি হিসেবে মুসলমানদের শক্তি এমন একটি আঘাত পায় যার ক্ষতিপূরণ কখনো সম্ভব হয়নি।

---

১. খলীফাদের পরিবারের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে বুয়াই খান্দানও গাফিল ছিল না। তাই ইযযুদ্দৌলা তাঁর কন্যাকে বিয়ে করার জন্য আত্ তায়ে' বিল্লাহকে পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু আত্ তায়ে' তা ভাল করেননি এবং তাঁর পরবর্তী অন্য কোনো খলীফাও বুয়াই খান্দানের কোনো মেয়েকে গ্রহণ করতে রাজি হননি।

www.bjilibrary.com

বাতেনী আন্দোলন

সালজুকদের গৃহযুদ্ধের প্রথম ক্ষতি হচ্ছে, এতে ইসলামী বিশ্বে বাতেনীদের গোপন আন্দোলন বিস্তার লাভ করার সুযোগ পায়। মহামারির জীবানু মানব দেহে ছড়ালে যে প্রতিক্রিয়া হয় এ আন্দোলন ইসলামের দেহে ছড়িয়ে সেই একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। মালেক শাহের শাসন যুগের একেবারে শেষ দিকে এ আন্দোলন রাজনৈতিক ময়দানে পা রাখে। নিজামুল মুলকের হত্যাকাণ্ড এতবড় একটা মারাত্মক ঘটনা ছিল যে, যদি তখনই এদিকে মনযোগ দেয়া হতো তাহলে তা সমূলে উৎপাটিত করা যেতো। কিন্তু মালেক শাহের উত্তরাধিকারীরা সেদিক থেকে চোখ বন্ধ করে পরস্পর গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এ অবকাশে এ আন্দোলনটি কয়েক বছরের মধ্যেই তার সামরিক ও গোপন কর্মকাণ্ড এমন শক্তিশালী করে নেয় যে, সুলতান মুহাম্মাদ ও সানজার তাঁদের পুরো শক্তি কাজে লাগিয়েও তা ধ্বংস করতে ব্যর্থ হন। এ আন্দোলন আল-মাওত, তাবাস, যাওয়ান, কায়েন, তূন, সানামকুহ, খালিনজান, গির্দকুহ, খোর, খাওসাফ, উসতাওয়ান্দ, শাহওয়ারা, আরওয়াহান, কিলআতুন নাযের, কিলআতুত তাবুর এবং এ রকম আরো বহু দুর্গে সামরিক শক্তির সমাবেশ ঘটায়। মুসলমানদের বড় বড় জেনারেল ও নেতাকে বেছে বেছে গোপনে হত্যা করতে থাকে। আবদুর রহমান সুমাইরী, উনরুবুলকা, জানাহুদ্দৌলা, কাযী আবুল আলা সায়েদ নিশাপুরী ফখরুল মুলক, কাযী আবদুল ওয়াহেদ, আমীর মাওদূদ, আহমদীল ইবনে ওয়াহসুয়ান, কাযী আবু সা'দ আল হারাবী, আবদুল লতিফ খুজান্দী, খলীফা মুস্‌তারশিদ, খলীফা রাশেদ, আতাবেক আক সুনকুর বুরসুকী, মুঈনুল মুলক্ আবু নাসর এবং তাদের মত সমকালীন আরো অনেক মনীষী বাতেনী আন্দোলনের কর্মীদের হাতে নিহত হন। তাছাড়াও বহুসংখ্যক সাধারণ মুসলমানকে ধোঁকা ও প্রতারণার সাহায্যে হত্যা করা হয়। সুলতান মুহাম্মাদের সময়ে শুধু ইস্পাহানে যে ষড়যন্ত্র উদঘাটিত হয়েছিল সেখানেই কেবল একটি স্থান থেকে প্রায় পাঁচ শ' মুসলমানের লাশ উদ্ধার করা হয়েছিল।[১] এসব ঘটনার কারণে ইসলামী জগতে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় যার কারণে রাজনীতি, সামাজিক কাজ-কর্ম, অর্থনীতি এবং সভ্যতা ও তামাদ্দুনের গোটা ব্যবস্থাই অচল হয়ে যায়।

ক্রুসেড যুদ্ধের শুরু

এর ফলে দ্বিতীয় ক্ষতি হয়েছে এই যে, মুসলমানদেরকে পরস্পর দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত দেখে ইউরোপের ফিরিঙ্গী জাতিগুলোর মধ্যে পুনরায় সাহস সঞ্চিত হয় এবং চার শত বছরের প্রতিষ্ঠিত ত্রাশ ও ভয়ভীতি ক্ষণকালের মধ্যে

১. রাহাতুস সুদূর, লাইডেনে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা-১৫৮।

www.bjilibrary.com

তাদের মন থেকে উবে যায়। ইতঃপূর্বেকার গৃহযুদ্ধের সময়ে কেবল সীমান্তের ওপর আক্রমণ হতো এবং সমুদ্রোপকূল ও সীমান্ত সংলগ্ন ছোট-খাট এলাকা রোমানরা দখল করে নিতো। কিন্তু এবারকার গৃহযুদ্ধের প্রভাব রোমান সাম্রাজ্য ডিঙিয়ে ইউরোপের দূরবর্তী দেশসমূহেও গিয়ে পৌছে এবং সেখান থেকে ক্রুসেড যোদ্ধারা বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত আসতে থাকে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে যেসব পবিত্র স্থান খৃষ্টানদের হাতছাড়া হয়েছিল তা মুসলমানদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া। মালিক শাহের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর ৪৯০ হিজরীতে (১০৯৭ খৃঃ) ক্রুসেডের এই প্লাবন ইসলামী অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয় এবং কুনিয়ার সালজুক রাষ্ট্রকে পদানত করে এনতাকিয়া পর্যন্ত এসে থামে। ৪৯১ হিজরীতে (১০৯৮ খৃঃ) আরা এনতাকিয়া দখল করে এবং সিরিয়ার দিকে অগ্রাভিযান চালাতে থাকে। এক বছরের মধ্যে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন ধ্বংসযজ্ঞ চালায় যে, সমগ্র ইসলামী জগত এতে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে এবং খলীফা সুলতান বারকিয়ারুক ও সুলতান মুহাম্মাদকে পারস্পরিক যুদ্ধ পরিত্যাগ করে প্রথমে বাইরের শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য আকুল আহ্বান জানান। কিন্তু যুদ্ধমত্ত দুই ভাইয়ের চোখ তাতেও খোলেনি। অবশেষে ৪৯২ হিজরীতে (১০৯৯ খৃঃ) বায়তুল মুকাদ্দিসও মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং প্রথমবারের মত খৃষ্টবাদের হাতে ইসলাম এমন জঘন্যভাবে পরাজিত হয় যে, খালেদ ইবনে ওয়ালীদ থেকে আল্‌প আরসালান পর্যন্ত যুদ্ধ বিজয়ী জানকবুল গাজীদের সবারই কৃতিত্ব যেন ধুয়ে মুছে যায়। এটা ছিল গৃহযুদ্ধের সবচেয়ে ভয়াবহ পরিণাম। মালেক শাহের জীবদ্দশায় যে বিশাল ও শক্তিধর সালতানাতের দিকে চোখ তুলে তাকানোর হিম্মতও বিদেশী শক্তির হতো না সাত বছরের মধ্যে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি এমনভাবে নষ্ট হলো যে, তার অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ ইউরোপের দূরবর্তী দেশের ভাগ্যান্বেষী ফিরিঙ্গিরা অতি সহজেই বিনা বাধায় দখল করে নিল।

সালজুকদের ধ্বংস

সালজুকদের গৃহযুদ্ধের কারণে তৃতীয় ক্ষতি হয় এই যে, কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হওয়ার সাথে সাথে সালতানাত ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হতে শুরু করে। সালতানাতের কোনো কোনো অংশে স্বাধীন সালজুক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কোনো কোনো অংশ উমরাগণ কুক্ষিগত করে নেয়। রোমকে কুতলুমিশ ইবনে আরসালানের খান্দান দখল করে নেয়। সিরিয়ায় তুতুশ ইবনে আরসালানের খান্দান তাঁদের শাসন কায়েম করে। ইরাকে মুহাম্মাদ ইবনে মালেক শাহের খান্দান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয় এবং কিরমানে কাদার্ত ইবনে দাউদের খান্দান স্বাধীন হয়ে যায়। এসব সালজুকী খান্দান ছাড়াও তাঁদের তুর্কী দাসেরাও এই উত্তরাধিকারের বিরাট একটা অংশ হস্তগত করে। মুসেলে

www.bjilibrary.com

আতাবেক আক সুনকুর বুরসকীর খান্দান তাদের স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কায়েম করে যা পরবর্তী সময়ে সমগ্র সিরিয়া ও আল জাযিরাকে দখল করে নেয়। খাওয়ারিজমের ওপর আনুশতুগীনের খান্দান চেপে বসে এবং শেষ পর্যন্ত তারাই সালজুকদের ধ্বংস সাধন করে। আজারবাইজানে আতাবেক ইলদাগুজের খান্দান তাদের আসর বসান। দিয়ারে বকর ও ফারেসে উরতুক এবং সালখার খান্দান শাসনকর্তা হয়ে বসে এবং দামেশক, ইরবেল, আর্মেনিয়া, লোরিস্তান ও কিরমানেও অন্যান্য দাস ও আতাবেকীরা সালজুকদের স্থান দখল করে। এভাবে যে সালতানাত এক সময় এশিয়ার বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল তা অনেকগুলো ছোটবড় খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়।

এ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে সুলতান সানজারের কারণে অনেকটা ঐক্য বজায় ছিল। গৃহযুদ্ধকালে খোরাসান ও মধ্য এশিয়া তাঁর কারণেই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। সুলতান মুহাম্মাদের ইনতিকালের পর (৫১১ হিজরী মোতাবেক ১১১৭ খৃষ্টাব্দ) তিনি কিরমান, ইরাক এবং কুর্দিস্তানের সালজুক রাষ্ট্রসমূহের ওপর তাঁর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করেন। গযনী ও গওরের যে শক্তি মালেক শাহের যুগেও সালজুক প্রভাব থেকে স্বাধীন ছিল তাকেও তিনি অধিনস্থ করেন। খাওয়ারিজম শাহীকে তার নিরবচ্ছিন্ন বিদ্রোহ সত্ত্বেও আনুগত্য করতে বাধ্য করেন এবং গোটা ইসলামী দুনিয়ায় এতখানি প্রভাব বিস্তার করেন যে, এক সময়ে মধ্য এশিয়া থেকে সিরিয়া পর্যন্ত তাঁর নামে খোতবা পাঠ করা হতো। কিন্তু শাসনকালের শেষ দিকে খাতা এবং গুজের তুর্কীরা তাঁর শক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলে এবং ৫৫২ হিজরীতে (১১৫৭ খৃঃ) তাঁর ইনতিকালের সাথে সাথেই সালজুকদের গৌরব ও শান-শওকতের চিরতরে পতন ঘটে। ৫৫২ হিজরী (১১৫৭ খৃঃ) থেকে ৫৯০ হিজরী (১১৯৪ খৃঃ) পর্যন্ত সময়কালটা এমনভাবে অতিবাহিত হয় যে, সালজুকদের পরিত্যক্ত উত্তরাধিকারকে খাওয়ারিজম শাহী[১] সুলতানগণ ক্রমান্বয়ে উসূল করতে থাকে। মধ্য এশিয়া, খোরাসান, রায়, ইস্পাহান, কিরমান এবং ইরাক এক এক করে তাদের অধিকারে চলে যায় এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে শুধুমাত্র রোম ছাড়া মধ্যপ্রাচ্য এবং নিকট প্রাচ্যে সালজুকদের নাম-নিশানা পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

সালজুক শাসনের ছয়টি যুগ

এটি সালজুক খান্দানের ইতিহাসের একটি সার্বিক রূপরেখা। এ রূপরেখার ওপর দৃষ্টি ফেললে আপনি বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগকে স্পষ্ট সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত বিভক্ত দেখতে পারেন।

১. "খাওয়ারিজম শাহ" উপাধি মূলত খাওয়ারিজমের গভর্নরের জন্য ব্যবহৃত হতো। কিন্তু এখানে এ দ্বারা বুঝানো হয়েছে সেসব খাওয়ারিজম শাহী পরিবারকে যারা প্রথমদিকে সালজুকদের অনুগত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে স্বাধীন হয়ে তাদের উত্তরাধিকারী হয়।

www.bjilibrary.com

প্রথম যুগটি পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে শুরু হয়ে ৪২৯ হিজরীতে (১০৩৭ খৃঃ) শেষ হয় অর্থাৎ যে সময় তুগরুল নিশাপুরের সিংহাসনে বসেন। এটি সালজুকদের "আবির্ভাবকাল"।

৪২৯ হিজরী (১০৩৭ খৃঃ) থেকে ৪৫৫ হিজরী (১০৬৩ খৃঃ) পর্যন্ত দ্বিতীয় যুগ। এ যুগেই তুগরুল একাধারে ২৬ বছর লড়াই করে একটি বিশাল সালতানাতের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাই এ যুগটিকে আমরা প্রতিষ্ঠা যুগ বলতে পারি।

৪৫৫ হিজরী (১০৬৩ খৃঃ) থেকে ৪৮৫ হিজরী (১০৯২ খৃঃ) পর্যন্ত সময়কাল তৃতীয় যুগ। এ সময়ে আল্প আরসালান এবং মালেক শাহের বাদশাহী শাসন ও নিজামুল মুলকের মন্ত্রীত্ব সালজুক সালতানাতকে উন্নতি ও গৌরবের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছিয়ে দেন। সত্যিকার অর্থে এ যুগটি ছিল সালজুকদের 'উত্থান যুগ'।

৪৮৫ হিজরী (১০৯২ খৃঃ) থেকে ৪৯৮ হিজরী (১১০৪ খৃঃ) পর্যন্ত সময়কালটা সালজুক ইতিহাসের চতুর্থ যুগ। এ যুগে মালেক্র শাহের পুত্রেরা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই ও সংঘাতে লিপ্ত থাকে। তাই এটি গৃহযুদ্ধের যুগ।

৪৯৮ হিজরী (১১০৪ খৃঃ) থেকে ৫৫২ হিজরী (১১৫৭ খৃঃ) পর্যন্ত সময়কালটি সালজুক ইতিহাসের পঞ্চম যুগ। আমরা দেখি এ যুগে মুহাম্মাদ এবং সানজার তাঁদের খান্দানের পতনমুখী শক্তিকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করছেন। এটি সালজুক সালতানাতের পতন যুগ।

৫১১ হিজরী (১১১৭ খৃঃ) থেকে ৭০০ হিজরী (১৩০০ খৃঃ) পর্যন্ত সময়কালটি সালজুক ইতিহাসের ষষ্ঠ ও শেষ যুগ। এ সময়ে বিভিন্ন সালজুক খান্দান তাঁদের পিতৃ পুরুষের বিশাল সালতানাতের বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অংশের ওপর অধিকার জমিয়ে বসে এবং বিভিন্ন সময়ে এক এক করে তা হারিয়ে ফেলে। এ যুগটিকে আমরা বিশৃঙ্খলার যুগ নামে আখ্যায়িত করতে পারি।

এ গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায় এসব যুগ অনুসারে বিভক্ত হবে। তবে শুধু রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এসব ইতিহাসের সাথে সাথে তাহযীব তামাদ্দুনের ইতিহাস বর্ণনা করাও আমাদের উদ্দেশ্য। তাই গ্রন্থের শেষের দিকে সালজুক শাসন যুগের সভ্যতা-সংস্কৃতি

www.bjilibrary.com

সম্পর্কে একটি বিস্তারিত অধ্যায় লিপিবদ্ধ করা হবে। এতে সেই যুগের সভ্যতা-সংস্কৃতির সমস্ত দিক সম্পর্কে যথাসম্ভব আলোচনা করা হবে।

আবুল আ'লা মওদূদী
৩রা জুন, ১৯২৯ইং
হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য

দ্রষ্টব্য ঃ অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার হলো গ্রন্থখানি শুধু তৃতীয় যুগের ঘটনাবলী পর্যন্তই লেখা সম্ভব হয়েছে। পরবর্তী যুগসমূহের ইতিহাস লেখার অবকাশ গ্রন্থকার পাননি।

—প্রকাশক

www.bjilibrary.com

সালজুক ইতিহাসের উৎসসমূহ

এ গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে যেসব গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে এখানে তার তালিকা উল্লেখ করা অপ্রয়োজনীয়। কেননা লেখার সময় যথাস্থানে তার বরাত দেয়া হয়েছে। তবে আমাদের কাছে সালজুকদের ইতিহাস জানার সত্যিকার উপায় ও মাধ্যম কোনটি এবং তা কতটা নির্ভরযোগ্য তা উল্লেখ করার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। এ বিষয়টি সামনে রেখে এখানে প্রকৃত উৎসসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পেশ করা হচ্ছে।

১. তারীখে বায়হাকী

এ গ্রন্থখানা আবুল ফযল বায়হাকী কর্তৃক রচিত। এ গ্রন্থ থেকে আমরা সালজুকদের আবির্ভাব যুগ সম্পর্কে যেসব তথ্য পাই তা আর কোনো মাধ্যম থেকে পাই না। এর রচয়িতা নিজে সে যুগে বেঁচে ছিলেন। তাঁর নিজের বর্ণনা অনুসারে ৪০২ হিজরীতে তাঁর বয়স ছিল ১৬ বছর।[১] এদিক থেকে বিচার করলে সালজুকদের আবির্ভাব যুগের পুরোটাই তিনি নিজ চোখে দেখেছেন। তাছাড়া যুগের রাজনীতির সাথে তিনি সরাসরি জড়িত ছিলেন। তাঁর উস্তাদ আবু নসর সুলতান মাসউদ গযনবীর দরবারে 'দিওয়ানে রিসালত' ছিলেন।[২] আর তিনি নিজে আবু নসরের অধীনে নয় বছর পর্যন্ত সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করেছেন। ৪৩১ হিজরীতে আবু নসরের ইনতিকালের পরে আবু সাহল যাওয়্যানী দিওয়ানে রিসালাতের পদে নিয়োজিত হলে এ গ্রন্থের রচয়িতাকে তার সহকারীর দায়িত্ব দেয়া হয়।[৩] মাসউদ গযনবী এবং সালজুকদের মধ্যে যেসব লড়াই হয় তিনি তা নিজ চোখে দেখেছেন এবং সেই সময় গযনবী ও সালজুকদের মধ্যে ঐসব যুদ্ধের সামরিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিষয়সমূহ নিয়ে যেসব চিঠিপত্র বিনিময় হয় সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকার কারণে তিনি নিজে তা সরাসরি দেখার সুযোগ পেয়েছেন। তাছাড়াও তিনি যেহেতু উজীরে আজম এবং দিওয়ানে রিসালতের দায়িত্বশীলের অনেক গোপন বিষয় জানতেন এবং তাদের বিশ্বাসভাজন ছিলেন। তাই তিনি তাদের সব গোপনীয় পরামর্শে শরীক থাকতেন যে বিষয়গুলো তিনি ছাড়া আর কেউ-ই জানতে পারতো না।

---

১. তারীখে বায়হাকী, কলিকাতায় মুদ্রিত, পৃষ্ঠা-২৪৬।

২. 'দিওয়ানে রিসালত' সে যুগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ ছিল। সব গভর্নর, উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ এবং অন্যান্য দেশের বাদশাহ ও শাসকবর্গের যেসব পত্রাবলী আদান-প্রদান হতো তা তাঁর মাধ্যমেই হতো। তাই ঐ পদটি এ যুগের চীফ সেক্রেটারী এবং পররাষ্ট্র বিষয়ক দায়িত্বশীলদের সম্মিলিত দায়িত্বের সমমর্যাদাসম্পন্ন ছিল।

৩. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৭৫৩-৭৫৪।

www.bjilibrary.com

তাঁর গ্রন্থের আরেকটি বৈশিষ্ট হলো, তিনি গযনবীদের সাথে সম্পর্কিত হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় তাদের দুর্বলতা বর্ণনা করেছেন এবং যেসব কারণে গযনবীদের পতন আর সালজুকদের উত্থান ঘটেছিল তা সবিস্তারে প্রকাশ করেছেন। এই ইতিহাসের সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় যদি সংরক্ষিত হতো তাহলে মাহমুদ গযনবীর সাথে সালজুকদের প্রথম যুগের আচরণ সম্পর্কেও আমরা বহু তথ্য লাভ করতে পারতাম। এভাবে হয়তো সেসব মতবিরোধ সহজেই দূরীভূত হতো যা এ বিষয়ে বর্তমান ইতিহাসে পাওয়া যায়। তবে পরিতাপের বিষয় হলো এর শুধু ততটুকুই পাওয়া যায় যা কেবল মাসউদের জীবন ও কর্মের সাথে সম্পৃক্ত।

২. যায়নুল আখবার

এ গ্রন্থখানা আবু সাঈদ আবদুল হাই ইবনুদ দাহহাক ইবনে মাহমুদ গারদিজী কর্তৃক রচিত। সালজুক যুগের প্রথম দিকের ইতিহাস সম্পর্কে সমকালীন সাক্ষ্য-প্রমাণ তুলে ধরার দিক দিয়ে বায়হাকীর পরে দ্বিতীয় পর্যায়ে এ গ্রন্থের স্থান। লেখক নিজে সুলতান মাহমুদ এবং মাসউদের সময়ে জীবিত ছিলেন। সুলতান আবদুর রশীদ গযনবীর (৪৪০ হিজরী থেকে ৪৪৪ হিজরী পর্যন্ত) রাজ দরবারে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনিই এ গ্রন্থ লিখেছিলেন। বায়হাকীর তুলনায় এর অধিক অগ্রগণ্যতা একটি কারণ হচ্ছে বায়হাকী শুধু মাসউদ গযনবীর যুগের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ গ্রন্থের লেখক মাসউদেরও পূর্বের মাহমুদের সময়ে সালজুক আবির্ভাব ও আত্মপ্রকাশের অবস্থা উল্লেখ করেছেন। অথচ ঐ সময় সম্পর্কে সমকালীন সাক্ষ্য-প্রমাণ বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে আর নেই। এ বছরই এ গ্রন্থখানা মিঃ ব্রাউনের স্মৃতিস্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে।

৩. যুবদাতুন নুসরাহ

এ গ্রন্থ মূলত শারফুদ্দীন নওশেরওঁয়া ইবনে খালেদের রচিত। তিনি সুলতান মুহাম্মাদ ইবনে মালেক শাহের (৪৯৮ হিজরী মোতাবেক ১১০৪ খৃঃ-৫১১ হিজরী মোতাবেক ১১১৭ খৃঃ) যুগে অর্থ মন্ত্রী ও সহকারী মন্ত্রীর পদমর্যাদায় অভিষিক্ত ছিলেন এবং সুলতান মাহমুদ ইবনে মুহাম্মাদের (৫১১ হিজরী—৫২৫ হিজরী মোতাবেক ১১১৭ খৃঃ—১১৩১ খৃঃ) সময় প্রধানমন্ত্রীত্বও লাভ করেছিলেন।[১] তিনি ফারসী ভাষায় "ফুতুরু যামানিস সুদূর ওয়া সুদূরু যামানিল ফুতূর" নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এ গ্রন্থে নিযামুল মুলকের শাসন কালের মধ্যভাগ থেকে তুগরুল ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মালেক শাহের শাসন

১. যুবদাহ, লাইডেনে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা-৯৭, ১০৯, ১৪৯।

www.bjilibrary.com

রাজত্বের শেষভাগ পর্যন্ত সময়ের সমস্ত জীবনের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ইমাদুদ্দীনের কাতিব ইস্পাহানী (মৃত্যু ৫৯৭ হিজরী) 'নুসরাতুল ফাতরা ওয়া আসরাতুল ফিতরা' নামে তা আরবীতে অনুবাদ করেন এবং পূর্ণতাদানের জন্য প্রথম দিকে আমীদুল মুলক আবু নাসর কুন্দরীর (তুগরুল বেগের উজীর) সময় থেকে নিজামুল মুলকের শাসন যুগের মধ্যভাগ পর্যন্ত এবং শেষের দিকে তুগরুল ইবনে মুহাম্মাদের সময় থেকে ইরাকী সালজুকদের শেষ যুগ পর্যন্ত সময়ের উজীরদের ইতিহাস সংযোজিত করেছে। নওশেরওঁয়ার মত ইমাদুদ্দীনের সেক্রেটারী নিজেও সেই যুগের রাজনীতির সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন। তার চাচা ইযযুদ্দীন মুসতাওফা সুলতান মাহমুদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মালেক শাহের (৫১১ হিজরী থেকে ৫২৫ হিজরী) যুগে মন্ত্রীত্ব এবং দিওয়ানে ইসতিফার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং এক সময়ে তাঁকে মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বানও জানানো হয়েছিল।[১] তার পিতা মুহাম্মদ সুলতান মাহমুদের মন্ত্রী আদদার কাযিনীর বন্ধু ছিলেন এবং শেষের দিকে দরবারী ষড়যন্ত্রের শিকার হন।[২] ইমাদুদ্দীন নিজে খলীফা আল মুকতাফী লি আমরিল্লাহর যুগে ইবনে হুবায়রার মন্ত্রীর সহকারী ছিলেন (৫৫৪ হিজরী)।[৩] ইমাদুদ্দীন কাতিবের পর আবুল ফাত্তাহ বুন্দারী (মৃত্যু ৬২৩ হিজরী) "যুবদাতুন নাসরা ওয়া নুখবাতুল আসরা" নামে ঐ গ্রন্থের সারসংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করেন। তবে প্রয়োজনীয় একটি কথাও যাতে বাদ না পড়ে সেদিকে তিনি গুরুত্ব দেন। প্রাচ্যবিদ হোৎসমা এ গ্রন্থখানিই সম্পাদনা করে লাইডেন থেকে প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থ থেকে আমরা মহান সালজুক শাসকবর্গ এবং ইরাকী সালজুকদের সম্পর্কে অতি মূল্যবান তথ্যাবলী পেয়ে থাকি। যেহেতু এ গ্রন্থখানি এমন দু'জন লেখকের শ্রমের ফসল যারা সালজুক রাজনীতির অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়সমূহ জানতেন তাই এর মাধ্যমে এমন সব গোপনীয় বিষয়াবলী জানা যায় যা অন্য লেখকদের দৃষ্টির আড়ালে ছিল।

৪. রাহাতুস সুদূর

এ গ্রন্থখানি আবু বকর নাজমুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনুর রাওয়ানদী কর্তৃক ৫৯৯ হিজরী সনে (১২০২ খৃঃ) লিখিত। লেখক রাওয়ানদী ছিলেন একটি শিক্ষিত ও জ্ঞান পিপাসু পরিবারের লোক। তার মামা তাজুদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী আর রাওয়ানদী ছিলেন তাঁর শিক্ষক ও অভিভাবক। তিনি হামদানের জামালুদ্দীন আয়আবার মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন। লেখক ৫৭০ হিজরী থেকে ৫৮০ হিজরী পর্যন্ত প্রায় দশ বছর তাঁর তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ

১. যুবদাহ, লাইডেনে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা-১২৯, ১৩৬, ১৪১।
২. যুবদাহ, লাইডেনে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা-১৩১, ১৫৪।
৩. যুবদাহ, লাইডেনে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা-২৯০।

www.bjilibrary.com

করেন। তাঁর সাথেই তিনি ইরাকের বড় বড় নগর ভ্রমণ করেন। তাঁর আরেক মামা যায়নুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী আর রাওয়ানদী ইরাকের সর্বশেষ সালজুক শাসক তুগরুল ইবনে আরসালানের উস্তাদ ছিলেন। লেখক সর্বপ্রথম তাঁর মাধ্যমে একজন চিত্রকর হিসেবে সুলতান তুগরুলের দরবারে পৌঁছেন।[১] ধীরে ধীরে তিনি সুলতানের নৈকট্যলাভ করেন। তাঁর নিজের বর্ণনা মতে, তিনি সুলতানের সব ব্যাপারেই বেশ দখল জমিয়ে নেন।[২] ৫৮৫ হিজরীতে (১১৮৯ খৃঃ) সুলতান তুগরুল যায়নুদ্দীনকে শাহ মাজেন্ দারানের কাছে দূত হিসেবে প্রেরণ করেন এবং লেখকও তাঁর সাথে যান।[৩] ৫৮৬ হিজরীতে (১১৯০ খৃঃ) যখন আতাবেক কিযল আরসালান সুলতান তুগরুলকে বন্দী করেন তখনও লেখক রাজধানীতে ছিলেন।[৪] এভাবে মুরুব্বী তথা গ্রেফতারীর পর তিনি হামদানের আমীর সাইয়েদ ফখরুদ্দীন আলাউদ্দৌলা আরব শাহের পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। ৫৯০ হিজরীতে (১১৯৪ খৃঃ) খাওয়ারিজম শাহের সাথে লড়াইয়ে তুগরুল নিহত হলে এবং দেশে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা ছড়িয়ে পড়লে লেখক নিভৃত জীবন শুরু করেন। সেই সময়ের ঘটনাবলী অত্যন্ত মর্মান্তিক ভাষায় বর্ণনা করেছেন। নিভৃত জীবন-যাপনের এই বিশেষ সময়ে তিনি এ গ্রন্থ রচনা এবং সালজুক খান্দানের সাথে আত্মিক সম্পর্কের কারণে কাওনিয়ার সালজুক শাসনকর্তা গিয়াসউদ্দীন কায়খসরুর নামানুসারে গ্রন্থের নামকরণ করেন। এ গ্রন্থে তিনি সালজুক শাসনের প্রারম্ভ থেকে ৫৯৫ হিজরী পর্যন্ত সময়ের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন। যদিও প্রারম্ভিক কালের ঘটনা সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা ততটা নির্ভরযোগ্য নয়। এ ক্ষেত্রে তিনি জহীরুদ্দীন নিশাপুরীর গ্রন্থ 'সালজুকনামার' ওপর বেশী নির্ভর করেছেন।[৫] তিনি গ্রন্থখানা অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে লিখেছেন শুধু তাই নয়, বরং বিভিন্ন জায়গায় ভুলও করেছেন। তবে তিনি নিজের যুগের যে অবস্থা ও ঘটনাবলী লিখেছেন তা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও উপকারী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্বলিত।[৬]

৫. তারীখুল কামেল

এ গ্রন্থখানা বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনুল আসীর (মৃত্যু ৬৩০ হিজরী) কর্তৃক রচিত এবং ব্যাপক তথ্য বিশ্লেষণমূলক বর্ণনা ও সুবিন্যস্ততার দিক দিয়ে

১. রাহাতুস সুদূর, পৃষ্ঠা-৩৪।

২. লেখক বিশেষ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা দ্বারা সুলতানের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা অনুমান করা যায়।

৩. রাহাতুস সুদূর, পৃষ্ঠা-৩৫৭।

৪. রাহাতুস সুদূর, পৃষ্ঠা-৩৬২।

৫. রাহাতুস সুদূর, পৃষ্ঠা-৩০, ৩৮

৬. রাহাতুস সুদূর, পৃষ্ঠা-৬৪, ৬৫, জহীরুদ্দীন লেখকের আত্মীয় এবং সুলতান আরসালানের আত্মীয় ছিলেন।

www.bjilibrary.com

ইসলামের ইতিহাসের বিশেষ নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। লেখক যদিও সালজুকদের সমসাময়িক ছিলেন না। কিন্তু অতি নিকটবর্তী যুগের লোক ছিলেন। তার কাছে এ বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহের সর্বোত্তম মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ ছিল। এ উদ্দেশ্যে তিনি সমকালীন ইতিহাসকেই বেশী কাজে লাগিয়েছেন আর তার সাহায্যে মহান সালজুক নৃপতিগণ এবং ইরাক ও সিরিয়ার সালজুক শাসকবর্গ সম্পর্কে অতি প্রয়োজনীয় বিস্তারিত তথ্য লাভ করা যায়। এখন আমার সামনে এ গ্রন্থের মিসরীয় এবং ইউরোপীয় সংস্করণের বর্তমান। যে-ক্ষেত্রে ইউরোপীয় কপির বরাত দেয়া হয়েছে সেখানে ইউরোপে মুদ্রিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যে ক্ষেত্রে মিসরীয় কপির বরাত দেয়া হয়েছে সেখানে উল্লেখ করা হয়নি।

৬. ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান

এ গ্রন্থখানা আল্লামা ইবনে খাল্লিকানের (মৃত্যু ৬৮১ হিজরী) রচিত। এ গ্রন্থ থেকে আমরা সালজুক যুগের বড় বড় সরকারী কর্মচারী ও দায়িত্বশীলদের জীবন কথা সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্যাদি পেয়ে থাকি। তিনি এমন একজন অনুসন্ধিৎসু গবেষক যে, মুসলিম ঐতিহাসিকদের প্রথম কাতারে তাকে স্থান দেয়া হয়েছে। এ কারণে তাঁর নিকটবর্তী সময়ের ব্যাপারে তার বর্ণনাসমূহ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা হয়ে থাকে।

৭. আল মুখতাসার ফী আখবারিল বাশার

এ গ্রন্থ বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফিদা (মৃত্যু ৭৩২ হিজরী) কর্তৃক রচিত। এ গ্রন্থকে ইসলামী ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। তাঁর খান্দান সালজুকদের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল এবং তাদের সম্পর্কে সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের বর্ণনা তার আয়ত্বের মধ্যেই ছিল। রাজনৈতিক তথ্যাবলী ছাড়া তিনি জ্ঞান ও সামাজিক ব্যাপার সম্পর্কেও অতি প্রয়োজনীয় তথ্যাবলীও সরবরাহ করেন।

৮. তারীখে গুযীদাহ

হামদুল্লাহ ইবনে আবু বকর মুসতাওফা কাযবিনী এর গ্রন্থের রচয়িতা। ৭৩০ হিজরী সনে এ গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। খুব একটা নির্ভরযোগ্য যেমন না তেমনি খুব বিস্তারিতও না। এসব সত্ত্বেও গ্রন্থকার সংক্ষিপ্তাকারে সালজুকদের সবগুলো খান্দান ও গোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন। এর বর্ণনা যেসব ক্ষেত্রে প্রাচীন উৎসসমূহের বিপরীত বা পরিপন্থী নয় সে ক্ষেত্রে আমরা এর প্রমাণ পেশ করতে পারি।

www.bjilibrary.com

৯. রওজাতুস সাফা

এটি মীর খান্দ মুহাম্মাদ ইবনে খাওয়ান্দ শাহ মাহমুদের (মৃত্যু ৯০৩ হিজরী) বিখ্যাত গ্রন্থ। পূর্ব পশ্চিম সর্বত্রই তাঁর এ গ্রন্থের জনপ্রিয়তা আছে। যদিও আরবের ইতিহাস সম্পর্কে তার বর্ণনার বেশীর ভাগই নির্ভরযোগ্য নয়, কিন্তু আজম বা অনারবদের ইতিহাসের ক্ষেত্রে তিনি অধিক বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন। তাঁর এ গ্রন্থের তথ্য-উৎসের মধ্যে তিনি তারীখে বায়হাকী, তবকাতে নাসেরী, যুবদাতুত্ তাওয়ারীখ, তারীখে জাহাঁ কাশায়, তারীখে গুযীদা এবং জামেউত্-তাওয়ারীখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। সালজুকদের ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি এমন বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর বর্ণনা প্রাচীন ঐতিহাসিকদের চেয়ে ভিন্ন দেখা যায়। আমি সাধারণভাবে গোটা গ্রন্থের ওপর নির্ভর করেছি। তবে ভিন্ন মতের বিষয়গুলো পরিহার করেছি।

১০. হাবীবুস্ সিয়ার

মীর খান্দের পুত্র গিয়াসউদ্দীন ওরফে খান্দ এ গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি ৬২৭ হিজরীতে দাক্ষিণাত্যে বসে এ গ্রন্থ লেখেন এবং ইরানের শাহ ইসমাঈল সাফাবীর নামে এর নামকরণ করেন। এর বেশীর ভাগই রওজাতুস সাফা গ্রন্থের সারসংক্ষেপ। তাছাড়া কিছু কিছু অতিরিক্ত তথ্যও আছে। তাই রওজাতুস্ সাফার সাথে সাথে এ গ্রন্থখানির অধ্যয়নও প্রয়োজনীয়।

১১. মুখতাসার সালজুকনামা

এ গ্রন্থখানি মূলত নাসেরুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে বিবির গ্রন্থ "আল আওয়ামেরুল আলানিয়া ফিল উমূরিল আলাঈয়ার" সারসংক্ষেপ। নাসেরুদ্দীনের পিতা মুহাম্মাদ রোমের সালজুকদের দরবারে দোভাষী ছিলেন এবং কোনো কোনো সময় তিনি বিদেশী রাষ্ট্রে দূতালীর দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি ৬৭০ হিজরী মোতাবেক ১২৭২ খৃষ্টাব্দে ইনতিকাল করেন। তাঁর মা—যার কারণে তিনি ইবনে বিবি বলে পরিচিত—নক্ষত্রের অবস্থান সম্পর্কে পারদর্শিনী ছিলেন এবং সুলতান প্রথম কায়কোবাদ (৬১৬ হিজরী ৬৩৪ হিজরী মোতাবেক ১২২০ খৃঃ—১২৩৭ খৃঃ) তাঁর খুব ভক্ত ছিলেন। নাসেরুদ্দীনের এ গ্রন্থখানি বিশেষ করে রোমের সালজুকদের অবস্থা ও ইতিহাস সম্পর্কে লিখিত। এ দিক থেকে গ্রন্থখানি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। তিনি নিজে রোমের ঐসব সালজুক সুলতানের সমসাময়িক ছিলেন। মূল গ্রন্থখানি এখনো পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি এর সারসংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। হোৎস্মা তাঁর সালজুকদের ইতিহাস সিরিজে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তা প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থখানিই এ মুহূর্তে আমার সামনে আছে।

www.bjilibrary.com

১২. তারীখে সালাজুকায়ে কিরমান

এ গ্রন্থখানা মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম কর্তৃক রচিত। প্রাচ্যবিদ হোৎস্মা এটিকে সালজুক রাজ বংশের ইতিহাস সিরিজের অন্তর্ভুক্ত করে লাইডেন থেকে প্রকাশ করেছেন।

১৩. তবকাতে নাসেরী

এ গ্রন্থখানি মিনহাজুদ্দীন আবু 'আমর উসমান ইবনে সিরাজুদ্দীন মুহাম্মাদ, আ'জুবাতুয যামান কর্তৃক রচিত। তিনি ইরাকী সালজুকদের নিকট যুগের রোমান সালজুকদের সমকালীন লোক ছিলেন। তিনি ৫৮৯ হিজরী মোতাবেক ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে জন্মলাভ করেন। তাঁর পিতা বামিয়ান ও তাখারিস্তানের শাসক সুলতান বাহাউদ্দীন সামের কাজী ছিলেন। তিনি সবে যখন যৌবনে পা দেন ঠিক সেই সময় ইসলামী দেশসমূহের বিরুদ্ধে তাতারী আক্রমণের সয়লাব শুরু হয় এবং তিনি খোরাসান, কোহিস্তান ও আফগানিস্তানের পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। অবশেষে ৬২৫ হিজরী সনে দিল্লীতে শামসুদ্দীন আলতামাশের কাছে পৌঁছেন এবং গোয়ালিয়রের কাজী, খাতীব এবং ইমাম নিযুক্ত হন এবং পদোন্নতি হতে হতে শেষ পর্যন্ত দিল্লীর প্রধান কাজী নিযুক্ত হন। তিনি গিয়াসুদ্দীন বলবনের শাসনকালে ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন একজন আলেম ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তবে ঐতিহাসিক হিসেবে খুব বড় মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না। সালজুকদের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস লিখতে তিনি সাধারণ ঐতিহাসিকদের অনুসরণ করেছেন। যে যুগটি তার সবচেয়ে নিকটবর্তী ছিল সেটি সম্পর্কে অন্যদের কোনো বর্ণনা না থাকার কারণে তিনি অনুসন্ধান ও বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই শুধু মুখে মুখে শোনা কথা লিখে দিয়েছেন। এভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্পষ্ট ভুল-ত্রুটিও হয়েছে। এমনকি তিনি রোম ও ইরাকের সালজুকদের মধ্যে পার্থক্য পর্যন্ত করতে পারেননি। এসব সত্ত্বেও তার ইতিহাস থেকে কিছু প্রয়োজনীয় বিষয়ও অবহিত হওয়া যায়। এ কারণে আমি এ গ্রন্থখানাকে আমার তথ্য উৎসের অন্তর্ভুক্ত করেছি। আমার সামনে এখন তার তবকাত গ্রন্থের মেজর রাভারটী (Raverty) অনুদিত ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ইংরেজী অনুবাদ বর্তমান।

---

www.bjilibrary.com

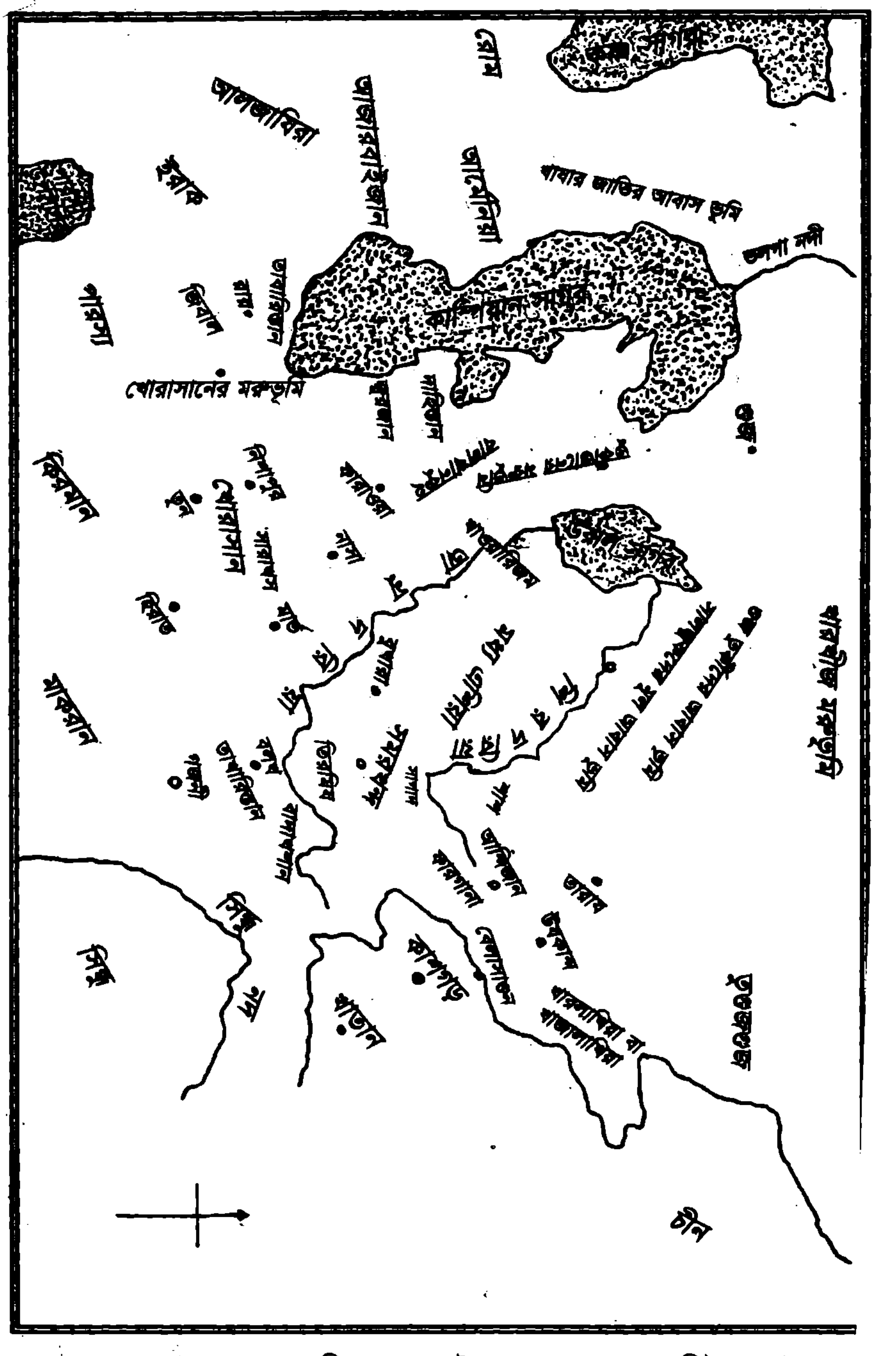

সালজুকদের মূল আবাসভূমি ও তাদের উত্থান যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ

www.bjilibrary.com

মানচিত্রের ভৌগলিক ব্যাখ্যা

বিপরীত পৃষ্ঠায় যে মানচিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে তাতে প্রাচীন ভূগোল বেত্তাদের যেসব বর্ণনার ভিত্তিতে তুর্কী জাতি গোষ্ঠীর বিভিন্ন কওমের আবাস ভূমি চিহ্নিত করা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

খাযলাজিয়া বা খারলুখিয়া অঞ্চল

"আসবিজাব থেকে ফারগানার শেষ সীমা পর্যন্ত অঞ্চলে খাযলাজিয়া গোষ্ঠীর তুর্কীরা বাস করে।"-(ইস্‌তাখরী, পৃষ্ঠা-২৯০)

"ফারগানা অঞ্চলে উযখান্দ হলো শেষ সীমা। এটি 'দারুল হারবে'র সন্নিহিত অঞ্চলে অবস্থিত।"-(ইস্‌তাখরী, পৃষ্ঠা-৩২৩)

"তারায থেকে সামনের দিকে কেউই অগ্রসর হয় না। কেননা যে ব্যক্তিই এখান থেকে সামনে অগ্রসর হয় সেই নিজকে খাযলাজিয়ার ছাউনীর মধ্যে পৌছে যায়।"-(ইবনে হাওকাল, পৃষ্ঠা-৩৯১)

"তারায থেকে নুশজান আস্‌ সুফলা তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত এবং সেখান থেকে খারলুখিয়ার শীতকালীন রাজধানী কাসরাকায দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত।"
-(ইবনে খুরদাযবা, ২৮ ; কুদামা ইবনে জা'ফর, ২০৫)

"খারলুক ও খালাজ নদীর অপর তীর সংলগ্ন এবং ফারাব নগরীতে মুসলমান এবং তুর্কী উভয়েরই সেনা ছাউনী আছে।"
-(ইবনে খুরদাযবা, পৃষ্ঠা-৩১)

তুগুযগুয বা তাগাযগায অঞ্চল

"তাগাযগায অঞ্চল তিব্বত, চীন, খাযলাজিয়া অঞ্চল এবং কিরঘিযের (KIRGHIZ) মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত, ইসতাখরী, পৃষ্ঠা-৯, ইবনে হাওকাল-১৪)

"তুগুযগুয তুর্কদের অঞ্চল সর্বাধিক বিস্তৃত। এর সীমান্ত চীন, তিব্বত, খারলুখ, কায়মাক, গুয, জাফার, বাজানাক্ক, তারকাশ, উযকাশ, খিফশাখ এবং কিরঘিযের সাথে সংলগ্ন।"-(ইবনে খুরদাযবা-৩১)

"কেউ দারুল ইসলাম থেকে তুগুযগুয যেতে চাইলে তাকে ফারগানার সীমান্ত পেরিয়ে ত্রিশ মঞ্জিল বিভক্ত পুরো খারলুখ অঞ্চল অতিক্রম করতে হবে।"-(ইবনে হাওকাল-১১)

www.bjilibrary.com

কিরঘিয অঞ্চল

"কিরঘিয এলাকা তুগুযগুয, কায়মাক এবং গুযের সীমান্ত থেকে উত্তরে উত্তর সাগর (ARCTIC OCEAN) পর্যন্ত বিস্তৃত।"-(ইসতাখরী-৯, ইবনে হাওকাল-১৪)

"ইসেল নদী (ইবনে হাওকালের মতে ইতেল) কিরঘিযের ভূ-ভাগ থেকে উৎপন্ন হয়ে কাস্পিয়ান সাগরে গিয়ে পতিত হয়েছে।"-(ইসতাখরী-২২২, ইবনে হাওকাল-২৮)

কায়মাকিয়া অঞ্চল বা কায়মাকদের অঞ্চল

কায়মাকদের (KALMUKS বা KALMAKS) এলাকা উত্তরে গুয এবং কিরঘিযের সীমান্ত থেকে শুরু করে সাকালেবা (SLAVS) পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে।"-(ইসতাখরী-৯, ইবনে হাওকাল-১৪)

'ইসেল বা ভল্গা নদী (R. VOLGA) কায়মাক ও গুযের মধ্যবর্তী সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং এটাই এ দু'টি অঞ্চলকে বিভক্তকারী সীমারেখা।" -(ইস্তাখরী-২২২, ইবনে হাওকাল-২৮)

দিয়ারে গুযযিয়া বা গুযদের অঞ্চল

'গুয অঞ্চল কাস্পিয়ান ও কায়মাক সীমান্ত থেকে শুরু করে খাযলাজিয়া এবং বলগার পর্যন্ত এবং অন্যদিকে জুরজান থেকে বারাব ও আস্বিজাব পর্যন্ত বিস্তৃত।'-(ইসতাখরী-৯, ইবনে হাওকাল-১৪)

'কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিমে খাযার জাতির আবাসভূমি এবং গুয মরুভূমির একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং উত্তরে গুয মরুভূমি অবস্থিত।"-(ইসতাখরী-২১৭-১৮, ইবনে হাওকাল-২৭৬)

"খাওয়ারিজমের উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তে গুয মরুভূমি এবং দক্ষিণ ও পূর্বে খোরাসান ও মধ্য এশিয়া (মাওয়ারউন নাহর) অবস্থিত।"-(ইসতাখরী-২৯৯, ইবনে হাওকাল-৩৫০)

আমুদরিয়া যে স্থানে উরাল সাগরে পতিত হয়েছে সে স্থানটিকে খালিজান বলা হয়। এরই বিপরীত দিকে উরাল সাগরের অপর পারে গুযদের উপকূল অবস্থিত।"-(ইসতাখরী-৩০৩, ইবনে হাওকাল-৩৫৩)

"শিরদরিয়া সাবারান সীমান্ত পেরিয়ে এমন একটি বিশাল সমভূমি প্রান্তরে গিয়ে উপনীত হয়েছে যেখানে এর দুই তীরে গুয তুর্কদের বসতি। উরাল সাগর থেকে দুই মঞ্জিল দূরে শিরদারিয়ার সন্নিকটেই কারিয়াতুল হাদীসা অবস্থিত যা মুসলমানদের আবাসভূমি কিন্তু গুযদের রাজধানী। গুযদের বাদশাহ শীতকালে

www.bjilibrary.com

এখানে এসে বসবাস করেন। এর সন্নিকটেই জুন্দ ও খুয়ারা নামক স্থানদ্বয় অবস্থিত। এখানেও গুযদের শাসন প্রতিষ্ঠিত।"-(ইবনে হাওকাল-৩৯৩)

"ইসলামী বিশ্বের অন্যসব দেশের তুলনায় মধ্য এশিয়ার (মাওয়ারাউন নাহর) অধিবাসীদের জিহাদের সুযোগ সবচেয়ে বেশী। কারণ তাদের পুরো সীমান্তই 'দারুল হরবের' সাথে সংলগ্ন। খাওয়ারিজম থেকে আসবিজাব পর্যন্ত গুয তুর্কদের এবং আসবিজাব থেকে ফারগানার শেষ সীমান্ত পর্যন্ত খাযলাজিয়া তুর্কদের আবাস।'-(ইসতাখরী-২৯০)

"ফুরাদা গুয মরুভূমির ঠিক শেষ প্রান্তে অবস্থিত একটি সীমান্ত।"
-(ইসতাখরী-২৭৩)

"জুরজান অঞ্চলের মরু সীমান্ত বড় সীমান্ত গুলির একটি। এর সাথে সংলগ্ন এলাকাতে তুর্করা বসবাস করে।"-(কুদামা ইবনে জা'ফর-২৬১)

"দিহিস্তানের সন্নিকটবর্তী সিয়াকোহে (বা বালখান কোহ) গুয তুর্কদের একটি গোষ্ঠী বসবাস করে। কোনো মতানৈক্যের কারণে তারা তাদের নিজ জাতির লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।"-(ইসতাখরী-২১৯)

---

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

প্রথম অধ্যায়
আবির্ভাব যুগ
(চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগ)

সালজুক খান্দানের বংশ পরিচয়

"সালজুক" বা "সালচুক" নামক এক ব্যক্তি ছিলেন সালজুক খান্দানের পূর্বপুরুষ। এ খান্দানের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম খ্যাতি অর্জন করেন এবং ইসলামী অঞ্চলে প্রবেশ করে নিজের জন্য রাজনৈতিক মর্যাদার দরযা উন্মুক্ত করেন। এ কারণে প্রাচ্যের রুচি ও মেজায অনুসারে তাঁর বংশধর ও অনুসারীদের "সালজুকী" বা 'সালজুক খান্দান' বা সালাজুকা বলা হয়ে থাকে। ফিনকের যে তুর্কী শাখাটি গুয নামে পরিচিত বংশগত দিক দিয়ে সালজুকগণ তাদের সাথে সম্পর্কিত।

গুয কওমের অবস্থা

ইসলামী সীমান্তের উত্তরাঞ্চলের সন্নিহিত এলাকায় অনেকগুলো তুর্কী গোত্র বাস করতো। তাদের মধ্যে তুগুযগুয, কিরঘিয, কায়মাক এবং খাযলাজিয়া গোত্রগুলো বড় বড় অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিল।[১] কিন্তু তাদের গুয নামক গোত্রটির সাথে মুসলমানদেরকে সবচেয়ে বেশী বুঝাপড়া করতে হতো। তাদের সীমান্ত আসবিজাব থেকে শুরু করে শিরদরিয়ার তীর ধরে খাওয়ারিজম পর্যন্ত এবং খাওয়ারিজম থেকে ফুরাদা ও দিহিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ দীর্ঘ সীমান্তে তাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ ও সন্ধি যেমন হতো তেমনি ব্যবসায়িক লেন-দেনও হতো। সন্ধিকালীন সময়ে অরা উরাল সাগরের উত্তর উপকূল থেকে এসে খালিজান নামক স্থানে অবতরণ করতো এবং সেখান থেকে তাদের বাণিজ্য কাফেলা ফারাতকীন (বা বারাতফীন) ও জুরজানিয়ায় এসে কাঁচা মাল ও জিনিসপত্র ইসলামী এলাকায় শিল্প দ্রব্য ও পণ্য সম্ভারের সাথে বিনিময় করতো।[২] হিজরী চতুর্থ শতকে জুরজানিয়া বিশেষভাবে মুসলমান এবং গুযদের মধ্যে একটি বড় বাণিজ্য কেন্দ্র রূপে পরিগণিত হয়েছিল।[৩] তাদের বাণিজ্য সম্ভারের মধ্যে খোরাসান ও মধ্য এশিয়া (মাওয়ারাউন-নাহর)বাসীদের কাছে সর্বাধিক পসন্দের বস্তু ছিল বকরী। এসব বকরীর গোশত সর্বোত্তম খাদ্য হিসেবে গণ্য হতো।[৪]অপরদিকে পূর্বাঞ্চলের সাবারান পশ্চিমাঞ্চলের জুরজানিয়ার

---

১. ইস্‌তাখরী (দিগোয়ে, মুদ্রিত), পৃষ্ঠা-৯।
২. ইস্‌তাখরী-৩০২ ; ইবনে হাওকাল-৩৫৩।
৩. ইস্‌তাখরী, ২৯৯ ; ইবনে হাওকাল, ৩৫০।
৪. ইস্‌তাখরী, ২৮৮ ; ইবনে হাওকাল-৩৩০।

www.bjilibrary.com

মতই গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। শিরদরিয়ার অপর পারের এই ছোট্ট শহরটি গুয তুর্কীদের মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এ স্থানে মুসলমানদের সাথে তাদের সন্ধি, চুক্তি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত লেন-দেন হতো।[১] সাবারান থেকে আরো অভ্যন্তরে জান্দ, খারা এবং আল হাদীসার অবস্থান ছিল। ঐসব অঞ্চল ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু চতুর্থ শতকের প্রথমার্ধে এসব এলাকার ওপর গুযদের শাসন কর্তৃত্ব চেপে বসেছিল এবং শিরদরিয়ার পূর্ববতীর অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার (মাওয়ারাউন নাহর) অভ্যন্তর ভাগ পর্যন্ত তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল।[২]

সীমান্ত এলাকার এসব তুর্কীদের যেহেতু যুদ্ধের ময়দানে এবং বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহে মুসলমানদের সাথে ব্যাপকভাবে মেলামেশা করার সুযোগ হতো তাই মাঝে মধ্যে ইসলামের বিজয়ী সভ্যতা-সংস্কৃতি তাদের ছোট ছোট এবং বড় বড় গোষ্ঠীগুলোকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে নিতো। মুসলমান হওয়ার পর তারা ঐসব সীমান্তেই বসতিস্থাপন করতো এবং সাধারণভাবে 'তুর্কমান' বলে পরিচিতি লাভ করতো।[৩] যুদ্ধের সময়ও তাদের বহু সংখ্যক লোক বন্দী হয়ে আসতো।[৪] এবং ইসলামী এলাকায় ছড়িয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে ইসলামের মধ্যে বিলীন হয়ে যেতো। সম্ভবত খলীফা মাহদী, আব্বাসীর (১৫৮ হিজরী থেকে ১৬৯ হিজরী মোতাবেক ৭৭৫ খৃঃ থেকে ৭৮৫ খৃঃ) সময়ে প্রথমবার তাদের একটি বড় দল শিরদরিয়ার পূর্ব তীরস্থ ইসলামী এলাকায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারপর এই ধারা ক্রমাগত চলতে থাকে এমনকি এই তুর্কমানদের দ্বারা মু'তাসিম যে সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন এবং তা এক শতাব্দী পর্যন্ত আব্বাসীয় শাসনের দণ্ডমুণ্ডের মালিক হয়ে বসে। তাদের সাফল্যই আগামী দিনের জন্য মুসলিম বিশ্বে তুর্কীদের ভাগ্য পরীক্ষার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। হিজরী চতুর্থ শতকের মধ্য ভাগে মধ্য এশিয়ার (মাওয়ারাউন নাহর) সীমান্তে এসব তুর্কমান নওমুসলিমদের ছোট ছোট নতুন বসতি গড়ে উঠেছিল। বায়কান্দ পরগণার বেশীর ভাগ অঞ্চলে তারাই বসতিস্থাপন করেছিল। ফারাব, কানজিদা এবং শাশের মধ্যবর্তী স্থানে যে উর্বর ভূভাগ ছিল সেখানে তাদের প্রায় এক হাজার পরিবারের আবাদ ছিল। তারা মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের কাফের স্বজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো।[৫]

১. ইবনে হাওকাল-৩৬১।
২. ইবনে হাওকাল, ৩৯৩।
৩. মাকদেসী, পৃষ্ঠা-২৭৪।
৪. ইসতাখরী বলেন, তাদের সীমান্তের চতর্দিকে বসবাসরত তুর্কীদের নিকট থেকে মধ্য এশিয়ার অধিবাসীগণ প্রয়োজনাতিরিক্ত ক্রীতদাস পেয়ে থাকে এবং যেহেতু এসব ক্রীতদাসেরা দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ক্রীতদাস তাই তাদেরকে আশপাশের সকল এলাকায় প্রেরণ করা হয়ে থাকে।-(২৮৮)
৫. ইবনে হাওকাল-৩৯১ পৃষ্ঠা।

www.bjilibrary.com

এই গুয তুর্কমানদের মধ্যে থেকে একটি গোষ্ঠী হিজরী চতুর্থ শতকের মধ্যভাগে তাদের সর্দারের সাথে ইসলামী অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে।

সালজুকের পিতার পরিচয়

সালজুকের পিতা সম্পর্কে আমরা শুধু এতটুকু জানি যে, তার নাম ছিল দুকাক বা তুকাক।[১] তিনি গুয তুর্কদের একটি শক্তিশালী গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন। বীরত্ব ও সাহসিকতার ভিত্তিতে 'তামার বালীগ' (মযবুত ধনুক বা সাহসী কমাণ্ডার) নামে বিখ্যাত ছিলেন এবং উত্তম ব্যবস্থাপনা ও সঠিক সিদ্ধান্তের কারণে এত প্রভাবশালী ছিলেন যে, তুর্কীদের বাদশাহ বায়গু[২] তার পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজই করতেন না। তার জীবনের ঘটনাবলী সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন বা অজ্ঞাত। দীর্ঘ যুগের বিবর্তনের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে শুধু একটি ঘটনা আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তাও আবার কাহিনীর অবয়বে। কিন্তু ঐতিহাসিকদের মতানৈক্যের কারণে নির্ভরযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। ইবনে আসীর বলেন ঃ বায়গু কোনো এক সময় সৈন্য সংগ্রহ করে ইসলামী এলাকার ওপর আক্রমণ পরিচালনা করতে মনস্থ করেছিল। কিন্তু দুকাক তাকে প্রতিনিবৃত করেছিল। বায়গু কঠোর ভাষা প্রয়োগ করলে দুকাক তাকে চপেটাঘাত করে। এতে বায়গুর লোকজন সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসলে দুকাকের লোকজনও সমবেত হয়। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং এ যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত সন্ধির মাধ্যমে শেষ হয়।[৩] মীর খোন্দের বর্ণনা এ থেকে ভিন্ন। তিনি বলেন ঃ বায়গু তুর্কীদের একদল নিরপরাধ লোককে শাস্তিদানের নির্দেশ দিলে দুকাক অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন এতে বাদশাহ রাগান্বিত হয়ে দুকাকের মুখমণ্ডলের ওপর তরবারি দ্বারা আঘাত করে দুকাকও একটি বল্লম দিয়ে আঘাত করে। এতে তার মাথা ফেটে যায়। বিষয়টি অনেক দূর গড়ানোর আগেই রাজ দরবারের আমীর-উমরা ও পদস্থ কর্মচারীগণ হস্তক্ষেপ করে উভয়কে নিবৃত করে এবং বিশাল একটি মেলার আয়োজন করে উভয়ের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেয়।[৪]

সালজুকের প্রাথমিক জীবন

দুকাকের মত সালজুকের প্রাথমিক জীবনও অজ্ঞাত। ইতিহাস থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, দুকাক ও বায়গুর সন্ধির পর সালজুকের জন্ম হয় এবং

১. ইবনে খাল্লিকান, আবুল ফিদা এবং মীর খোন্দ দুকাক বলে উল্লেখ করেছেন এবং ইবনুল আসীর 'তুকাক' বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু রাহাতুস সূদূর 'লোকমান' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ তথ্য ভুল বলে মনে হয়।

২. ইবনে আসীর এবং মীর খোন্দ তার নাম লিখেছেন বায়গু এবং আবুল ফিদা লিখেছেন 'ইয়াবগু'। এটা তার পাঠভ্রম। প্রকৃতপক্ষে এটা কোনো এক ব্যক্তির নাম নয়। বরং একটি বিশেষ খান্দানের বাদশাহদের উপাধি।

৩. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯৬।

৪. রাওজাতুস সাফা, নোল কিশওয়ারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৫-৮৬।

www.bjilibrary.com

তার জন্মের বেশ কিছুকাল পরে দুকাকের মৃত্যু হয়। সালজুক প্রাপ্তবয়স্ক হলে বায়গু তার মধ্যে শরাফত ও মর্যাদার লক্ষণ দেখে তাকে নিজের নৈকট্যলাভের মর্যাদা দান করেন এবং 'সুবাসী' উপাধিতে ভূষিত করেন। এর অর্থ সেনাধ্যক্ষ বা সেনা অফিসার। প্রতিনিয়ত তার বর্ধমান ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দেখে দরবারের আমীর-উমরা এ শাহী খান্দানের সদস্যগণ হিংসায় জ্বলে ওঠেন। এমনকি বায়গুর স্ত্রীও তাকে হিংসা করতে থাকে। বিরোধীদের সংখ্যাধিক্য বায়গুর মেজাজকেও বদলে দেয়। মেজাজ বদলের বিশেষ কারণ সম্পর্কে মীর খোন্দ বর্ণনা করেছেন যে, একবার সালজুক তার দরবারে হাজির হয়ে বেগম এবং শাহজাদাদের ডিঙিয়ে সরাসরি তার কাছে গিয়ে বসেন। বেগম এ বিষয় খুব অপসন্দ করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, "এ ছেলেটি এখনই যেখানে এত অভদ্র ও বে-আদব তখন ভবিষ্যতে না জানি কি কাণ্ড ঘটিয়ে বসে।" এতে বায়গু খুব প্রভাবিত হন এবং তখন থেকেই তিনি সালজুককে প্রতিহত করার ফন্দি-ফিকির করতে থাকেন।[১] অন্য কোনো ইতিহাস থেকে এ ঘটনার সমর্থন পাওয়া যায় না। তা সঠিক বা বেঠিক যাই হোক না কেন সব ঐতিহাসিকই একথা স্বীকার করেছেন যে, বায়গু সালজুকের প্রতি রুষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁর এই পরিবর্তিত চেহারা দেখেই শেষ পর্যন্ত সালজুক দেশ থেকে হিজরত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

দেশ ছেড়ে হিজরত

হিজরতের এ ঘটনা কখন ঘটেছিল ? হামদুল্লাহ মুসতাউফা ছাড়া আর কেউ-ই এ প্রশ্নের জবাব দেননি। তার বর্ণনা হলো, ৩৭৫ হিজরীতে (৯৮৫ খৃঃ) সালজুক দেশ ত্যাগ করেন। তার দেশ ত্যাগের কারণ হলো, তাঁর লোকজনের জন্য তুর্কিস্তানের চারণ ক্ষেত্রসমূহ সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল।[২] কিন্তু এ ইতিহাস সঠিক বলে মনে হয় না। কারণ সালজুক এর পরে বড়জোর আট বছর জীবিত ছিলেন। অথচ ঐতিহাসিক তাঁর বয়স ১০৭ বছর ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। এ হিসাব অনুসারে হিজরতের সময় তাঁর বয়স ৯৯ বছর হওয়া উচিত। কিন্তু উপরে আমরা দেখেছি যে, বায়গুর স্ত্রী তার বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ করেন তখন তাকে ছেলেটা বা ছোকরাটা বলে উল্লেখ করেছিলেন। সবারই জানা কথা যে, আশি নব্বই বছরের বৃদ্ধকে কেউ ছোকরা বলতে পারে না। ইতিহাসের ক্ষেত্রে যদি কিয়াস বা যুক্তি দিয়ে কথা বলার বৈধতা থাকে তাহলে বলতে হবে, তাঁর দেশ ত্যাগের ঘটনা চতুর্থ শতকের মধ্যভাগে কিংবা তারও পূর্বে সংঘটিত হয়ে থাকবে।

---

১. রাওজাতুস সাফা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৬।
২. তারীখে গুযীদাহ, পৃষ্ঠা-৪৩৪।

www.bjilibrary.com

ইসলামী ভূখণ্ডে আগমন

অবশ্যম্ভাবী রূপে এসব দেশত্যাগীদের আশ্রয়স্থল হতে পারতো মাওয়ারাউন নাহর বা মধ্য এশিয়া। কারণ এ অঞ্চল ছিল তাদের দেশের সীমান্ত সংলগ্ন। তাদের পূর্বে যারা দেশ ত্যাগ করতো তারা সেখানেই গিয়ে বসতিস্থাপন করতো। এখানেই তারা কিছুটা স্বাচ্ছন্দ ও আরাম-আয়েশলাভের আশা করতে পারতো। ইমাদ কাতিব, ইবনুর রাওয়ানদী, ইবনে খাল্লিকান এবং হামদুল্লাহ মুসতাউফা বলেন, তারা এসে মধ্য এশিয়া, সুগ্‌দ, সমরখন্দ[১] এবং নূর বুখারায়[২] বসতিস্থাপন করেন। কিন্তু ইবনে আসীর, আবুল ফিদা এবং মীর খোন্দের মতে তারা প্রথমে জান্দে[৩] বসতিস্থাপন করেছিল, পরে বুখারায় চলে যায়। আমার মতে দ্বিতীয় বক্তব্যটাই সঠিক বলে মনে হয়। কারণ ইসলামী ভূখণ্ডের মধ্যে জান্দ ছিল তাদের দেশের সর্বাধিক নিকটবর্তী স্থান। আর বোখারা ও সমরখন্দ সেখান থেকে অনেক দূরে দেশের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত। তাছাড়া আরেকটি ঘটনা থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ঘটনাটি হলো, সালজুক যে সময় আমীর নূহ ইবনে নাসর সাসানীকে তুর্কিস্তানের শাহের বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্যদান করেন তখন তিনি বোখারার আশেপাশে ছিলেন না, বরং জান্দে ছিলেন। তিনি সেখানেই ইনতিকাল করেন। পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে।

সালজুকের ইসলাম গ্রহণ

মাওয়ারাউন নাহর বা মধ্য এশিয়া পৌঁছে সালজুক এবং তাঁর দল ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবনে আসীর ও আবুল ফিদা বলেন, মুসলমান হওয়ার পর তিনি মুসলমানদের পক্ষ থেকে অমুসলিম তুর্কীদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেন। আরো অগ্রসর হয়ে মীর খোন্দ পুরো একটা কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ জান্দের সন্নিকটে পৌঁছে তিনি সেই অঞ্চলের গভর্নরের কাছে এই মর্মে পত্র লেখেন যে, আমি ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে এদিকে এসেছি। ইসলামের শিক্ষা দেয়ার জন্য একদল আলেমকে পাঠিয়ে দিন। অতএব গভর্নর কিছুসংখ্যক আলেমকে পাঠিয়ে দিলে তিনি এবং তাঁর দলের সমস্ত লোক তাদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর অমুসলিম তুর্ক গোত্রের লোকজন

---

১. সুগ্‌দ সমরখন্দ জেলায় অবস্থিত একটি পাহাড়ী দুর্গ। এ স্থানটি শস্য-শ্যামল উর্বরতা ও মনোরম আবহাওয়ার কারণে পৃথিবীর সর্বোত্তম স্থানসমূহের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে।-(ইবনে খুরদাযবা, পৃষ্ঠা-১৭২)।

২. বোখারার নিকটবর্তী একটি গ্রাম।-(মু'জামুল বুলদান, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২৫)।

৩. খাওয়ারিজম থেকে দশ দিনের দূরত্বে তুর্কী অঞ্চলের সীমান্ত সংলগ্ন, শিরদরিয়ার তীরবর্তী একটি শহর।-(মুজামুল বুলদান, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৩)।

www.bjilibrary.com

জান্দ অঞ্চলে ভূমি কর আদায় করতে আসলে তিনি বলেন ঃ আমরা বেঁচে থাকতে এসব কাফের মুসলমানদের নিকট থেকে কর আদায় করতে পারবে না। সুতরাং তিনি তুর্কীদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন এবং তাদের পরাজিত করে তাড়িয়ে দিলেন।[১] তবে এসব কাহিনীর মূল ভিত্তি যা মনে হয় তাহলো মধ্য এশিয়ায় এসে এসব লোক যখন মুসলমানদের সাথে বসবাস করতে শুরু করে তখন তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে ইসলাম বিস্তার লাভ করে। এরপর থাকে গুয গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার বিষয়টি। সম্ভবত তারা মুসলমানদের সাথে সম্মিলিতভাবে কোনো সময় এরূপ করে থাকবে। কিন্তু একে তাদের নির্ভেজাল দীনি প্রেরণার সাথে সম্পর্কিত না করে বরং তাদের যুদ্ধবাজ স্বভাব প্রকৃতি ও গনীমতলাভের আকাংখার সাথে সম্পর্কিত করাই সঠিক। কেননা, কয়েক বছর পর যখন তারা ইসলামী দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায় তখন লুটপাট, খুন-খারাবী এবং মর্যাদা ও সম্ভ্রম হানির যে আগ্রহ প্রদর্শন করে তার উৎস নিসন্দেহে কোনো দীনি প্রেরণা হতে পারে না।

প্রভাব প্রতিপত্তির বিস্তার

সৌভাগ্যক্রমে সালজুক ও তাঁর সংগী-সাথীগণ এমন একটি যুগ পেয়ে যান যখন মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা এবং আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ক্ষেত্রে চরম খারাপ হওয়ার কারণে তাঁদের মত বীর ও সাহসী ভাগ্য পরীক্ষকদের জন্য সম্পূর্ণরূপে অনুকূল ছিল। সেই সময় আমীর নূহ ইবনে মনসূর সাসানীর হাতে ছিল দেশের শাসন ক্ষমতা। তিনি তার খান্দানের বিশাল বিস্তৃত সাম্রাজ্য পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম ছিলেন না। মধ্য এশিয়া ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত প্রদেশ কার্যত স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। খোরাসান ও বলখের গভর্নর আবু আলী সামচুরী এবং আমীর ফায়েক তাঁর আনুগত্য করতে প্রকাশ্যে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার জন্য তারা বিদেশী শত্রুদের উস্কানি দিতে শুরু করেছিলেন। এ পরিস্থিতিতে তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ বাধে এবং তুর্কিস্তানের শাসক বগরা খান[২] প্রথমবারের মত ৩৮২ হিজরীতে (৯৯২ খৃঃ) মধ্য এশিয়ার ওপর হামলা করেন। প্রাথমিক মোকাবিলায় নূহের সৈন্যেরা পরাজিত হয় এবং তুর্কী সয়লাবের মত বোখারার দিকে ধাবিত হয়। শেষ পর্যন্ত সমস্ত শক্তি একত্রিত করে প্রতিরোধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং সালজুকদের কাছেও সাহায্য চেয়ে পাঠান। সালজুক তাঁর পুত্র আরসালান (বা

১. রওযাতুস সাফা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৬।

২. পুরো নাম ও উপাধি ছিল শিহাবুদ্দৌলা হারুন ইবনে সুলায়মান ইবনে আয়লাক খান। কাশগড়, খুতান ও বালাসাগুনের শাসক ছিলেন। তাঁর রাজ্যের সীমানা একদিকে চীনের সাথে অপরদিকে মধ্য এশিয়ার সাথে মিলিত ছিল।

www.bjilibrary.com

ইসরাঈল)-কে এক বিশাল সেনাবাহিনী সহ তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। বোখারার আশেপাশে তুমুল যুদ্ধ হয় এবং বগরা খান পরাজিত হয়ে বালাসাগুনের দিকে পালিয়ে যান।

এটি ছিল প্রথম ঘটনা যা সালজুক খান্দানের উন্নতির দরযা খুলে দেয়। তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে এবং মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণের সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়।

সালজুকের মৃত্যু

এ ঘটনার অব্যবহিত পরেই সালজুকের জীবন প্রদীপ নিভে যায় এবং তাঁকে জান্দে দাফন করা হয়। এ ব্যাপারে সব ঐতিহাসিক একমত যে, তিনি ১০৭ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। কিন্তু কেউ-ই তাঁর মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করেননি। তা সত্ত্বেও ঘটনা প্রবাহ থেকে অনুমান করা যায় যে, ৩৮২ হিজরীতে বগরা খানের সাথে যুদ্ধের পরপরই তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকবে। কারণ, ইবনে আসীরের বর্ণনা অনুসারে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর খান্দানের লোকজন বোখারায় গিয়ে বসতিস্থাপন করেন। সেখানে নূহের সাথে তাদের মতবিরোধ হলে তারা বগরা খানের কাছে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। অতপর ৩৮৩ হিজরীতেই বগরা খানের মৃত্যু হয়।[১] এ বক্তব্যের আলোকে একথা মানতে হবে যে, সালজুকের মৃত্যু বগরা খানের মৃত্যুর অন্তত এতটা সময় আগে হওয়া উচিত যে, ৩৮৩ হিজরীতে যুদ্ধের পর সালজুক খান্দান জান্দ থেকে বোখারায় গিয়ে বসতিস্থাপন করার সময় পাবেন এবং তারপর ৩৮৩ হিজরীর শেষভাগে গিয়ে এসব ঘটনাবলী সংঘটিত হতে পারে।

সালজুকের সন্তান

সালজুকের কয়েকজন ছেলে ছিলেন। তাঁদের নাম ও সংখ্যা বর্ণনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকগণ পরস্পর দ্বিমত পোষণ করেছেন। হামদুল্লাহ মুসতাউফার মতে, তাঁরা ছিলেন ইসরাঈল, মিকাঈল, মূসা ও ইউনুস।[২] ইবনুর রাওয়ানদীও এ নামগুলোই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি মূসার উপাধি লিখেছেন বায়গু।[৩] আবুল ফিদা ও ইবনে আসীর শুধু তিনজনের নাম লিখেছেন। অর্থাৎ আরসালান, মিকাঈল ও মূসা। তবে তাদের বর্ণনায় অতিরিক্ত যে কথাটুকু পাওয়া যায় তাহলো, তাঁরা বায়গুকে মিকাঈলের পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন। বায়হাকী থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়।[৪] মীর খোন্দ মিকাঈল, মূসা ও আরসালান

১. ইবনে আসীর, ইউরোপ মুদ্রিত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২২-৩২৩।
২. তারীখে গুযীদাহ, পৃষ্ঠা-৪৩৪।
৩. রাহাতস্ সুদূর, পৃষ্ঠা-৮৭।
৪. আবুল ফিদা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৩, ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯৭।

www.bjilibrary.com

বায়গুর নাম উল্লেখ করেছেন এবং এক পুত্র সম্পর্কে লিখেছেন যে, সে যৌবনের প্রারম্ভেই মৃত্যুবরণ করে। এভাবে ঐতিহাসিকদের বর্ণানানুসারে সালজুকের তিন পুত্র মিকাঈল, ইসরাঈল এবং মূসা সবার কাছেই স্বীকৃত। তাঁদের মধ্যে আবার প্রথমোক্ত দুইজন ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত। মিকাঈল একযুদ্ধে শহীদ হন। কিন্তু তুগরুল বেগ ও চাগরী বেগ দাউদ নামক অত্যন্ত যোগ্য দুই সন্তান রেখে যান। পরবর্তীকালে তারা ফোরাত থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত সমস্ত শক্তিকে তছনছ করে দেয়। দ্বিতীয় পুত্র আরসালান মাহমুদ গযনবীর বন্দীখানায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি কুতলমশ নামে এক সন্তান রেখে যান। তার সন্তানরাই পরবর্তীকালে রোমান সালজুক নামে খ্যাত হন।

সালজুকের মৃত্যুর পর তাঁর জাতি দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি গোষ্ঠী তুগরুল বেগ ও চাগরী বেগ দাউদকে তাদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করে এবং অপর গোষ্ঠীটির নেতৃত্ব লাভ করেন আরসালান সালজুক। এই বিচ্ছিন্নতা কখনো গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়নি। বরং প্রয়োজনের মুহূর্তে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সবসময়ই একাত্মতা দেখা গিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীকাল পর্যন্ত উভয় গোষ্ঠীর রাজনীতি ও ইতিহাস স্পষ্টরূপে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় চলতে থাকে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এ সত্যকে উপেক্ষা করে সমস্ত সালজুকদের এক ও অভিন্ন মনে করেছেন এবং এক গোষ্ঠীর ঘটনাবলীতে আরেক গোষ্ঠীকে শামিল করে ঐতিহাসিক বিন্যাসকে সাংঘাতিকভাবে এলোমেলো করে দিয়েছেন। তবে ইবনে আসীর ও বায়হাকীর বর্ণনাসমূহ গভীরভাবে লক্ষ্য করলে অতি সহজেই এ খটকা দূরীভূত হয়ে যায়। পরবর্তী ঘটনাবলী বুঝার জন্য এ দুই গোষ্ঠীর পার্থক্যকে দৃষ্টিতে রাখা প্রয়োজন।

তুগরুল বেগ এবং চাগরী বেগের অবস্থা

ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সালজুকের নির্দেশে তাঁর পুত্র আরসালান বোখারায় এসে সামানীদের সাথে বোগরা খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। এ যুদ্ধে সালজুক ও সামানীদের সম্মিলিত বাহিনী বিজয় লাভ করেছিল। এরপর সালজুকদের অবশিষ্ট দলগুলোও জান্দ থেকে বুখারায় চলে আসে। এসব দলের নেতা ছিলেন তুগরুল বেগ এবং চাগরী বেগ দাউদ। তারা বোখারার আশেপাশে তাঁবু ফেলেন। কিন্তু নূহের পক্ষে তার নিজের রাজধানীর সন্নিকটেই এই বিপুল সংখ্যক যুদ্ধবাজ, কলহপ্রিয় এবং অসভ্য তুর্কমানদের অস্তিত্ব মেনে নেয়া কঠিন ছিল। তাই তিনি ঐ দুই নেতার সাথে কোনো ভাল আচরণ করেননি। তাই তাঁরা তাঁর প্রতি বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়ে বগরা খানের কাছে চলে যান। কিন্তু তাঁদের দাদা ও চাচা বগরা খানের বিরুদ্ধে যা করেছিলেন তা খুব বেশী দিনের কথা ছিল না। তাই তার পক্ষ থেকেও সামর গ্রহণের কোনো নিশ্চয়তা ছিল না।

www.bjilibrary.com

অতএব, তাঁরা উভয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে, দু'জন একত্রে কখনো তাঁর কাছে যাবেন না। এ সিদ্ধান্ত অনুসারে তুগরুল যখন তাঁর কাছে যেতেন তখন চাগরী সেনাবাহিনীর মধ্যে অবস্থান করতেন এবং চাগরী যখন যেতেন তখন তুগরুল সেনাবাহিনীর মধ্যে অবস্থান করতেন। দু'জন এক সাথে যাতে তাঁর দরবারে হাজির হন সে জন্য বগরা খান যথেষ্ট চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা কখনো সে সুযোগ দেননি। অবশেষে একদিন তিনি তুগরুলকে গ্রেফতার করেন এবং চাগরীকে গ্রেফতার করার জন্য এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। চাগরী আগে থেকেই সতর্ক ছিলেন। তিনি সমস্ত শক্তি নিয়ে দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করলেন এবং বগরা খানের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত সামরিক শক্তির এই প্রদর্শনীতে প্রভাবিত হয়ে বগরা খান তুগরুলকে মুক্তি দেন। এরপর এই দু' নেতা নিজেদের সেনাবাহিনী নিয়ে পুনরায় জান্দে চলে যান।[১] এরপরে তুগরুল ও চাগরী বেগ দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত ইতিহাসের দৃশ্যপট থেকে অদৃশ্য থাকেন। এ সময় মধ্য এশিয়ার রাজনীতিতে সালজুকদের প্রতিনিধিত্ব শুধু আরসালানের সাথে সম্পর্কিত থাকে।

সামানিয়া সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি

৩৮৩ হিজরীতে বগরা খান একটি বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে দ্বিতীয়বার মধ্য এশিয়া আক্রমণ করেন। আমীর নূহের সেনাধ্যক্ষ ফায়েক প্রথমেই তাঁর সাথে যোগসাজস করেছিলেন। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই সমরখন্দে পরাজয়বরণ করেন এবং তুর্কী সৈন্যরা কোনোরূপ বাধাবিপত্তি ছাড়াই বোখারার দিকে অগ্রসর হয়। নূহের জন্য দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ই ছিল না। তিনি মাজেন্দ্রানের দিকে পালিয়ে যান এবং বগরা খান অতিসহজেই বোখারা দখল করে নেন। কিন্তু এখানকার আবহাওয়া তাঁর স্বাস্থ্যের অনুকূল না হওয়ায় অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় বিজিত এলাকা আবদুল আযীয ইবনে নূহের হাতে তুলে দিয়ে নিজ দেশে ফিরে যান। ফিরে যাওয়ার সময় গুয তুর্কীরা— যারা নিশ্চিতভাবে আরসালানের সেনাবাহিনীর লোক তাঁর সেনাবাহিনীর পশ্চাদবর্তী অংশের ওপর একাধারে গুপ্ত আক্রমণ চালাতে থাকে। এতে তাঁর যথেষ্ট ক্ষতি হয়। পথেই তাঁর মৃত্যু হয় এবং আমীর নূহ ফিরে এসে পুনরায় দেশটি দখল করে নেন।[২]

---

১. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯৭ ; রওজাতুস সাফা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৬-৮৭।

২. ইবনে আসীর, ইউরোপ মুদ্রিত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৮-৭০; রওজাতুস সাফা ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২; বায়নুল আখবার, পৃষ্ঠা-৫৩, ৫৪; তারীখে গুযীদাহ, পৃষ্ঠা-৩৮৫-৩৮৮; তবকাতে নাসেরীর ইংরেজী অনুবাদ, পৃষ্ঠা-৪৪-৪৫।

www.bjilibrary.com

৩৮৭ হিজরীতে (৯৯৭ খৃঃ) আমীর নূহের মৃত্যু হয় এবং ফায়েক ও বাকতুযোন তাঁর পুত্র আবুল হারেস মনসূরকে নামে মাত্র সিংহাসনে বসিয়ে নিজেরাই শাসনকার্য চালাতে শুরু করেন। প্রায় দু' বছর পর তারা মনসূরকে ক্ষমতাচ্যুত করে অন্ধ করে দেয় এবং অল্প বয়স্ক আবদুল মালেক ইবনে নূহকে সিংহাসনে বসায়। এ অবস্থা দেখে সুলতান মাহমুদ গযনবী খোরাসান ও গযনীতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অপরদিকে বগরা খানের স্থলাভিষিক্ত ইলাক খান (শামসুদ দৌলা আবু নসর ইবনে বগরা খান) আক্রমণের মাধ্যমে ৩৮৯ হিজরীর (৮৯৮ খৃঃ) যিলকা'দা মাসে আমুদরিয়ার তীর পর্যন্ত সমগ্র বোখারা রাষ্ট্রটি দখল করে নেন এবং সামানী খান্দানের সমস্ত বড় বড় শাহজাদাকে বন্দী করেন। তাদের মধ্যে নূহের চার পুত্র আবদুল মালেক, মনসূর, আবু ইবরাহীম ইসমাঈল এবং আবু ইয়াকূবও ছিলেন।[১] কিন্তু ৩৯০ হিজরীতে আবু ইবরাহীম ইসমাঈল ইবনে নূহ কয়েদখানা থেকে পালিয়ে যান। তিনি নিজ খান্দানের পূরানো বিশস্ত লোকদের একত্রিত করে পুরো পাঁচ বছর পর্যন্ত তাঁর পিতার দেশ ফিরিয়ে পাওয়ার বিরামহীন প্রচেষ্টা চালান। এই প্রচেষ্টায় আরসালান ইবনে সালজুক এবং গুয তুর্কমানরাও তাঁকে সহযোগিতা করেন এবং তারা ৩৯৩ হিজরীতে সমরখন্দ পর্যন্ত দখল করে নেয়। তবে সামানীদের পক্ষে অবস্থা পাল্টে যাওয়ার কোনো আশাই তাদের ছিল না। তাই তিনি ইলাক খানের লোকজনকে কয়েদখানা থেকে মুক্ত করে দেন। ইসমাঈল তাঁর এ কাজে বিরূপ ধারণা পোষণ করে তাঁর থেকে আলাদা হয়ে যান। এরপর আরো দু' বছর পর্যন্ত তিনি জীবনের উত্থান-পতন দেখতে থাকেন এবং পরিশেষে ৩৯৫ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে সামানী খান্দানের ভাগ্যেরও চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যায়।[২]

আরসালান ও তাঁর সংগী-সাথীদের পক্ষে সেই সময় বোখারায় অবস্থান অসম্ভব ছিল। তাই তিনি আমুদরিয়া পেরিয়ে খোরাসান, জুরজান ও খাওয়ারিজমের মধ্যবর্তী স্থানে পিছিয়ে এসেছিলেন এবং এখানে তিনি মধ্য এশিয়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার যে কোনো সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন।

---

১. ইবনে আসীর, ইউরোপে মুদ্রিত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭১, ১০২, ১০৩, ১০৫, ১০৬; রওজাতুস সাফা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫, ২৭, যায়নুল আখবার, পৃষ্ঠা-৫৮ ; ৬১, তারীখে গুযীদাহ ৩৯০-৩৯১।

২. ইবনে আসীর, ইউরোপে মুদ্রিত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১১, ১১৩ ও ৩২৩; রওজাতুস সাফা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭, ২৯, যায়নুল আখইয়ার, পৃষ্ঠা-৬৩ থেকে ৬৪, তারীখে গুযীদাহ, পৃষ্ঠা-৩৯২, ৩৯৩; তবকাতে নাসেরী, পৃষ্ঠা-৫১, ৫৩।

www.bjilibrary.com

মধ্য এশিয়ায় তুর্কীদের যুগ

ইলাক খান মধ্য এশিয়া দখল করার (খুব সম্ভব ৩৯০ হিজরীতে) পর সুলতান মাহমুদ গযনবীর সাথে চুক্তি করেন। এই চুক্তি অনুসারে জায়হুন বা আমুদরিয়া উভয়ের রাষ্ট্রের মধ্যে সীমান্ত হিসেবে স্বীকৃতি পায়। কিন্তু তিনি ইসমাঈলের পক্ষ থেকে বিপদমুক্ত হওয়ার পর মাহমুদ গযনবীকে ভারতবর্ষ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখে ৩৯৬ হিজরীতে দু'দিক থেকে খোরাসানের ওপর আক্রমণ করে বসলেন। একদিকে তাঁর ভাই জা'ফর তুগীন বলখ অধিকার করে নিলেন। অপরদিকে তাঁর সেনাধ্যক্ষ সুবাশী তগীন হিরাত ও নিশাপুর দখল করে নিলেন। এ বাড়াবাড়ির খবর শোনামাত্র মাহমুদ এদিকে দৃষ্টি দিলেন এবং প্রথম হামলাতেই তিনি বলখ থেকে জা'ফর তুগীনকে বিতাড়িত করলেন। অতপর হিরাতের দিকে মনযোগ দিলেন এবং সুবাশীকে একের পর এক পরাস্ত করলেন। সুবাশী মরু ও আবিওয়ার্দ হয়ে আমুদরিয়া পেরিয়ে মধ্য এশিয়ায় চলে যেতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু আরসালানের তুর্কমান সৈন্যরা তার পথ রোধ করে দাঁড়ায় এবং মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে তাকে জুরজানের দিকে বিতাড়িত করে। অতপর ইলাক খান তুর্কিস্তানের সব অঞ্চল থেকে সৈন্য সমাবেশ করেন। অপরদিকে মাহমুদও গুয তুর্ক, খালাজ এবং ভারতীয় ও আফগান সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন। ৩৯৭ হিজরীতে (যায়নুল আখইয়ার বর্ণনা মতে ৩৯৮ হিজরীতে) বলখের সন্নিকটে এক তুমুল যুদ্ধ হয়। ইলাক খান এ যুদ্ধে পরাজিত হন। এ সময়ে মধ্য এশিয়ায় অগ্রাভিযান পরিচালনা করাও মাহমুদের জন্য সহজ ও সম্ভব ছিল। কিন্তু তিনি যেহেতু ভারতবর্ষের প্রতি মনযোগ দিতে চাচ্ছিলেন। তাই আমুদরিয়াই যথারীতি উভয় সাম্রাজ্যের মধ্যে সীমান্ত রেখা হয়ে থাকলো।[১]

৪০৩ হিজরীতে (১০১২ খৃঃ) ইলাক খান মৃত্যুবরণ করেন এবং তদস্থলে তাঁর ভাই তুগান খান সিংহাসনে বসেন।[২] ৪০৮ হিজরীতে (১০১৭ খৃঃ) তিনি মারা গেলে সিংহাসন নিয়ে তাঁর ভাই আবুল মুজাফ্ফর শারফুদ্দৌলা আরসালান খাঁ এবং কদর খাঁ ইউসুফ ইবনে বগরা খাঁর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়। কদর খাঁর অনুকূলে এর ফায়সালা হয়।[৩]

এই গৃহযুদ্ধের সুযোগে আরসালান খাঁর হাতে বন্দী ইলাক খানের অপর এক ভাই আলী তগীন খাঁ কয়েদখানা থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং

১. ইবনে আসীর, ইউরোপে মুদ্রিত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৩-১৩৫ ; রওজাতুস সাফা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪-৩৬; যায়নুল আখইয়ার, পৃষ্ঠা-৬৮-৬৯ ; গুযীদাহ, পৃষ্ঠা-৩৯৬-৩৯৭।

২. ইবনে আসীর, ইউরোপে মুদ্রিত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৯।

৩. ইবনে আসীর, ইউরোপে মুদ্রিত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০৯-২১১।

www.bjilibrary.com

শক্তি সঞ্চয় করে কদর খাঁর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন। সেই সময়ই আরসালান ইবনে সালজুকের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কারণ, উভয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল এক ও অভিন্ন। অবশেষে তারা দু'জন মিলে কদর খাঁকে বুখারা ও সমরখন্দ থেকে হটিয়ে তুর্কিস্তানের দিকে তাড়িয়ে দেন এবং নিজেরা মধ্য এশিয়া অধিকার করে নেন।[১] এ বিপ্লবের সঠিক তারিখ কেউ লিপিবদ্ধ করেননি। তবে এটা নিশ্চিত যে, ৪০৮ হিজরী ও ৪১৫ হিজরীর মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল।

মাহমুদ গযনবীর আগমন

আলী তগীন ও আরসালান ইবনে সালজুকের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে কদর খাঁ সুলতান মাহমুদ গযনবীর সাহায্য প্রার্থনা করলেন। মাহমুদ নিজেও মধ্য এশিয়ায় অভিযান পরিচালনার ইচ্ছা পোষণ করতেন। তিনি এ আহ্বানে ত্বরিত সাড়া দিলেন এবং ৪১৫ হিজরীতে (১০২৪ খৃঃ) সেদিকে অগ্রসর হলেন। আলী তগীন খাঁর বিরুদ্ধে যেসব লোকের অভিযোগ ছিল তিনি বলখ পৌঁছলে তাঁরা এসে সমবেত হতে থাকে। অবশেষে ৪১৬ হিজরীর শুরুতে তিনি জায়হুন নদী বা আমুদরিয়া পার হন এবং মধ্য এশিয়ায় পদার্পণ করেন। মধ্য এশিয়ায় পদার্পণ করা মাত্র গোটা দেশব্যাপী তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। আমুদরিয়া তীরবর্তী কিছুসংখ্যক আমীর-উমরা আগেভাগেই এসেই তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন। আলী তগীন খাঁ আত্মগোপন করেন। আরসালান ইবনে সালজুকও নির্জন ও মরুপথ ধরে অগ্রসর হলেন। কাশগড় থেকে কদর খাঁ নিজে তাঁকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসলেন। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বমূলক সাক্ষাতকার হতে থাকলো।[২] এ সময়েই আরসালান ও তাঁর তুর্কমান সৈন্যদের বিষয়টিও আলোচিত হলো। তাঁর প্রতিনিয়ত শক্তি বৃদ্ধিতে কদর খাঁ অত্যন্ত বিপদাশঙ্কা প্রকাশ করে বললেন ঃ আপনি যদি কখনো ভারতবর্ষের জিহাদে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তাহলে এসব লোক দ্বারা বিপর্যয় সৃষ্টি অসম্ভব কিছু নয়। তাই কিছু লোভ দেখিয়ে তাদেরকে অনুগত[৩] করে নেয়া যথোচিত কাজ হবে বলে মনে হয়। এ পরামর্শদানের পর মাহমুদ তাঁর সাথে যে আচরণ করেন তা বর্ণনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। গারদিযী লিখছেন, মাহমুদ ইসরাঈল ইবনে সালজুককে গ্রেফতার করার জন্য লোক পাঠান এবং যখন সে বন্দী হয়ে তাঁর দরবারে আসে তখন তাঁকে ভারতে পাঠিয়ে বন্দী করা হয়।[৪] ইমাদ কাতেবের বর্ণনা মতে মাহমুদ তাঁকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে চাইলে

---

১. ইবনে আসীর, ইউরোপে মুদ্রিত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২৩।

২. যায়নুল আখবার, পৃষ্ঠা-৮১-৮২।

৩. রাহাতুস সুদূর, পৃষ্ঠা-৮৭।

৪. যায়নুল আখবার, পৃষ্ঠা-৮৪।

www.bjilibrary.com

সে তা এড়িয়ে যায়। এতে মাহমুদ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।[১] কিন্তু ইবনে আসীর, আবুল ফিদা, ইবনে খাল্লিকান, হামদুল্লাহ মুসতাউফা ও ইবনুর রাওয়ান্দী সামান্য মতপার্থক্য করে বর্ণনা করেন যে, মাহমুদ বন্ধুত্বের আকাঙ্খা প্রকাশ করে সালজুকদের কাছে তাদের নেতাকে সাক্ষাতের জন্য পাঠাতে বলেন। সালজুকরা এ বিষয়ে পরস্পর পরামর্শ করার পর এ আবেদন গ্রহণ করে এবং আরসালান (অথবা ইসরাঈল)-কে সাক্ষাতের জন্য পাঠিয়ে দেয়। মাহমুদ বাহ্যতঃ তাঁর সাথে অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণ করেন এবং বন্ধুত্বের দাবী করতে থাকেন। কিন্তু মূলতঃ তিনি তার মূলোৎপাটনের চিন্তা করতে থাকেন। অবশেষে একদিন প্রতারণা-মূলকভাবে তাকে গ্রেফতার করেন এবং ভারতে পাঠিয়ে দেন।[২]

আরসালান ইবনে সালজুকের গ্রেফতারী

'তারীখে গুযীদা' এবং 'রাহাতুস্ সুদূর' গ্রন্থে মাহমুদের সাথে আরসালানের সাক্ষাত, আলোচনা এবং গ্রেফতার হওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এ বর্ণনা খুব বেশী নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু তা থেকে একথা অনুমান করা যায় যে, সে সময় এসব ঘটনাবলী সম্পর্কে কি ধরনের কাহিনী ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। তাঁরা লিখেছেন ঃ মাহমুদের পক্ষ থেকে দাওয়াতনামা পেয়ে আরসালান পূর্ণ একটি সেনাদল নিয়ে মাহমুদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। মাহমুদ তাকে বলে পাঠালেন যে, আমার কোনো প্রকার সামরিক সাহায্যের প্রয়োজন নেই। আমার শুধু সাক্ষাত ও সহানুভূতি প্রয়োজন। অতএব, সৈন্য-সামন্ত রেখে শুধু বিশেষ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে এস। সুতরাং আরসালান সৈন্যদের রেখে বাছাবাছা কিছুসংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে মাহমুদের তাঁবুতে এসে পৌছালেন। তিনি তাকে অত্যন্ত উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন এবং নিজের পাশে সিংহাসনে বসালেন। কিছুক্ষণ একথা সে কথা বলার পর বললেনঃ ভারতবর্ষে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমার সবসময় বিশাল আকৃতির সেনাবাহিনীর প্রয়োজন হয় এবং সেই মুহূর্তে খোরাসান অঞ্চল শূন্য ও অরক্ষিত থেকে যায়। তাই আমাদের মধ্যে এমন একটা চুক্তি হওয়া দরকার যে, কখনো কোনো দুশমন যদি মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং আমার সাহায্যের দরকার হয়, তাহলে যেন তোমার সেনাবাহিনীর সাহায্য লাভ করতে পারি। জবাবে আরসালান বললেন ঃ এ ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে কোনো ত্রুটি বা গাফলতি হবে না। মাহমুদ জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি পরিমাণ সৈন্য দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারবে? আরসালানের বাহুতে ধনুক বাঁধা

১. যুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-৫।

২. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯৭ ; আবুল ফিদা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৩; ইবনে খাল্লিকান, তুগরুল বেগের অনুবাদ ; তারীখে গুযীদা, পৃষ্ঠা-৪৩৫, রাহাতুস সুদূর, পৃষ্ঠা-৮৭-৮৮।

www.bjilibrary.com

ছিল। তার তরবারির কোষের মধ্যে দু'টি তীর ছিল। সে একটি তীর বের করে বললো ঃ প্রয়োজনের মুহূর্তে এটি আমার সেনাবাহিনীর কাছে পাঠিয়ে দিবেন। এক লাখ সৈন্য আপনাকে সাহায্য করতে এসে পৌঁছবে। মাহমুদ বললেন ঃ তা যদি যথেষ্ট না হয় ? আরসালান দ্বিতীয় তীরটি দিয়ে বললেন ঃ এটি 'বাগানকোহ' পাঠিয়ে দিলে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। মাহমুদ বললেন ঃ তাও যদি যথেষ্ট না হয় ? আরসালান ধনুকটি দিয়ে বললেন, এটি তুর্কিস্তান পাঠিয়ে দিবেন। যদি দুই লাখ সৈন্যেরও দরকার হয় তা এসে হাজির হবে।

এ আলোচনার মাধ্যমে মাহমুদ সালজুকদের শক্তি ও জাঁকজমক অনুমান করতে পারলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, এই ভয়ংকর শক্তির মূলোৎপাটন দরকার। তাই তিনি আরসালানের সম্মানে একটি মজলিস সাজালেন। তিনদিন ও তিনরাত ধরে আমোদ-ফূর্তি চালু রাখলেন এবং সমস্ত মেহমানকে উপহার-উপঢৌকন দিলেন। অতপর নিজের আমীর-উমরাদের ইংগিত দিয়ে জানিয়ে দিলেন, তারা প্রত্যেকে যেন আরসালানের লোকদের এক একজনকে দাওয়াত দেন এবং প্রচুর পরিমাণে শরাব পান করিয়ে আটক করেন। একই পন্থায় মাহমুদ নিজে আরসালানকে দাওয়াত করলেন এবং নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তাকে গ্রেফতার করে রাতারাতি ভারতে পাঠিয়ে দিলেন।

ভারতে আরসালানকে কালিঞ্জর[১] দূর্গে বন্দী করা হয়। সাত বছর পর্যন্ত সে সেখানেই বন্দী থাকে। এ সময় তার সেনাবাহিনীর দু'জন তুর্কমান সৈন্য দুর্গের মধ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়। তারা তাকে মুক্ত করার উপায় খুঁজছিল। দুর্গের মধ্যে পৌঁছে তারা পানি সরবরাহের কাজ জুটিয়ে নেয় এবং একদিন সুযোগ বুঝে তাকে সংগে নিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু পথ-ঘাট জানা না থাকার কারণে এক বিশাল প্রান্তরে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলে। ওদিকে দুর্গের দায়িত্বশীল কোতোয়াল তাদের খুঁজতে খুঁজতে একেবারে মাথার ওপর এসে হাজির হলে আরসালান তার পুনর্বার গ্রেফতার হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যান। তখন সে তুর্কমানদের বলে যে, তোমরা দেশে ফিরে যাও এবং অন্যান্য ভাইদের বলো ঃ

রাজত্ব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করো। সে যদি দশবারও তোমাদের পরাস্ত করে তবুও সাহস হারাবে না। কারণ, এই বাদশাহ দাসপুত্র। তার তেমন কোনো বংশ-পরিচয় নেই। সে বিশ্বাসঘাতক। রাজত্ব তার হাতে থাকবে না, বরং পরিশেষে তোমাদের হাতে চলে আসবে।"

---

১. এ কালিঞ্জর বুন্দেল খণ্ডে অবস্থিত বর্তমান সময়ের বিখ্যাত কালিঞ্জর দূর্গ নয়। এটি মুলতান অঞ্চলে অবস্থিত ছিল।

www.bjilibrary.com

অতপর আরসালান গ্রেফতার হয়ে আবার দূর্গে প্রেরিত হলো এবং এ যাত্রা তাকে এমন কঠিন বন্দীদশায় রাখা হলো যে, শেষ পর্যন্ত তার জীবনটাই নিঃশেষ হয়ে গেল। তার পুত্র কুতলমুশ যে তাকে মুক্তি করার উদ্দেশ্যে এসেছিল তার মৃত্যুর খবর শুনে 'সুরখ্ কালাহানের' নির্জন প্রান্তরের পথ ধরে প্রথমে সিস্তান এবং পরে বোখারায় গিয়ে উপস্থিত হলো। আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের আরসালানের মৃত্যুর খবর দিলে তাদের মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা নতুন করে চাঙ্গা হয়ে উঠলো।[১]

আরসালানের কওমের লোকদের খোরাসানে প্রবেশ

কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, আরসালানের মৃত্যুর পর সালজুকরা সুলতান মাহমুদের কাছে আবেদন জানায় যে, মধ্য এশিয়ার চারণ ক্ষেত্রসমূহ আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই আমাদেরকে আমুদরিয়া পার হয়ে খোরাসানে বসবাসের অনুমতি দিন।[২] তবে এ বর্ণনাটি ভ্রান্ত বলে মনে হয়। যায়নুল আখবারের বর্ণনা মতে আরসালান ৪১৬ হিজরীতে গ্রেফতার হন এবং সাত বছর পর্যন্ত বন্দী থাকেন। এভাবে হিসেব করলে তাঁর মৃত্যু ৪২৩ হিজরীতে হওয়ার কথা। কিন্তু ঐতিহাসিকদের ঐকমত্য ভিত্তিক রায় অনুসারে ৪২১ হিজরীতে মাহমুদের ইনতিকাল হয়। এ ক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যুর পর খোরাসানে বসবাসের অনুমতি প্রার্থনা করা কি করে সম্ভব ছিল ?

প্রকৃত ঘটনা হলো, আরসালানকে গ্রেফতার করার পর তাঁর জাতির সাথে কিরূপ আচরণ করা উচিত সে বিষয়ে মাহমুদ তাঁর পারিষদবর্গের সাথে পরামর্শ করেন। তুসের গভর্নর আরসালান জাযেব[৩] পরামর্শ দেন যে, তাদেরকে আমুদরিয়ার পানিতে ডুবিয়ে দিন কিংবা তাদের বৃদ্ধাঙ্গলি কেটে দিন যাতে তীর চালাতে না পারে। কিন্তু মাহমুদ একে নিষ্ঠুরতা ও নির্দয় আচরণ বলে আখ্যায়িত করে তাদেরকে খোরাসানের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ে বসবাস করতে

---

১. রাহাতুস সুদূর, পৃষ্ঠা-৮৭-৯৮ ; তারীখে গুযীদা পৃষ্ঠা-৪৩৫। জানা নেই ইবনে আসীর কোন্ প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে লিখেছেন যে, আরসালান ৪২৬ হিজরী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং একই বছরে সালজুক ও গযনবীদের মধ্যে অস্থায়ী সন্ধি চুক্তি হলে সালজুকরা তার মুক্তির দাবী জানিয়েছিল। তাই তাঁকে কালিঞ্জর থেকে বলখে নিয়ে যাওয়াও হয়েছিল। কিন্তু সন্ধি ভঙ্গ হয়ে গেলে তাঁকে পুনরায় ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়।-(৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯৯)

২. তারীখে গুযীদা, পৃষ্ঠা-৪৩৫; রাহাতুস সুদূর, পৃষ্ঠা-৯২-৯৩।

৩. তারীখে গুযীদা ও জুবদাতুন নাসরা গ্রন্থে তার নাম আরসালান হাজেব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যায়নুল আখবার বায়হাকী, ইবনে আসীর, আবুল ফিদা এবং রাহাতুস সুদূর গ্রন্থে আরসালান জাযেব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ নামটিই সঠিক বলে মনে হয়।

www.bjilibrary.com

দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যাতে তারা সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে।[১] যায়নুল আখবার গ্রন্থের প্রণেতা লিখেছেন যে, খোদ সালজুকরাই খোরাসানে গিয়ে বসবাসের আবেদন জানিয়েছিল।[২] কিন্তু একদিকে আরসালান ইবনে সালজুকের গ্রেফতার হওয়া আর অপরদিকে মাহমুদের রাজ দরবারে হাজির তাঁর জাতির খোরাসানের পাসপোর্ট চাওয়ার মধ্যে আমরা কোনো সামঞ্জস্য ও সংগতি খুঁজে পাই না।

খোরাসানে তাদের বিদ্রোহ

মাহমুদ যে সময় আরসালান ইবনে সালজুকের কওমকে খোরাসানে পুনর্বাসিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন ঠিক সেই সময়ই আরসালান জাযেব মত প্রকাশ করেছিলেন যে, এটা মারাত্মক এক ভুল সিদ্ধান্ত পরে এ জন্য অনুশোচনা করতে হবে।[৩] কতকগুলো উদ্দেশ্য সামনে রেখে মাহমুদ এ কাজ করেছিলেন। যেমন ঃ খোরাসানের বিভিন্ন দূরবর্তী অঞ্চলে বসতিস্থাপন করার কারণে তাদের মধ্যেকার ঐক্য ও সংহতি নষ্ট হয়ে যাবে এবং তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। সভ্য জাতিসমূহের সংস্পর্শে থাকার কারণে তাদের জংলী স্বভাব ও যুদ্ধংদেহী মনোভাব বিদূরিত হবে। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তারা যখন খোরাসানের সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থার অধীনে আসবে তখন সহজেই তাদেরকে কাবু করে রাখা যাবে। কিন্তু এসব কৌশল ও যুক্তি ভিত্তিহীন প্রমাণিত হলো এবং এ ক্ষেত্রে ইতিহাস চূড়ান্ত যে সিদ্ধান্ত দিল তা এই যে, এ জাতিকে খোরাসানে পুনর্বাসিত করা গযনবী রাজনীতির দিক দিয়ে একটা মারাত্মক ভুল ছিল।

যাই হোক, মাহমুদের অনুমতিক্রমে এসব লোক খোরাসানে প্রবেশ করে এবং কিছুকাল পর্যন্ত অত্যন্ত অনুগত প্রজা হিসেবে বসবাস করে। সেই সময় তারা ইরাকের নেতা আবু সালেহ হামদারীর[৪] সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে নিয়েছিল। তাই আমরা শুনতে পাই, একবার তারা তাকে উপহার হিসেবে তিনটি খুতালী ঘোড়া, সাতটি বুখতি উট এবং তিন শত তুর্কী বকরী

---

১. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯৭ ; জুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-৫ ; আবুল ফিদা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৩; ইবনে খাল্লিকান, তুগরুল বেগ অনুদিত।

২. যায়নুল আখবার, পৃষ্ঠা-৮৫।

৩. যায়নুল আখবার, পৃষ্ঠা-৮৫।

৪. ইমাদ কাতেব, ইবনে আসীর বায়হাকী ও গারদিযী তার নাম হামদানী বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সাআলবী তার তাইমিয়া নামক গ্রন্থে হামদাবী বলে উল্লেখ করেছেন। আর ফারখী তার একটি কাসিদায় তার সাথে কিসরাবী, বাসবী মানবী ইত্যাদি ছন্দ রচনা করেছেন।

www.bjilibrary.com

দিয়েছিল।[১] কিন্তু এই অবস্থা খুব বেশী দিন পর্যন্ত থাকেনি। খোরাসানের গভর্নর তাদের প্রতি কঠোরতা দেখাতে থাকলে প্রত্যুত্তরে তারাও কঠোরতা দেখাতে থাকে। ফল দাঁড়ায় এই যে, খোরাসানের উচ্চভূমি অঞ্চল হাংগামা ও বিপর্যয়ের শিকার হয়। নাসা, বাওয়ারদা[২] এবং ফারাদার লোকজন সুলতান মাহমুদের কাছে ফরিয়াদ নিয়ে হাজির হয় (৪১৮ হিজরী)। মাহমুদ আরসালান জাযেবকে তাদেরকে শায়েস্তা করার নির্দেশ দেন। নির্দেশ অনুসারে তিনি তাদের দলের ওপর একের পর এক হামলা চালাতে থাকেন। কিন্তু তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারেন না। মাহমুদের কাছে ক্রমাগত অভিযোগ পৌঁছতে থাকলে তা বন্ধ করার জন্য আরসালান জাযেবকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় লিখলেন। জবাবে আরসালান জানালেন তাদের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনি নিজে এসে যদি তাদের দমন না করেন, তাহলে তাদের এ ফিতনা সীমা ছাড়িয়ে যাবে। অবশেষে ৪১৯ হিজরীতে (১০২৮ খৃঃ) মাহমুদ নিজে গযনী থেকে যাত্রা করলেন এবং বুসতের পথে তুসে পৌঁছলেন। রুবাতে ফারাওয়ার সন্নিকটে সালজুকদের সাথে তাঁর যুদ্ধ হলো। মাহমুদের শক্তির বিরুদ্ধে সংঘর্ষে তারা এমনভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল যে, তারা বলখানকোহ, জুরজান ও দিহিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়লো। তাদের একটি দল আজারবাইজান পর্যন্ত চলে গেল।[৩]

মাহমুদের ইনতিকাল ও মাসউদের সিংহাসন লাভ

৪২১ হিজরীতে (১০৩০ খৃঃ) সুলতান মাহমুদের ইনতিকালের কারণে সাময়িকভাবে এসব তুর্কমানদের ভাগ্য কিছুটা সুপ্রসন্ন হয়। মাহমুদের পরে মুহাম্মদ ও মাসউদের (তাঁর দুই পুত্র) মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং মাসউদের সিংহাসন আরোহণের মধ্যে দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। যেসব গুণাবলী মাহমুদের সাফল্যের কারণ হয়েছিল মাসউদের মধ্যে তা ছিল না। সে ছিল সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন, বিলাসী এবং অপরিনামদর্শী। সুযোগকে কাজে লাগানোর পরিবর্তে তা নষ্ট করতেই সে বেশী জানতো। সর্বোপরি সে ছিল একগুঁয়ে ও স্বেচ্ছাচারী। মাহমুদ যেসব রাজনৈতিক পরামর্শদাতা এবং সামরিক অধিনায়কদের সহায়তায় মথুরা থেকে 'রায়' পর্যন্ত তাঁর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মাসউদের সময়েও তাঁরাই বর্তমান ছিলেন। কিন্তু সে তাদের কাজে লাগায় নাই শুধু তাই নয়, বরং সবসময় তাদের সৎ পরামর্শের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। যার ফলে প্রতিষ্ঠিত সালতানাত কয়েক বছরের মধ্যে বিপর্যস্থ হয়ে পড়ে।

---

১. জুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-৫।

২. স্থানটির নাম বাওয়ারদ ও আবিওয়ারদ উভয়টিই।

৩. যায়নুল আখবার, পৃষ্ঠা-৭৯-৯০ ; ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫৭ ; ইবনে খাল্লিকান, তুগরিল বেগের অনুদিত।

www.bjilibrary.com

প্রথমেই সে তার ভাই মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে নিজের শক্তি সুদৃঢ় করার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করে তা ছিল অত্যন্ত অপরিণামদর্শিতা। সে আলী তগীন খাঁকে লিখেছিল ঃ আমার ভাইয়ের সাথে যুদ্ধ করতে চাই। এ ক্ষেত্রে তুমি যদি আমাকে সাহায্য করো, তাহলে আমি তোমাকে একটি এলাকার শাসন কর্তৃত্ব দিয়ে দেব। তার আমীর-উমরা ও সভাসদগণ এর চরম বিরোধিতা করলেন। তারা বললেন ঃ আলী তগীন একজন লোভী ব্যক্তি। এভাবে তার সাহস বেড়ে যাবে এবং একটি মাত্র অঞ্চল নিয়ে সে কখনো সন্তুষ্ট থাকবে না। কিন্তু মাসউদ কারো কথায় আদৌ কর্ণপাত করলেন না।

সালজুক তুর্কমানদের সাথে মাসউদের আচরণ

অপরদিকে মাহমুদ যেসব তুর্কমানদেরকে খোরাসান বহিষ্কার করে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন সে তার সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য কাজে লাগাতে চেষ্টা পায় এবং তাদের মধ্য থেকে ইয়াগমুর, কিযল, বুকা, কুকতাশ এবং অন্যান্য নেতাদেরকে তাদের দলবল সহ নিজের সান্নিধ্যে ডেকে কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করেন। পরবর্তী সময়ে তারাই অত্যন্ত অনুনয় বিনয় ও আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে তাদের অন্যসব আত্মীয় বন্ধুদের জন্য সেখানে বসত করার অনুমতি নিয়ে দেয়।[১] এরপর তার উচিত ছিল, মন জয় করে তাদেরকে আপন ও অনুগত করে নেয়া। কিন্তু মাসউদ একের পর এক ভুল করে যাচ্ছিলো। তাদের সাহায্যে কার্যোদ্ধারের পর সে তার ইরাকের সেনাধ্যক্ষ তাশ ফাররাশকে তাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে তাদের বড় বড় নেতাকে গ্রেফতার করতে বলে। এ সময় তার উজীরে আযম আহমদ ইবনে হাসান মায়মান্দী উপস্থিত ছিলেন। তিনি এ সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলেন ঃ

"প্রথমদিকে এসব তুর্কমানদের এনে প্রতিষ্ঠিত করাটাই ভুল ছিল। সেদিন আমি আলতুন তাশ, আরসালান জাযেব এবং অন্যান্যরা অনেক বুঝিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের কথায়, আদৌ কর্ণপাত করা হয়নি। কেননা প্রাক্তন আমীরের তাঁর নিজের মতে জিদ ধরে থাকার অভ্যাস ছিল। সেই ভুলের কারণে এমন ফিতনা সৃষ্টি হয় যে, শেষ পর্যন্ত তাঁদেরকে খোরাসান থেকে বহিষ্কার করতে হয়। এরপর আপনি পুনরায় তাদেরকে নিয়ে আসেন। এখন এ জাতির লোকেরা নিরিবিলি বসবাস করছে এবং সরকারের সেবা করে যাচ্ছে। এখন তাদেরকে একজনের তত্ত্বাবধানে রাখাই যথাযথ বলে মনে হয়। তাদের নেতৃবর্গকে গ্রেফতার করলে তাদের আস্থা নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব, এ কাজ ঠিক হবে না।[২]

১. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৭০-৭১ ; ইবনে খাল্লিকান, অনুবাদ তুগরুল বেগ, ইবনে আসীর, ইউরোপে মুদ্রিত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৭।

২. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৩২২-৩২৩।

www.bjilibrary.com

কিন্তু মাসউদ জেদী ও নিজের মতে আস্থাশীল হওয়ার কারণে এ সঠিক সিদ্ধান্তটিকে প্রত্যাখ্যান করে বললো : "এটা তাদেরই কয়েকজন নেতার ইচ্ছানুসারে করা হচ্ছে। এতে খাজা আহমদ নিশ্চুপ হয়ে গেলেন এবং বাইরে এসে তিনি খাজা আবু নাসর মুশকান আবু সাহল যাওযানীকে বললেন : এটি একটি মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত। তুমি সাক্ষী থাকো, আমি এর বিরোধিতা করে দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়েছি।"

মোটকথা মাসউদের নির্দেশে তাশ ফাররাশ নিশাপুরের সন্নিকটে তাদের পঞ্চাশজনেরও অধিক নেতাকে হত্যা করে এবং দলের ওপর আকস্মাত ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যায় এবং প্রায় দশ বছর পর্যন্ত রায়, ইস্পাহান, আজারবাইযান, মুসেল এবং দিয়ার বকর অঞ্চলে লুটতরাজ চালিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে ৪৩২ সনের পর তুগরুল ও চাগরী তাদের অঞ্চল দখল করে নিলে তারা বিভিন্ন সময়ে তাদের আনুগত্য গ্রহণ করে। ইবনে আসীর ও বায়হাকী এদেরকেই ইরাকী গুয নামে অভিহিত করেছেন।[১]

---

১. ইবনে আসীর উপরোক্ত দেশসমূহে তাদের লুটতরাজের যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ :

এসব লোক খোরাসান থেকে পালিয়ে রামগান, খারলারী, ইসহাকাবাদ ও অন্যান্য অঞ্চল লুটতরাজ করতে করতে রায় শহরে গিয়ে উপনীত হয় এবং সেখানে প্রবেশ করে লুটপাট চালায়। এরপর তাদের একটি দল আজারবাইজান চলে যায় এবং সেখানে এমন অন্যায় অত্যাচার চালায় যে, কুর্দীরা অতিষ্ঠ হয়ে তাদের ওপর আক্রমণ চালায় এবং নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেয়। এবার তারা জিবালের দিকে অগ্রসর হয় এবং রায়, হামদান, কাযবীন, আসাদাবাদ ও কিনাওয়ার অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এমন ধ্বংসযজ্ঞ চালায় যে, গোটা দেশের মানুষ আর্তচিৎকার করে ওঠে। তুগরুল ও সুলতান মাসউদের মধ্যে যতদিন সংঘাত ছিল এ অবস্থাও ততদিন ছিল। পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এরপর গযনবীদের থেকে মুক্ত হয়ে সালজুকরা জিবাল ও তাবারিস্তানের দিকে অগ্রসর হলে তাদের ভয়ে তুর্কমানরা আজারবাইজানের দিকে পালিয়ে যায়। কেননা, তারা তুগরুলের খান্দানের প্রজা ছিল এবং তার মোকাবিলা করার সাহস পাচ্ছিল না। তারা আযারবাইজানে লুটতরাজ চালাতে চালাতে দিয়ারে বকর, জাযিরায়ে ইবনে উমর, মুসেল, বুখারা এবং নাসিবাইন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। বাহ্যিকভাবে তারা যেহেতু তুগরুল বেগকে নেতা মানতো এবং খোতবায় খলীফার নামের পরেই তার নাম উল্লেখ করতো, তাই তাদের দুষ্কর্ম যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন জালালুদ্দৌলা ইবনে বুয়াই এবং নাসরুদ্দৌলা ইবনে মারওয়ান তুগরুলের কাছে অভিযোগ করে পত্র পাঠালেন। জবাবে তুগরুল ক্ষমা চাইলেন এবং লিখলেন, এসব লোক আমাদের প্রজা ও খাদেম ছিল। কিন্তু আমরা যেসব সবুক্তগীণ খান্দানের সাথে যুদ্ধ এবং খাওয়ারিজমদের ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলাম তখন তারা এদিকে চলে আসে এবং ফাসাদ ও বিপর্যয় শুরু করে। বর্তমানে আমরা ঐসব ঝামেলা থেকে মুক্ত। অচিরেই আমরা তাদেরকে আনুগত্য ফাসাদ সৃষ্টি করা ত্যাগ করতে বাধ্য করবো।–(ইউরোপে মুদ্রিত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৬-২৭৬)

www.bjilibrary.com

অপরদিকে যখন ইয়াগমূর ও তার সাথী তুর্কমানদের সাথে তাশ যার্‌রাশের আচরণের খবর বালখানকোহে তাদের অন্য গোত্রগুলো লাভ করে তখন প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তারা খোরাসানে প্রবেশ করে ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে শুরু করে।[১] ৪২৪ হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে তাদের বিদ্রোহ সীমা ছাড়িয়ে গেলে মাসউদ রায়ও খোরাসানের গভর্নরদের তাদেরকে শায়েস্তা করার নির্দেশ দেন। তিনি তাদেরকে রায় অঞ্চলে অবরুদ্ধ করে ফেলার নির্দেশ দেন। কিন্তু সালতানাতের যেসব প্রশাসক গভীরভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতেন তারা খুব ভাল করেই বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, এ যাত্রা অন্তত খোরাসানের ভাগ্যলিপিতে কোনো কল্যাণ নেই। বায়হাকী লিখছেন ঃ সেই সময় আমার শিক্ষক আবু নাসর মুশকান তাঁর গুযগানান ও কিরমানস্থ গোমস্তাকে পত্র মারফত নির্দেশ দিলেন যে, তোমার কাছে আমার যে দশ হাজার ভেড়া বকরী আছে তা অনতিবিলম্বে বিক্রি করে নগদ অর্থ বানিয়ে নাও। আমি এতে বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনি বললেন ঃ

রায় অঞ্চলে তুর্কমানদের অবরোধ করা একটি ভুল সিদ্ধান্ত এবং অবৈধ ব্যবস্থা। কারণ, এভাবে তিন চার হাজার অশ্বারোহী সৈনিককে অবরোধ করা সম্ভব নয়। রায় অঞ্চলে এ খবর পৌছলে সেখানে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়বে এবং বালখানকোহ থেকে ইয়াগমুরের পুত্র আরো সৈন্য নিয়ে আসবে। এরপর তারা সবাই মিলে খোরাসানে প্রবেশ করবে, গবাদি পশু ও অন্য যাকিছু পাবে লুট করে নিয়ে যাবে এবং বড় রকমের বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। এই পরিণাম আমি আগেভাগেই বুঝতে পেরেছি। তাই নির্দেশ দিচ্ছি আমার বকরীগুলো অবিলম্বে বিক্রি করে ফেলো। তা যদি খুব সস্তায়ও বিক্রি করা হয়, তাও তো আমি কিছু লাভ করবো। আমি এবং খাজা বুজর্গ (উজীরে আজম) তাঁকে অনেক বুঝালাম। কিন্তু কোনো ফল হলো না। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এই ব্যক্তি (মাসউদ) সাহস ও শৌর্যবির্যে ছিলেন পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত তাঁর পিতা (সুলতান মাহমুদ) ছিলেন একজন অহংকারী কিন্তু দূরদর্শী ব্যক্তি। 'আমি করবো' বলে কোনো ভুল কথা বললেও তা বলতেন রাজকীয় গুরু-গম্ভীরতা ও জাঁকজমকের সাথে। কেউ তাঁর এ সংকল্পের দোষ-ত্রুটি বা সঠিক-বেঠিক হওয়ার বিষয়ে মত প্রকাশ তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হতেন এবং তাকে তিরস্কার করতেন। কিন্তু শান্ত মনে যখন চিন্তা করতেন তখন আবার সঠিক পথে ফিরে আসতেন। কিন্তু এ সরকারের অবস্থা হলো, চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই নিজের সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করেন। জানি না এর পরিণাম কি হবে।[২]

---

১. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৪৬০।
২. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৪৯৪-৪৯৫।

www.bjilibrary.com

আরসালান ইবনে সালজুকের নেতৃত্বাধীন সালজুক গোষ্ঠীর ইতিহাস এখানেই শেষ হয়ে যায়। এখন আমরা তুগরুল বেগ ও চাগরীল বেগের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীর ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফিরাবো।

তুগরুল বেগ ও আলী তগীন খাঁর লড়াই

স্মরণ আছে হয়তো যে, বগরা খানের কবল থেকে উদ্ধার পেয়ে এসব লোক জ্বান্দ অঞ্চলের দিকে চলে গিয়েছিল। এরপর প্রায় ৩০ বছরের মত সময় তারা জান্দ ও খাওয়ারিজমের মধ্যবর্তী চারণক্ষেত্রসমূহে অতিবাহিত করে এবং মধ্য এশিয়ার ব্যাপারে কোনো উল্লেখযোগ্য তৎপরতা দেখায়নি। অবশেষে ৪১৬ হিজরীতে আরসালান ইবনে সালজুক গ্রেফতার হলে তার কওম মধ্য এশিয়ার এলাকা থেকে বেরিয়ে গেলে মাহমুদ গযনবী সে অঞ্চল থেকে অন্যদিকে মনযোগ দেয়া মাত্র আলী তগীন খা পুনরায় বুখারায় ফিরে আসেন। তিনি আরসালানের স্থলে তুগরুলের চাচাত ভাই ইউসূফকে (যিনি মূসা ইবনে সালজুকের পুত্র ছিলেন) নিজের দরবারে ডেকে নেন, খাতির যত্ন করেন ও সম্মান করেন এবং তার নিজের অধিনস্ত সমস্ত তুর্কী সৈন্যের কমাণ্ডার নিযুক্ত করেন। এছাড়া তাকে বড় একটি জায়গীর দান করেন এবং ইনানিজ বেগু উপাধি দেন। কিন্তু কিছুকাল পরে কোনো একটি বিষয় নিয়ে উভয়ের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। এর কারণ হিসেবে বলা হয় যে, আলী তগীন খাঁ তাকে তুগরুল ও চাগরী বেগের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চাচ্ছিলেন। তিনি কি কারণে এরূপ চাচ্ছিলেন তা আমরা জানি না। বরং তাদের উভয়ের মধ্যে এটিই মতানৈক্যের কারণ ছিল তাও আমরা নির্ভরতার সাথে বলতে পারি না। মোটকথা, কারণ যাই হোক না কেন তাদের মতানৈক্য শেষ পর্যন্ত এতদূর গড়ায় যে, আলী তগীন খাঁ তার একজন আল্প কারাকে দিয়ে তাকে হত্যা করান।

এ ঘটনার খবর তুগরুল ও চাগরী বেগের কাছে পৌছলে তারা আলী তগীন খাঁর থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রওয়ানা হন। অপরদিক থেকে আলী তগীন খাঁও লড়াইয়ের জন্য রওয়ানা হন। ৪২০ হিজরীতে (১০২৯ খৃঃ) উভয় পক্ষের মধ্যে মোকাবিলা হয় এবং আলী তগীন খাঁ পরাজিত হন। এ সময় চাগরী বেগের সন্তান আল্প আরসালানের জন্ম হয়। বিজয়ের এ মুহূর্তে তার জন্মগ্রহণের ব্যাপারটিকে তুর্কমানরা অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক বলে মনে করে। অতপর ৪২১ হিজরীতে তারা দুই ভাই মিলে ইউসুফের হত্যাকারী কারা'র ওপর হামলা করেন এবং প্রায় এক হাজার লোকসহ তাকে হত্যা করে। এসব বিদ্রোহ ও বাড়াবাড়িতে উত্তেজিত হয়ে আলী তগীন খাঁ একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে তাদের ওপর আক্রমণ করেন। এ বাহিনীর মোকাবেলা করার ক্ষমতা

www.bjilibrary.com

তাদের ছিল না। তাই এ যুদ্ধে সালজুক সেনাবাহিনীর বহু সৈনিক নিহত হয়, তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত হয় এবং বুখারার সৈন্যরা তাদের নারী ও শিশুদের দাসদাসী বানিয়ে নিয়ে যায়।[১]

গযনবীদের বিরুদ্ধে উভয়ের ঐক্য

কিন্তু এ যুদ্ধ দীর্ঘদিন চলেনি। অনতিবিলম্বে উভয় পক্ষই বুঝতে পারে যে, তারা পরস্পরের মুখাপেক্ষী। একদিকে আলী তগীন খাঁ বুখারায় কদর খাঁ এবং সুলতান মাসউদের তোয়াক্কা না করে নিজের অবস্থানকে নিরাপদ রাখার জন্য সাহসী এবং যুদ্ধবাজ সালজুকদের মুখাপেক্ষী ছিলেন। অপরদিকে নিজের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য সালজুকদের সামনে বুখারার চেয়ে উত্তম কোনো ক্ষেত্র ছিল না। তাই ৪২১ হিজরীর শেষ দিকে অথবা ৪২২ হিজরীর শুরুতে উভয়ের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়। এই মিত্রতা সৃষ্টির সাথে সাথে খোরাসানে গযনবী শক্তির বিরুদ্ধে একটি মারাত্মক বিপদ সৃষ্টি হয়ে যায়। ৪২২ হিজরীর শাওয়াল মাসে মাসউদ যখন ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সংকল্প করছিলেন ঠিক তখনই এই ঐক্যের খবর তাঁর কাছে গযনীতে পৌছে। এ খবরটি অত্যন্ত আকস্মিকভাবে মাসউদের গতি লাহোরের দিক থেকে বলখের দিকে ফিরিয়ে দেয়।[২] যুলকা'দা মাসে বলখে পৌছে তিনি জানতে পারেন যে, সালজুকদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আলী তগীন পূর্ণরূপে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। তিনি এখন কেবল সুযোগের অপেক্ষায় আছেন। গযনবীদের দৃষ্টি অন্য কোনোদিকে আকৃষ্ট হওয়ার সাথে সাথে তিনি খোরাসানের ওপর আক্রমণ করে বসবেন। এই বিপদাশঙ্কার কারণে মাসউদ প্রতিপক্ষের আক্রমণের জন্য অপেক্ষা না করে নিজেই যুদ্ধের সূচনা করতে বাধ্য হন। তাই তিনি গযনবী সালতানাতের খাওয়ারিজম প্রদেশের গভর্নর খাওয়ারিজম শাহ আলতুনতাশকে আলী তগীনের ওপর হামলা করার নির্দেশ দান করেন।

বোখারার ওপর আলতুনতাশের হামলা

৪২৩ হিজরীর (১০৩২ খৃঃ) রবিউল আউয়াল মাসে আলতুনতাশ বোখারার ওপর আক্রমণ করেন। দাবুসিয়া[৩] নামক স্থানে উভয় বাহিনীর মোকাবিলা হয়। এতে একদিকে আলী তগীনের শক্তি খর্ব হয়, অপরদিকে আলতুনতাশ এমনভাবে আহত হন যে, শেষ পর্যন্ত তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাননি। তাঁর মৃত্যুতে যুদ্ধ পরিস্থিতিই পাল্টে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

---

১. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯৭-১৯৮; রাওদাতুস সাফা এবং আবুল ফিদা কিঞ্চিত ভিন্নভাবে এসব ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আমার মতে, ইবনে আসীরের বর্ণনাই অধিক বিশুদ্ধ।

২. বায়হাকী, ৩৪৮ পৃষ্ঠা।

৩. এটি মধ্য এশিয়ার আমলে মুগদের একটি স্থান।—(মু'জামুল বুলদান, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩)।

www.bjilibrary.com

কিন্তু গযনবী সালতানাতের ব্যবস্থাপক ও পরামর্শদাতা খাজা আবদুস সামাদ প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখলেন এবং খাওয়ারিজম শাহ তাঁর ব্যক্তিগত মধ্যস্থতায় তোমার ও মাসউদের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে দিবেন।[১] একথা বলে আলী তগীনকে সম্মত করে সমরখন্দে ফেরত পাঠালেন। এ কৌশল অবলম্বনের ফলে এই বিপদটি সাময়িকভাবে কেটে যায়। তবে আরো একটু মনযোগ দিলে স্থায়ীভাবেই কেটে যেতো। কিন্তু এর পরপরই বলখের হাংগামাপূর্ণ পরিবেশের প্রতি মাসউদের বিলাসী ও আরামপ্রিয় মন মেজাজ বিরক্তিতে ভরে ওঠে। তাই তিনি ৪২৩ হিজরীর জমাদিউল উলা মাসে গযনীতে ফিরে যান।

হারূন ইবনে আলতুনতাশের বিদ্রোহ

দাবুসিয়ার যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় পথিমধ্যেই বৃদ্ধ খাওয়ারিজম শাহ মৃত্যু মুখে পতিত হন। মাসউদ তার সালতানাতের সভাসদবর্গের পরামর্শক্রমে তার স্থলে তার যুবক পুত্র হারূনকে খাওয়ারিজম শাহ হিসেবে সিংহাসনে বসান এবং একই সাথে উজীরে আজম আবদুস সামাদের যুবক ছেলে আবদুল জাব্বারকে ফাদাখদায়ী এলাকার শাসক হিসেবে পাঠান। হারূন কিছুকাল সঠিক পথে চললেন। তবে যে সময় তিনি খোরাসানের গযনবী সালতানাতের পতন লক্ষ্য করলেন তখন থেকে তাঁর মগজেও হঠকারিতা ও স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দিল। হারূনের এক ভাই গজনীতে মাসউদের কাছে থাকতেন। ঘটনাক্রমে তিনি এই সময়ে মারা যান। এতে ফিতনা সৃষ্টিকারীরা রটনা করে যে, মাসউদ ইচ্ছাকৃত-ভাবে তাকে হত্যা করেছে। এ ঘটনা তাঁর বিদ্রোহ করার একটা ওজুহাত সৃষ্টি করে দেয়। তিনি প্রকাশ্যে গজনবী রেসিডেন্ট আবদুল জাব্বারের অপমান ও অবমাননা শুরু করেন। নিজের স্বতন্ত্র পতাকা উত্তোলন করেন, সব স্থান থেকে স্বজাতীয় তুর্কীদের একত্র সমাবেশ করেন এবং আলী তগীন খাঁ ও অন্যান্য আমীরদের কাছে এ মর্মে পত্র পাঠান যে, গজনবীদের আধিপত্য ও নেতৃত্বের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলার জন্য এটাই উপযুক্ত সময়। এভাবে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর ৪২৫ হিজরীর রমযান মাসে নিজের নামে খোতবা পাঠ করান, যা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণার নামান্তর ছিল।

হারূন ও সালজুকদের ঐক্য

এ সময় সালজুক ও তাদের স্বজাতীয় তুর্কমানদের উপেক্ষা করা কঠিন ছিল। হারূন তাদেরকে নিজের দেশে আসার আহ্বান জানালেন। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে তুগরুল, চাগরী বেগ দাউদ এবং তাদের সাথে সালজুক ও নিয়ালী[২]

১. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৪১৬-৪৩৪ ; ইবনে আসীর, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১০।

২. নিয়ালী ছিল সালজুকদের স্বজাতীয় ও সহযোগী অন্য একটি গোষ্ঠী।-(তবকাতে নাসেরীর অনুবাদ দেখুন-পৃষ্ঠা-১২১)

www.bjilibrary.com

তুর্কমানরাও বিপুল সংখ্যায় খাওয়ারিজমে গিয়ে উপনীত হয়। হারুন তাদের যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করে শহরের বাইরে অবস্থান করান।[১] এতটুকু সহায়তা লাভ করা মাত্রই সালজুক তুর্কমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। তারা দেখলো খাওয়ারিজম শাহ ও আলী তগীনের মত শক্তিসমূহ তাদের সহযোগী ও পৃষ্ঠপোষক। তাই তারা খোরাসানের ওপর ছোটখাট হামলা করতে শুরু করে এবং মারু, সারাখ্স, বাদাগীস ও বাওয়ার্দ অঞ্চলে ঢুকে পড়ে। এসব বিশৃঙ্খলা দেখে ঘাবড়ে গিয়ে আবুল ফযল সূরী ৪২৫ হিজরীর যুলকা'দা মাসে মাসউদকে লিখে জানালেন যে, এখন আর খোরাসান আমার আয়ত্বে নেই। আপনি নিজে যদি না আসেন তাহলে এ অঞ্চল হাতছাড়া হয়ে যাবে।[২] খাওয়ারিজম অঞ্চলের বিভিন্ন খবর শুনে মাসউদ ইতিপূর্বেই প্রায় অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। এ পত্র পেয়ে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়লেন এবং সেই মাসেই খোরাসানের দিকে যাত্রা করলেন।

সালজুকদের ওপর শাহ মালেকের আক্রমণ

এদিকে সালজুক ও তাদের অপরাপর তুর্কমান ভাইয়েরা খোরাসানের ওপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল, অপরদিকে তাদের এক শত্রু শাহ মালেক[৩] তাদেরকে অসতর্ক দেখে খাওয়ারিজম এলাকায় প্রবেশ করে অকস্মাত তাদের সেনা ছাউনির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সালজুকরা এ আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়। তাদের সাত আট হাজার সৈনিক মারা যায়। সমস্ত মালপত্র লুণ্ঠিত হয় এবং কোনো রকমে রক্ষা পাওয়া লোকজন পালিয়ে আমুদরিয়ার অপর পারে রাবাত নামক স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেয়।[৪] ৪২৫ হিজরীর যুলহাজ্জ মাসে কুরবানীর ঈদের তৃতীয় দিনে এ ঘটনা সংঘটিত হয়। বায়হাকী লিখেছেন, রাবাত নমকের পাশেই একটি বড় জনপদ ছিল। সালজুকদের নির্মূল করার জন্য সেখানকার যুবকরা সশস্ত্র হয়ে হামলা করার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু নব্বই বছরের এক বৃদ্ধ তাদের বিরত রাখেন এবং বলেন ঃ যারা নিজে নিজেই মরছে তাদের মারা ঠিক নয়। তার এই উপদেশে তারা বিরত থাকলো। অন্যথায়

১. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৮৫৪-৮৫৬ ; ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১০।

২. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৫৩৫।

৩. শাহ মালেক জান্দ এলাকার আমীর ছিলেন। বুখারায় আগমনের পূর্বে তুগরুল এবং তার সাথীগণ জান্দ ও খাওয়ারিজম মধ্যবর্তী অঞ্চলে নিজের পশু পাল চরাতো এবং লুটতরাজ করে বেড়াতো। সেই সময়েই তাঁর সাথে তাদের মধ্যে চরম শত্রুতার সূত্রপাত হয়েছিল।-(তবকাতে নাসেরীর অনুবাদ, পৃষ্ঠা-১২০)

৪. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৮৫৬। ইবনে আসীর, আবুল ফিদা এবং মীর খোন্দ লিখেছেন যে, হারুনের ইংগিতেই ঐ আক্রমণ চালানো হয়েছিল। কিন্তু সমকালীন জীবিত ঐতিহাসিক বায়হাকী যা বর্ণনা করেছেন তা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

www.bjilibrary.com

তাদের এই আক্রমণে সালজুকদের সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। হারুন শাহ মালেকের এই ঘটনার খবর জানতে পেরে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি অবিলম্বে সালজুকদের কাছে দূত পাঠিয়ে তাদের প্রত্যাহার করে নিলেন, সান্ত্বনা দান করলেন। সাহস ও উৎসাহ যুগিয়ে শান্ত করলেন এবং পুনরায় তাদের সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে ও সংগঠিত করে মযবুত ও সুসংহত করলেন।[১]

খাওয়ারিজম শাহের হত্যা

অপরদিকে হারুন শাহ মালেককে মিত্রতা ও সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে লিখলেন যে, সালজুকদের পশ্চাদ্ধাবন ছেড়ে প্রথমে গজনবী শক্তির ফায়সালা করুন। শাহ মালেক এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং পারস্পরিক সিদ্ধান্ত অনুসারে ৪২৫ হিজরীর ২৭শে যুলহাজ্জ তারিখে আমুদরিয়ার তীরে উভয় সেনাবাহিনী সমবেত হলো। কিন্তু হারুনের প্রস্তুতি দেখে শাহ মালেক ভীত হয়ে পড়লেন এবং প্রতারণা করে নিজের দেশে ফিরে গেলেন। এককভাবে হামলা করার সাহস হারুনের ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে তিনি ফিরে গেলেন। খাওয়ারিজমে পৌঁছে তিনি সব এলাকা থেকে সৈন্য সংগ্রহ করলেন লোকজন ও সাজ- সরঞ্জাম দিয়ে সালজুকদেরকেও সাহায্য করলেন এবং এককভাবে যুদ্ধ করতে দৃঢ় সংকল্প হলেন।

কিন্তু তার নিজের ঘরেই এক সাংঘাতিক চক্রান্ত চলছিলো। খাওয়ারিজম এলাকার মধ্যেই আবদুল জাব্বার আত্মগোপন করেছিলেন। তিনি হারুনের দাসদেরকে পুরস্কার ও উপহার এবং ভবিষ্যত উন্নতির লোভ দেখিয়ে পক্ষে নিয়ে আসেন। ৪২৬ হিজরীর জমাদিউস সানী মাসে হারুন যখন পূর্ণ প্রস্তুতিসহ যুদ্ধ যাত্রা করেন তখন সুযোগ বুঝে তাঁর দাসেরাই তাঁকে হত্যা করে।[২] পরে হারুনের লোকজন আবদুল জাব্বারকেও হত্যা করে। এরপর ইসমাঈল ইবনে আলতুনতাশ সিংহাসনে বসেন এবং এভাবে খাওয়ারিজমের বিপদ অনেকটা তিরোহিত হয়।

মাসউদের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভুল

পরিস্থিতি যা ছিল তাতে মাসউদ যদি তৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করতেন তাহলে নিজের সমস্ত শত্রুর মূলোৎপাটন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সে সুযোগ হারিয়ে ফেললেন। ফলে তাঁর যে ক্ষতি হয় তা আর পূরণ হয়নি।

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খাওয়ারিজম ও খোরাসানের খবর শুনে বিচলিত হয়ে তিনি ইতিপূর্বেই ৪২৫ হিজরীর যুলকা'দা মাসে গজনী থেকে

১. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৮৫২।

২. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৮৫৯-৮৬০; ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১১।

www.bjilibrary.com

সেদিকেই যাত্রা করেছিলেন। যুলহাজ্জ ও মুহাররম মাস তিনি হিরাত ও সারাখসে কাটান। খাওয়ারিজম থেকে ক্রমাগত খবর আসছিল যে, হারূনকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত হয়েছে এবং আজ কিংবা আগামীকাল তিনি নিহত হবেন। রাষ্ট্রের আমীর-উমরা ও সভাসদগণ তাঁকে পরামর্শ দিলেন, এ সময় সুলতানের মারুতে অবস্থান করা প্রয়োজন যাতে সালজুক ও অন্যান্য তুর্কমানরা আমুদরিয়া অতিক্রম করার সাহস না পায়। কিন্তু মাসউদ গোটা মুহাররাম মাস সারাখসে কাটিয়ে দিলেন[১] এবং পরে সেখান থেকে বের হলেও নিশাপুরে চলে গেলেন। আরাম-আয়েশ ও আমোদ ফূর্তি ছাড়া সেখানে যাওয়ার আর কোনো ফায়দা ছিল না। এখানে গোটা সফর মাস অনর্থক কাটিয়ে দেয়ার পর পরামর্শের জন্য সভাসদদের একত্রিত করে বললেন ঃ

"এখানে আমার এক সপ্তাহ অবস্থানের ফলেই খোরাসান শান্ত হয়েছে এবং তুর্কমানরা জাহান্নামে চলে গেছে। এখন শুনছি দেহিস্তানে এক দিরহামে দশ মন গম এবং ১৫ মন যব পাওয়া যায়। তাছাড়া সেখানে প্রচুর পশু খাদ্য আছে। সৈন্যরা সেখানে আরাম পাবে শীত কম হবে এবং আমরা খাওয়ারিজম ও বালখানকোহের সন্নিকটেই থাকবো। অপরদিকে আমার উপস্থিতির খবর রায় ও জিবালে পৌঁছলে সেখানকার প্রাদেশিক শাসকদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে। বিদ্রোহী লোকেরা আনুগত্যের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং বাকালিঞ্জর (বা আবু কালীজার) গুরগান (জুরজান) এর দ্বিবার্ষিক ভূমি রাজস্ব পাঠাবে।২ তাছাড়া অন্যান্য স্থান থেকেও অর্থ ও সম্পদ উপহার আসবে। তারপর প্রয়োজন দেখা দিলে আমরা সারী এবং আমল অভিমুখে এগিয়ে যাব। শুনেছি আমালে হাজার হাজার মানুষের বসতি। মাথাপিছু এক দিনার হিসেবে নিলেও হাজার হাজার দিনার সংগৃহীত হবে। এভাবে তিন চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা নিশার ফিরে আসবো এবং প্রয়োজন হলে গ্রীষ্মকালও কাটিয়ে আসবো।"

এটা ছিল এমন এক বাদশাহর খেয়াল যার সালতানাত ছিল সেই সময় চরম বিপদের মুখে। উযীর আহমদ আবদুস সামাদ এই খেয়ালিপনার চরম বিরোধিতা করলেন। তিনি বললেন ঃ

---

১. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৫৪২-৫৪৩।

২. সুলতান মাসউদের অধিনস্ত নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন জুরজান ও তাবারিস্তানের শাসক দারা ইবনে মনুচেহের ইবনে কাবুস ইবনে দাশামগীর। তার সেনাবাহিনীর প্রধান এবং রাষ্ট্রের সর্বাধিক ক্ষমতাধর ব্যক্তি ছিলেন এবং এই আবু কালীজার। যদিও আবু কালীজারের কন্যা সুলতান মাসউদের স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু সেই সময়ের খোরাসানের অস্থিতিশীল অবস্থা দেখে তিনি জুরজানকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। মাসউদ সালজুকদের ছেড়ে ঐ বিদ্রোহের মূলোৎপাটনের দিকে মনযোগ দেন এবং জুরজান, আমূল ও তাবারিস্তানকে পুনরায় পরাজিত করে দারা ও আবু কালীজারকে অনুগত ও অধিনস্ত বানিয়ে নেন।-(ইবনে আসীর, ইউরোপে মুদ্রিত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০১)

www.bjilibrary.com

“ভারতবর্ষে আহমদ নিয়ালতগীনের ষড়যন্ত্র যদিও দমন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এ অঞ্চলকে পেছনে ফেলে এতো দূরে চলে যাওয়া উচিত নয়। অপরদিকে সবেমাত্র খবর এসেছে যে, আলী তগীন খানের মৃত্যু হয়েছে এবং দু'টি শিশু সালতানাতের শাসনক্ষমতা লাভ করেছে। আলী তগীন ছিলেন একজন জ্ঞানী লোক। তিনি সালজুক ও তুর্কমানদেরকে সামলে রেখেছিলেন। এখন ঐ শিশুদের সাথে তার বনিবনা হবে না। বাধ্য হয়েই তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়বেন। খাওয়ারিজমে দীর্ঘ সময় অবস্থান তার পক্ষে সম্ভব হবে না। কেননা, আমাদের প্রচেষ্টার ফলে হারুন অচিরেই মারা যাবে এবং সালজুকদের ঘোরতর দুশমন শাহ মালেক খাওয়ারিজম দখল করে নেবে। এভাবে যখন তার আশ্রয়ের কোনো জায়গা থাকবে না, আমার আশংকা তখন সে প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে খোরাসানের দিকে অগ্রসর হবে এখানে সরাসরি খোদায়ী হস্তক্ষেপ না হলে একেবারে গুছিয়ে ফেলা কাজ মাঠে মারা যাবে। সুতরাং উপযুক্ত ব্যবস্থা হলো মার্ভের দিকে অগ্রসর হওয়া।”

এটা ছিল সর্বোত্তম পরামর্শ। কিন্তু মাসউদ তা গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন ঃ দেহিস্তান যাওয়া ছাড়া উত্তম কোনো উপায় আমি দেখছি না। উযীরে আযম যখন দেখলেন, তিনি এই বোকামি করতে বদ্ধপরিকর। তখন তিনি তাঁকে সেখানে যাওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য শেষ যে প্রচেষ্টা চালালেন তা হচ্ছে, তাঁকে একটি দীর্ঘ পত্র লিখলেন। ঐ পত্রে তিনি তাঁর এ সফরের রাজনৈতিক ফলাফল সুস্পষ্ট করে তুলে ধরলেন। তিনি একথাও লিখলেন যে ঃ

“আমাদের মত দাসদের এতটুকু মর্যাদা নেই যে, প্রভুদের বলতে পারি, অমুক কাজ করা হোক। অবশ্য নিয়ম হলো, যে দাস আমার মত এরূপ নির্ভরযোগ্য হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে তার উচিত উপদেশমূলক কথা থেকে বিরত না হওয়া। গতকাল যখন দেহিস্তান যাওয়ার সবদিক সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে এবং অনিবার্যরূপে সেখানে যাওয়াই আপনার মহত সিদ্ধান্ত হিসেবে স্থিরিকৃত হয়েছে, তখন সমস্ত সেনাপতিরা আপনার দরবারে আরয করেছিলো যে, আমরা হুকুমের দাস। যে নির্দেশ দেয়া হবে তা পালন করাই আমাদের কাজ। কিন্তু বাইরে এসে তারা গোপনে আমাকে বলেছে যে, এ সফর ঠিক নয় .... খোদা না করুন, যদি কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তাহলে এমন যেন না হয় যে, আপনি বলে বসেন আমার দাসদের কেউ-ই আমার এই সিদ্ধান্তের ত্রুটি আমাকে দেখিয়ে দেয়নি। এখন আপনার নির্দেশের অপেক্ষা। যে নির্দেশেই দান করবেন দাসদের জন্য তা পালন করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই।”

www.bjilibrary.com

মাসউদের ওপর এই পত্রেরও কোনো প্রভাব পড়লো না। তিনি বললেন ঃ খাজা যা বলছে তা সফরের জন্য মোটেই প্রতিবন্ধক হওয়ার নয়। খোরাসান ও তার পথঘাট সৈন্য-সামন্তে ভরা। ইরাকী তুর্কমানরা পালিয়ে গিয়েছে। তাদেরকে বালখান পাহাড় পর্যন্ত তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। একটি সেনাদল তাদের পিছু ধাওয়া করছে। তাছাড়া দেহিস্তান ও গুরগানের মধ্যে দূরত্বই বা কত ? প্রয়োজনে এক সপ্তাহের মধ্যেই ফিরে আসা যেতে পারে। এরপর সালতানাতের সভাসদ ও কর্মচারীরা আর কি বলতে পারতো ? তারা নিরুপায় হয়ে থেমে গেল এবং ৪২৬ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মাসউদ এই ধ্বংসাত্মক সফরে রওয়ানা হলেন।[১]

সালজুকদের খোরাসানে আগমন

একদিকে গজনবী সালতানাতের শাসনকর্তা আমুল ও সারী এবং তাবারিস্তান ও দেহিস্তানের হাওয়া খেতে ব্যস্ত হলেন এবং অন্যদিকে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় দেখা দিল। ৪২৬ হিজরীর জমাদিউল উলা মাসে খাওয়ারিজমের বাদশাহ হারুন ইবনে আলতুনতাশ মারা যান। ইসমাঈল ইবনে আলতুনতাশ তার স্থলে শাসনকর্তা হলে তুগরিল ও তার ভাইদের সাথে বনিবনা হলো না। অন্যদিকে আলী তগীন খানের মৃত্যু তার জন্য বুখারার দরজাও বন্ধ করে দিল। এখন তার জন্য খাওয়ারিজমে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। কারণ, শাহ মালেকের পক্ষ থেকে সবসময়ই আশংকা ছিল। তাই অনন্যোপায় হয়ে তিনি খোরাসানের দিকে যাত্রা করলেন। এখানে তাকে বাধা দেয়ার মত কোনো শক্তি ছিল না। ৪২৬ হিজরীর রযব মাসে তিনি দশ হাজার সালজুকী ও নিয়ালী তুর্কমানদের নিয়ে আমুদরিয়া পার হয়ে ওয়াহ গুমবুদান প্রান্তর অতিক্রম করে মার্ভে উপনীত হলেন এবং সেখান থেকে নাসার দিকে অগ্রসর হলেন। এখানে পৌঁছে তিনি খোরাসানের গজনবী গভর্নরকে একটি পত্র পাঠালেন যাতে লিখলেন ঃ

> "হযরত শায়খ আর রাইসুল জলীল আস সাইয়েদ মাওলানা আবুল ফযল সূরী আল মু'য়েযের খেদমতে আমীরুল মু'মিনীনের দাস বেগু, তুগরুল ও দাউদের পক্ষ থেকে আমাদের মত দাসদের পক্ষে মধ্য এশিয়ার ও বুখারায় অবস্থান সম্ভব ছিল না। আলী তগীনের জীবদ্দশা পর্যন্ত আমাদের ও তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব, সদাচরণ ও মেলামেশার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এখন তিনি

---

১. বায়হাকী ৫৫০-৫৫৫ পৃষ্ঠা। যায়নুল আখবারের লেখক এই সফরকে ৪২৫ হিজরী সনের ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ বর্ণনা ভ্রান্ত বলে মনে হয়। এ ব্যাপারে বায়হাকীর বর্ণনা সর্বাধিক বিশুদ্ধ। কারণ, তিনি সে যুগে বর্তমান ছিলেন, বাদশাহর সাথে যোগাযোগের মাধ্যম, দিওয়ানে রিসালত বিভাগে কর্মরত এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যাপারে সরাসরি ওয়াকিফ ছিলেন।

www.bjilibrary.com

মৃত্যুবরণ করেছেন। সমস্ত ক্ষমতা দু'টি নাবালক অনভিজ্ঞ শিশুর হাতে। আলী তগীনের সেনাধ্যক্ষ তুনিশ তাদের ওপর প্রভাব খাটিয়ে তাদের সেনাবাহিনী ও বাদশাহীর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। তাদের সাথে আমাদের খোলাখুলি শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। এ কারণে আমাদের পক্ষে সেখানে থাকা সম্ভব নয়। এদিকে হারূনের মৃত্যুতে খাওয়ারিজমে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে যার কারণে সেখানে যাওয়াও সম্ভব ছিল না। এখন আমরা মহান প্রভু, মহাসম্মানিত সুলতান, অজস্র নিয়ামতের অধিকারীর আশ্রয় গ্রহণ করেছি, যাতে খাজা আমাদের সাহায্য করেন এবং খাজা আবদুস সামাদকে লিখে তাকে আমাদের সুপারিশকারী বানান। তাঁর সাথে আমাদের জানাশোনা আছে। প্রত্যেক শীত মওসুমে খাওয়ারিজম শাহ আলতুনতাশ রাহেমাহুল্লাহ আমাদেরকে, আমাদের কওমকে এবং আমাদের চতুষ্পদ জন্তুসমূহকে বসন্তকাল পর্যন্ত তাঁর রাজত্বে স্থান দিতেন। সেই সময় খাজা বুযর্গ (অর্থাৎ আবদুস সামাদ) আমাদেরকে সাহায্য করতেন। তাই তার সুপারিশের কারণে যদি আপনার মহত সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে আমাদেরকে আপনার দাসত্বে বরণ করবেন। তা হবে এভাবে যে, আমাদের এক ব্যক্তি মহান দরবারে খেদমতে নিয়োজিত থাকবে এবং অন্যরা আপনার প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। তাছাড়া আমরা তার মহান ছায়ায় শান্তি ও স্বস্তিত্বে অবস্থান করতে থাকবো এবং প্রান্তরের সীমান্তে অবস্থিত নাসা ও ফায়াওয়াহ স্থায়ীভাবে আমাদেরকে দান করা হোক যাতে নিঃশঙ্কচিত্তে আমরা সেখানে আমাদের সাজ-সরঞ্জাম রাখতে পারি। বালখানকোহ, দেহিস্তান, খাওয়ারিজম সীমান্ত ও আমুদরিয়ার তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ থেকে কোনো বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে মাথা তুলতে না দেই এবং ইরাকী ও খাওয়ারিজম তুর্কমানদের বিতাড়িত করতে পারি। আল্লাহ না করুন, মহান বাদশাহ যদি আমাদের আবেদন গ্রহণ না করেন, তাহলে জানি না আমাদের পরিণতি কি হবে। কারণ, ভূ-পৃষ্ঠের ওপর আমাদের জন্য আর কোনো জায়গা নেই।

জনাবের মহান দরবারের প্রতিপত্তি অনেক বেশী। তাঁর মহান দরবারকে কিছু লেখার দুঃসাহস আমাদের মধ্যে নেই। অতএব খাজাকে লিখছি যাতে মনিবের নিকট থেকে ইনশাআল্লাহ এ কাজ সমাধা করতে পারে।"[১]

গযনবীদের অস্বস্তি

আবুল ফযল সূরী এ পত্র পাওয়া মাত্র কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দু'জন আরোহীকে ডেকে নিজের বিস্তারিত বক্তব্যসহ পত্রখানা, মাসউদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং তাদেরকে পথিমধ্যে রাতদিন কোথাও

১. বায়হাকী ৫৮৩ পৃষ্ঠা ; ইবনে আসীর, ১৯৮ পৃষ্ঠা, এবং ইবনুর রাওয়ান্দী, ৯৪-পৃষ্ঠা -ও এ পত্রের উল্লেখ করেছেন। তবে শুধু পত্রের বিষয়বস্তুর প্রতি ইংগিত দিয়ে শেষ করেছেন।

www.bjilibrary.com

বিশ্রাম না করতে নির্দেশ দিলেন। মাসউদ সেই সময় আমল ও তাবারিস্তান থেকে ফিরে এসে গুরগানে অবস্থান করছিলেন। দূতেরা আড়াই দিনে নিশাপুর থেকে গুরগান উপনীত হয় এবং দিওয়ানে রিসালাতের প্রধান কর্মকর্তা আবু নসরের পত্র হস্তান্তর করে। আবু নসর পত্র পাঠমাত্র লাফিয়ে উঠলেন এবং সোজা সুলতানের দরবারের দিকে রওয়ানা হলেন। কিন্তু জানতে পারলেন যে, বাদশাহ সারারাত শরাব পান করে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমাচ্ছেন। বায়হাকী সাথেই ছিলেন। আবু নসর তাকে বললেন ঃ খোরাসান হাতছাড়া হয়ে গেল। খাজা বুযর্গ (উযীরে আযম)-কে গিয়ে খবর দাও। বায়হাকী বলেন ঃ যে সময় আমি খাজার কাছে গিয়ে হাজির হলাম তখন তিনি আমাকে অস্থির ও অশান্ত দেখেই বললেন ঃ মনে হচ্ছে সালজুকরা খোরাসানে প্রবেশ করেছে। আমি সবকিছু বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ এটা হচ্ছে আমলে আগমনের ও ইরাকীদের পরামর্শ অনুসারে কাজ করার পরিণাম। ইতিমধ্যে আবু নসরও এসে পৌছলেন। উযীরে আযম তাকে বললেন ঃ

> "খাজা, ভেবে দেখার বিষয় যে, এতদিন মেষপালকদের মোকাবিলা করতে হয়েছে এবং সেটাই এমন মাথা ব্যথার কারণ ছিল যে, এখনো তার জের চলছে। আর এখন তো রীতিমত রাজা-বাদশাহরা এসে হাজির। আমি এ মর্মে অনেক আবেদন-নিবেদন করেছি যে, এটা তাবারিস্তান ও গুরগানে আগমনের উপযুক্ত সময় নয়। কিন্তু বাদশাহ তাতে কর্ণপাতই করলেন না। ইরাকীদের মত জঘন্য লোকেরা—যারা ডান-বাম পর্যন্ত চেনে না—মিথ্যা আশ্বাস দিল। তাতে কোনো কাজই হলো না। কারণ, তা ছিল অসম্ভব ও মিথ্যা। গুরগান ও তাবারিস্তানের মত শান্ত রাজ্যও অশান্ত হয়ে উঠলো। অনুগত লোকেরাও বিগড়ে গেল। আবু কালিজারও সংশোধিত হলো না এবং খোরাসানেও এতবড় বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। আল্লাহ তার কাজের পরিণতি মঙ্গলময় করুন। এতকিছু হয়ে যাওয়ার পরও এসব লোক সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেবে না, বরং সালজুকদের ক্ষেপিয়ে তুলবে। সেই সময় কি অবস্থা দাঁড়ায় তা দেখতে হবে।"[১]

পরামর্শ সভা

এরপর বাদশাহকে ঘুম থেকে জাগিয়ে পত্র দু'খানা পাঠ করে শুনানো হলো। শোনামাত্র তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, ইরাকীদের ভর্ৎসনা করলেন এবং নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হলেন। আমীর-উমরা, মন্ত্রীবর্গ ও সেনাধ্যক্ষদের ডেকে গোপন সভা করলেন। সবাইকে উদ্দেশ করে বললেন ঃ

১. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৫৮১, ৫৮২, ইরাকী অর্থাৎ আবুল হাসান ইরাকী যিনি মাসউদকে আমল ও তাবারিস্তান যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

www.bjilibrary.com

"দশ হাজার তুর্কী অশ্বারোহী বহুসংখ্যক সর্দারের সাথে এসে আমাদের রাষ্ট্রের মধ্যে বসে বলবে যে, আমাদের জন্য কোনো আশ্রয়স্থল নেই, এটা কোন মামুলি বিষয় নয়। আমরা নিজেদের ভূখণ্ডে এদেরকে অবস্থান করতে এবং প্রভাব বিস্তার করতে কখনো দেব না। ভেবে দেখুন, আমার পিতা যেসব তুর্কমানদের এনেছিলেন, নদী পথ দিয়ে অতিক্রম করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং খুরাসানে আশ্রয়স্থল দিয়েছিলেন, তারা ছিল উটের রাখাল মাত্র—তারাই কত বিপদ ও মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাই খাজার বক্তব্য অনুসারে যারা রাজ্য লাভে আকাংখী তাদেরকে সামনে উঠার অবকাশ দেয়া উচিত হবে না। এখান থেকে আমাদের নিজেদেরই তৎপর হওয়া উচিত।"[১]

উযীরে আজম এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারেও দ্বিমত পোষণ করলেন। তিনি বললেন ঃ গুরগান থেকে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে খুরাসান গমনের ফলে সেনাবাহিনী ও সব জন্তু দুর্বল হয়ে পড়বে এবং এ পরিস্থিতিতেই যদি তাদেরকে তাজা দম শত্রুর সাথে যুদ্ধে লাগিয়ে দেয়া যায়, তাহলে সম্ভবত সেটি হবে বোকামি। এখনো পর্যন্ত তুর্কমানরা চুপচাপ বসে আছে। তারা কোনো বিপর্যয় বা হাংগামা সৃষ্টি করেনি এবং নিজেরা স্বেচ্ছায় সুরীকে পত্র পাঠিয়ে আনুগত্যের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তাই যুক্তিসংগত ব্যাপার হচ্ছে, সুরীকে একথা লিখে পাঠানো যে, সে যেন তাদের নেতাদের ডেকে বলে দেয়, তোমরা ঘাবড়াবে না। তোমরা নিজের ঘরেই অবস্থান করছো এবং আমাদের আশ্রয়ে আছ। আমরা এখান থেকে রায় যেতে মনস্থ করেছি। সেখানে পৌছে তোমাদের ব্যাপারে উচিত ও যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এ পত্র তাদের কাছে পৌছতে যে সময় লাগবে সে সময়ের মধ্যে আপনি নির্বিঘ্নে আরামের সাথে নিশাপুর পৌছে যাবেন। সেনাবাহিনী বিশ্রাম নেবে এবং ইতিমধ্যে এই আগন্তুকদের অভিপ্রায়ও জানা যাবে। তখন প্রয়োজনে যথেষ্ট সৈন্য পাঠিয়ে তাদেরকে খুরাসন থেকে বহিষ্কার করা হবে।[২] উপস্থিত সবাই এ মতামত পসন্দ করলো এবং একথাগুলোই জবাব আকারে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

সালজুকদেরকে বহিষ্কারের ফন্দি

১১ই রযব মাসউদ গুরগান থেকে নিশাপুর পৌছলেন। এ সময়ে বাদার্দ ও নাসা থেকে খবর আসতে থাকে যে, সুরী কর্তৃক প্রেরিত জবাব সালজুকদেরকে কিছুটা আশ্বস্ত করেছে। এখনো পর্যন্ত তাদের আচরণ ও গতিবিধি শান্তিপূর্ণ

১. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৫৮৫।
২. বায়হাকী, ৫৮৬-৫৮৭।

www.bjilibrary.com

রয়েছে, কাউকে উত্যক্ত করছে না।[১] তবে সুলতানের নিশাপুর আগমনের কারণে ভীত হয়ে পড়েছে এবং সর্বদা ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে থাকছে। অর্থাৎ বর্তমানে তাদের অবস্থা যেন যুদ্ধ ও শান্তির মধ্যবর্তী অবস্থা।[২] এ খবর ছিল কিছুটা স্বস্তিদায়ক। কিন্তু রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে দশ হাজার তুর্কীর উপস্থিতি কোনো দিক দিয়েই আশংকাহীন অবস্থা ছিল না। তাই, হয় তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়া, নয়তো অনুগত বানিয়ে সরকারী কাজে নিয়োজিত করা এ দু'টির যে কোনো একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছিল জরুরী। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে মন্ত্রীবর্গ ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাদের সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হয়। রাজনীতি বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, যে জাতি আপনা থেকেই আনুগত্য করতে আগ্রহী তাদেরকে উত্যক্ত করা ঠিক নয়। মনোরঞ্জনের মাধ্যমে তাদেরকে অনুগত করে নেয়াই যুক্তিসংগত। কিন্তু সামরিক গোষ্ঠী যুদ্ধ করতে আগ্রহী ছিল। তাদের পক্ষ থেকে সেনাপতি হাজেব বেগতাগদী দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলেন এবং উত্তেজিত হয়ে বললেন ঃ

> "সে কথা কি মনে আছে যখন পূর্বতন আমীর তার নিজের সিদ্ধান্ত অনুসারে তুর্কীদের একটি গোষ্ঠীকে খুরাসানে নিয়ে আসায় তারা কি ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিলো এবং এখনো পর্যন্ত করে যাচ্ছে। তাদের আগমনের ফলে অন্যদের মধ্যে এখানে আসার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। শত্রু কখনো বন্ধু হয় না। তাদের জন্য দরকার তরবারি। আরসালান জাযেবও একথাই বলেছিলেন, কিন্তু তার কথায় কর্ণপাত করা হয়নি। ফলে যা হওয়ার ছিল তাই হয়েছে।"

সালতানাতের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাও এ চিন্তাধারা সমর্থন করলেন এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, দশজন বড় বড় সেনাধ্যক্ষকে পনের হাজার সৈন্যের সাথে প্রেরণ করা হোক যাদের নেতা হিসেবে হাজেব বেগতাগ্দী ও কাদাখদায়ীর তত্ত্বাবধানের জন্য খাজা হুসাইন আলী মিকাঈলকে আদিষ্ট করা হোক। বেগতাগ্দী বললেন যে, একটি সেনাবাহিনীতে একাধিক সেনাধ্যক্ষ থাকলে মতানৈক্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশংকা থাকে। সেনাধ্যক্ষ মাত্র একজন থাকা উচিত। কিন্তু মাসউদ তা মেনে নিলেন না এবং নিজের মতানুসারেই সেনাবাহিনী গঠন করলেন।[৩]

---

১. যায়নুল আখবার (পৃষ্ঠা-১০০)-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুলতান নিশাপুর উপনীত হলে তুর্কমানদের যুলুম-নির্যাতনের মারাত্মক অভিযোগ শুনতে পেলেন। কিন্তু বায়হাকীর বর্ণনা এর থেকে কিছুটা ভিন্ন এবং আমি সেটাকেই নির্ভরযোগ্য মনে করেছি।

২. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৫৯১।

১. বায়হাকী, পৃষ্ঠা, ৫৯৬-৫৯৮।

www.bjilibrary.com

যুদ্ধ এবং গজনবীদের পরাজয়

৪২৬ হিজরীর ৯ই শা'বান (১০৩৪ খৃঃ) এই সেনাবাহিনী বিপুল সাজ-সরঞ্জামসহ নিশাপুর থেকে যাত্রা করে। প্রচুর নগদ অর্থ ও বিলাসদ্রব্য সাথে দেয়া হলো, যাতে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শনকারীদের উৎসাহিত করা যায়।[১] সিপান্দানেকানে সালজুকদের পক্ষ থেকে দূত এসে বেগতাগ্‌দীর কাছে হাজির হয়ে বললো ঃ আমরা দাস এবং অনুগত। কিন্তু বেগতাগ্‌দী তার সাথে কঠোর আচরণ করে বললেন ঃ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কেবল তরবারি আছে। তোমরা যদি অনুগতই হয়ে থাকো, তাহলে শাহ মাসউদের কাছে গিয়ে ওজর পেশ করো এবং সেখান থেকে ফরমান নিয়ে আমাদের কাছে আস, তাহলে আমরা তোমাদেরকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকবো। তা না হলে আমরা কখনো ফিরে যাবো না।[২] অবশেষে দূত নিরাশ হয়ে ফিরে গেল এবং গজনীর সেনাবাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হলো। ফারাওয়া ও শাহরিস্তানের মধ্যবর্তী এক প্রান্তরে উভয় বাহিনীর মোকাবেলা হয়।

২১শে শা'বান যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে এ মর্মে খবর পৌছলো যে, প্রথম আক্রমণেই সালজুকদের শোচনীয় পরাজয় হয়েছে। তাদের সাত শত লোক নিহত হয়েছে। বহুসংখ্যক বন্দী হয়েছে এবং অর্থ ও সাজ-সরঞ্জাম লুণ্ঠিত হয়েছে। এ খবর শুনে মাসউদ অত্যন্ত খুশী হন। ক'দিন ধরে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকার কারণে শরাব পান করতে পারেননি। অবিলম্বে শরাবের আসর বসানো হলো এবং পেয়ালার পর পেয়ালা চললো। পরের দিন প্রত্যুষে আরেকজন দূত এসে খবর দিল যে, সেনাবাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছে, সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম শত্রু কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়েছে। সেনাধ্যক্ষ কোনো প্রকারে প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছে এবং খাজা হুসাইন আলী মিকাঈল বন্দী হয়েছে। এ খবরে মন্ত্রীদের মধ্যে হৈচৈ পড়ে গেল। সবাই ঘাবড়িয়ে সুলতানের দরবারে ছুটে গেল। কিন্তু জানা গেল যে, রাতভর শরাব পান করে এখন অঘোরে ঘুমাচ্ছেন এবং কোনোক্রমেই জাগানো সম্ভব নয়।

এ পরাজয়ের বর্ণনা ঐ সেনাবাহিনীর দু'জন সৈনিকের নিজের জবানীতে শোনা উচিত। তারা বলেন ঃ এ বিপর্যয়ের কারণ হলো সেনাধ্যক্ষ ছিলেন একাধিক। তারা প্রত্যেকেই নিজের মতকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। গোটা সেনাবাহিনী অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হচ্ছিলো। অকস্মাত সালজুকদের সেনা ছাউনি ও তাঁবু দৃষ্টিগোচর হলো। দেখা গেল একটি ক্ষুদ্র দল তা রক্ষায় নিয়োজিত রয়েছে। প্রধান সেনাপতি (বেগতাগ্‌দী) বললেন ঃ সতর্ক থাকো,

---

১. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৫৯৯।

২. যায়নুল আখবার, পৃষ্ঠা-১০১।

www.bjilibrary.com

শত্রু গোপন স্থানে আত্মগোপন করেছে। ব্যূহ যেন ভঙ্গ না হয়। আমাদের গুপ্তচর গিয়ে প্রকৃত অবস্থা ভালভাবে অবহিত হয়ে না আসা পর্যন্ত প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থানে অবিচল থাকবে। কিন্তু কেউ-ই এ নির্দেশ মানলো না, সবাই তাদের মালামাল লুণ্ঠনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং সেখানে যাকেই পেল হত্যা করলো। সালজুকরা যখন শত্রু সেনাদেরকে এভাবে বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খল দেখতে পেল তখন অকস্মাত আক্রমণ করে বসলো। এভাবে প্রচণ্ড যদ্ধ শুরু হলো। এ পরিস্থিতিতে কতিপয় অনভিজ্ঞ অফিসার সেনাবাহিনীর একটি অংশ নিয়ে পানি আনতে গেলে অবশিষ্ট সৈনিকরা তা দেখে মনে করলো যে, তারা পলায়ন করছে। ফল দাঁড়ালো এই যে, কেউ-ই আর টিকে থাকতে পারলো না এবং এতবড় একটা সেনাবাহিনীর পরিণাম হলো তাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।[১]

হতভাগা সুলতান মদের নেশাজাত ঘুমের ঘোর থেকে জাগ্রত হয়ে এ খবর শুনলেন। এতে তার সকল আনন্দ কর্পূরের মত উবে গেল। আমীর-উমরা, সভাসদবর্গ ও মোসাহেবরা সমবেত হয়ে সান্ত্বনাবাক্য বলে প্রবোধ দিতে থাকলো। কিন্তু তাদের মধ্যে আবু নসর নামে এক বৃদ্ধ মন্ত্রীও ছিলেন। তার মন ছিল অত্যন্ত বিতৃষ্ণ। তিনি হাত জোড় করে নিবেদন করলেন ঃ

> "বাদশাহ দীর্ঘজীবী হোন। কয়েক দিনের জন্য আরাম-আয়েশ ও বিলাসী জীবন ত্যাগ করুন, নিজে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধান করুন এবং এসব আপাত মন ভুলানো কথা বন্ধ করুন যা সেনাবাহিনীর নেতারা তাদের ধারণায় সালতানাতের খেদমত মনে করছে। সেনাবাহিনীর মন জয় করুন এবং লোকদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। প্রাক্তন আমীরের ধন-সম্পদ অত্যন্ত যোগ্য লোকদের নির্বাচন করেছে। তাদের তত্ত্বাবধান না হলে খোদা না করুন অন্যরা আসবে, ধন-সম্পদ নিয়ে যাবে এবং চারদিক থেকে বিপদ দেখা দেবে।"[২]

এই প্রথমবারের মত গজনবী শক্তি সালজুকদের কাছে পরাজিত হলো।

অস্থায়ী সন্ধি

অতপর সালজুক ও গজনবীদের মধ্যে সন্ধি হয়। এ সন্ধির ঘটনাবলী সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইবনে আসীর বলেন ঃ পরাজয়ের পর মাসউদ সালজুকদের কাছে একটি পত্র লেখেন। এ পত্রে তিনি তাদেরকে অবাধ্যতার মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক এবং আনুগত্যের সুফল লাভের লোভ

১. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৫৯৯-৬০২। ইবনে আসীর, আবুল ফিদা, মীর খান্দ, ইবনুর রাওয়ান্দী প্রমুখ সংক্ষেপে এ যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বায়হাকী সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

২. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৬০৩, ৬০৪।

www.bjilibrary.com

দেখালেন। কিন্তু তুগরিল তার জবাবে নামাযের ইমামকে শুধু নিচের আয়াতটি লিখে দিতে বললেন ঃ[১]

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

"বলো, হে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ, তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান কর এবং যার থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী বানিয়ে দাও, আর যাকে ইচ্ছা হীন কর। তোমারই হাতে সকল কল্যাণ। তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।"–(আলে ইমরান ঃ ২৬)

এ পত্র প্রাপ্তির পর মাসউদ তাকে খিলাত পাঠালেন। দাউদকে দেহিস্তান, তুগরিলকে নাসা এবং বেগুকে ফারাদা এলাকা দান করলেন, প্রত্যেককে দেহকান (অর্থাৎ জমিদার বা তালুকদার) উপাধিতে ভূষিত করলেন এবং অসৎ কাজ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করলেন।[২] কিন্তু এ কাহিনী পরবর্তীকালের রচিত বলে অনুমিত হয়। আমার মতে, বায়হাকী যা বর্ণনা করেছেন সেটিই প্রকৃত ঘটনা। তিনি বলেছেন ঃ যুদ্ধের পরে সালজুক নেতৃবর্গ একত্রে বসে এ মর্মে সলাপরামর্শ করলেন যে, আমাদের এ বিজয়ের কারণ শুধু তাদের অব্যবস্থা ও আমাদের সুব্যবস্থা। তাই নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে আমাদের ভুল ধারণা না করা উচিত। কারণ, মাসউদ একজন বড় বাদশাহ এবং তাঁর অমুক অমুক বিশাল বাহিনী ও সেনাপতি আছে। এসব বিষয় বিচার-বিবেচনার পর বুখারার অধিবাসী বাকপটু এক বৃদ্ধকে নিজের দূত হিসেবে নিশাপুর প্রেরণ করলেন এবং তার মাধ্যমে উজীরে আযমের একখানা পত্র পাঠালেন। পত্রে বিনম্র ও বিনীতভাবে লিখলেন ঃ

"আমরা সূরীকে মধ্যস্থতা, সুপারিশ ও সাহায্যকারী বানিয়ে ভুল করেছি। সে অস্থিরচিত্ত লোক। কল্যাণকর বিষয় ও পরিণামকে সে ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি এবং সুলতান অযথা সৈন্য প্রেরণে উদ্বুদ্ধ করেছে। আপনার বাহিনীর বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করবো সে ক্ষমতা আমাদের কোথায় ? কিন্তু যখন তারা এমনভাবে আমাদের ওপর আক্রমণ করে বসলো যেমন বকরীর পালে নেকড়ের আক্রমণ হয় এবং শরণার্থীদের ঘরবাড়ী, নারী ও শিশুদের ওপর আক্রমণ করলো তখন আত্মরক্ষা ছাড়া আর কি উপায় ছিল। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তির কাছেই তার নিজের প্রাণ প্রিয়

১. ইবনুর রাওয়ান্দী বলেন ঃ তুগরিল বাগদাদের খলীফাকে এ জবাব পাঠিয়ে ছিলেন।–(রাহাতুস সুদুর-৬৫)

২. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯৮-১৯৯।

www.bjilibrary.com

আমরা পূর্বে যে কথা বলেছিলাম এখনো তার ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি। এই সামান্য যা আঘাত লেগেছে তা অনিচ্ছাকৃত। আপনি মহান আলতুনতাশের সময়ও আমাদেরকে দেখেছেন। প্রয়োজন মনে করলে বিষয়টি নিয়ে একটু মাথা ঘামাবেন এবং আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে সুলতানের মনতুষ্টির ব্যবস্থা করবেন। যাতে আমাদের ওজর গ্রহণযোগ্য হয় এবং আমাদের এই দূতকে এমন জবাব দিয়ে ফেরত পাঠান, যেন আমাদের মনে স্বস্তি ফিরে আসে, আর এ ঘটনাপ্রবাহও দীর্ঘায়িত না হয়। আপনি নিজে আপনার পক্ষ থেকে তার সাথে কোনো লোক প্রেরণ করেন তবে তা হবে সর্বোত্তম। প্রেরিত ব্যক্তি আমাদের বক্তব্য শুনতে পারবে এবং উপলব্ধি করতে পারবে যে, আমরা কল্যাণ ছাড়া আর কিছু চাই না।"[১]

এ বার্তা বেশ কিছুটা স্বস্তির সাথে গ্রহণ করা হলো। দূতকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করা হলো। রাজ দরবারে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনার পর স্থির হলো যে, আবু নসরকে[২] তাদের কাছে পাঠাতে হবে যাতে সে নিজ চোখে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পারে যে, তারা প্রকৃতই আন্তরিকতার সাথে আনুগত্য করতে প্রস্তুত না এটা তাদের চালবাজি। এ সিদ্ধান্ত অনুসারে উজীরে আজম সালজুক দূতকে ডেকে জানালেন যে, অনেক কষ্টে সুলতানের ক্রোধ প্রশমিত করা গেছে এবং তিনি তোমাদের বক্তব্য গ্রহণ করে তার দরবারের একজন নির্ভরযোগ্য দূতকে নিয়োগ করেছেন। এখন তার সাথে আলাপ-আলোচনা করে সবকিছু ঠিক করে নাও।

৪২৬ হিজরীর ২রা রমযান এই কূটনৈতিক মিশন নিশাপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় এবং ২০শে শাওয়াল প্রত্যাবর্তন করে। মিশনের সাথে বেগু, তুগরীল ও দাউদের পক্ষ থেকে তিনজন দূতও আগমন করে। দিওয়ানে রিসালতে তাদের সাথে একদিন একনাগাড়ে আলোচনা চলতে থাকে। অবশেষে এই শর্তে সন্ধি হয় যে, নাসা, ফারাওয়া ও দেহিস্তান অঞ্চল তাদেরকে দেয়া হবে। সুলতানের পক্ষ থেকে তাদেরকে খিলাত, ঘোষণাপত্র ও পতাকা প্রদান করা হবে। আবু নসর গিয়ে সুলতানের পক্ষ থেকে তাদের তিনজনের নিকট থেকে এ মর্মে শপথ গ্রহণ করবেন যে, তারা সুলতানের অনুগত থাকবে এবং সুলতান যখনই বলখ যাবেন, তখনই তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি খেদমতে হাজির থেকে সর্বদা সেবায় নিয়োজিত থাকবে। চুক্তিপত্র অনুসারে

---

১. বায়হাকী ৬০৭-৬০৮।

২. আবু নসর ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও চতুর। সুলতান মাহমুদ তার পিতার কাছে কুরআন শরীফ পড়েছিলেন। তিনি তুর্কীস্তানে মাহমুদের পক্ষে বড় বড় গোপন দায়িত্ব পালন করেছিলেন যা বায়হাকী উল্লেখ করেছেন।

www.bjilibrary.com

শাওয়ালের ২১ তারিখে দাউদের নামে দেহিস্তান, তুগরীলের নামে নাসা এবং বেগুর নামে ফারাওয়ার শাসনকর্তা হিসেবে ঘোষণাপত্র লিখে দেয়া হয়।[১] এ ঘোষণাপত্রে তাদের তিনজনকেই দেহকান বলে সম্বোধন করা হয়েছিলো। এর সাথে সাথে প্রত্যেককেই খিলাতও দেয়া হয়েছিলো যার মধ্যে ছিল গজনবী আদলে প্রস্তুত দ্বিচূড়া বিশিষ্ট টুপি, পতাকা ও জামা এবং তুর্কী ঘোড়া, জিন ও কোমরবন্দ। এ ছাড়াও প্রত্যেককেই স্বতন্ত্রভাবে ত্রিশ খান করে বস্ত্র দেয়া হয়েছিলো।[২]

গজনীর রাষ্ট্রদূত পরদিন শপথ গ্রহণের জন্য নাসার দিকে যাত্রা করেন।

সন্ধির প্রভাব

দেশে বিদ্যমান রাজনীতির ওপর এ চুক্তির এই প্রভাব আশেপাশের অঞ্চলের আমীর-উমরাদের সাহস বেড়ে যায় এবং তারা বুঝতে পারে যে, গজনবীদের সৌভাগ্য মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই বুগরা খান সালজুকদের উত্তেজিত করে তোলে।[৩] আলী তগীন খানের পুত্রগণ খুরাসানের ওপর আক্রমণ পরিচালনার প্রস্তুতি শুরু করে।[৪] ইসমাঈল ইবনে আলতুনতাশ খাওয়ারিজম সালজুক বাদশাহদের সাথে যোগসাজশ করতে থাকে।[৫] বিজয়-লাভের কারণে আগে থেকেই সালজুকদের মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে সালজুকদের ওপর এর প্রভাব পড়লো এই যে, তাদের মনোবল আরো বৃদ্ধি পেল। তাদের সাথে যখন এতো সহজ ও সুন্দর শর্তে সন্ধি করা হলো, তখন তারা গজনবীদের দুর্বলতা ও ভীতি সম্পর্কে অনুমান করে ফেললো এবং তারপর থেকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে শুরু করলো। শপথ গ্রহণের জন্য গজনবীদের যে দূত সেখানে গিয়েছিলেন তিনি স্বচক্ষে তাদের এই হাবভাব দেখে সংশয়বোধ করলেন এবং ফিরে এসে বললেন ঃ তারা শপথ গ্রহণ করেছে ঠিকই কিন্তু তাদের ওপর আমার আদৌ কোনো আস্থা নেই। আমি শুনেছি যে, তারা তাদের একান্ত বৈঠকে আমাদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করেছে এবং আমাদের রাজমুকুট পায়ে পরিধান করেছে। কোনো অবস্থাতেই সুলতানের হিরাত যাওয়ার সিদ্ধান্ত না নেয়া উচিত। যদি কোনো হাংগামা হয় সে জন্য আমি দায়ী থাকবো না।

---

১. বায়হাকী নিজে এই ঘোষণাপত্র লিখেছিলেন এবং সন্ধিচুক্তির সকল আলোচনায়ই তিনি উপস্থিত ছিলেন।

২. ৪২৩ হিজরীতে কদর খানের মৃত্যুর পর সালতানাত তার দুই পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলো। কাশগড়, খুতান ও বেনাসাগুন পড়ে আবু সুজা আরসালান খান নামে এক পুত্রের অংশে এবং তারাজ ও আসবিজাব অঞ্চল পড়ে বুগরা খান নামে অপর পুত্রের অংশে।

৪. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৬১১, ৬৫৭।

৪. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৬২১।

৫. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৬১২।

www.bjilibrary.com

এ পরিস্থিতিতে জ্ঞান ও বুদ্ধির দাবী ছিল, সুলতানের আরো কিছুদিন ফিতনার মোকাবিলা করা এবং পুনরায় সালতানাতের প্রভাব-প্রতিপত্তি কায়েম করা। কিন্তু আরাম-আয়েশ এবং শরাব ও শিকারের নেশা তাকে পেয়ে বসেছিল। তাই তিনি কোনো যুক্তি ও বুদ্ধি-বিবেচনার ধার ধারলেন না। সন্ধির পর এক মাস যেতে না যেতেই তিনি নিশাপুর থেকে যাত্রা করলেন। ৪২৭ হিজরীর মুহাররাম মাসে বলখে পৌঁছলেন এবং কিছুদিন অবস্থান করে গজনীতে চলে গেলেন।[১]

গোলযোগের পুনরাবৃত্তি

সালজুকরা কয়েক মাস পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত ও নিজেদের শক্তি সুসংহত করতে ধৈর্যধারণ করলো এবং নীরব প্রস্তুতিতে কাটিয়ে দিল। এ সময়ের মধ্যে তারা খুরাসানের আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আরসালানের পক্ষের অবশিষ্ট তুর্কমানদের নিজেদের দলে ভিড়িয়ে একটি বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করলো এবং তারপর বুস্ত, গুজগানান এবং সারাখস্ প্রভৃতি এলাকার ওপর আকস্মিক হামলা চালাতে থাকলো। ৪২৭ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে (মোতাবেক ১০৩৫ খৃঃ) সব জায়গা থেকে তাদের যুলুম ও বাড়াবাড়ির খবর আসতে থাকলে মাসউদ ও তার উমরাবর্গ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। অবশেষে পরামর্শ শেষে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, সম্মানিত দেহরক্ষী সুবাশী দশ হাজার অশ্বারোহী ও পাঁচ হাজার পদাতিক সৈন্য সাথে নিয়ে যাবেন এবং তাকে সহায়তার জন্য আবু সা'দ ইরাকী কুর্দি ও আরব সৈন্যদের প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। সুতরাং উক্ত মাসেই এ বিশাল সেনাবাহিনীকে সালজুক ও তুর্কমানদের উপদ্রব থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য এ নির্দেশ দিয়ে খুরাসানে প্রেরণ করা হলো।[২]

পরে আবুল হাসান ইরাকীর নেতৃত্বে শাওয়াল মাসে সুসজ্জিত আরো একটি বিশাল বাহিনী তার সাহায্যের জন্য গিয়ে পৌঁছলো।[৩] তবে বাহ্যত মনে হয় বছর ব্যাপী এ বাহিনী বিশেষ করে তৎপরতা চালাতে সক্ষম হয়নি। কারণ, সেই সময়ে তাদের কোনো কাজ বা পদক্ষেপের কোনো প্রভাব আমাদের চোখে পড়ে না।

আরো দাবী-দাওয়া

৪২৮ হিজরীর মুহাররাম মাসে মাসউদের বুস্তে অবস্থানকালে সালজুকদের পক্ষ থেকে দু'জন দূত হাজির হয় এবং তারা জানায় যে, খুরাসানে যে হট্টগোল

১. বায়হাকী-৬১২।
২. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৬১৮।
৩. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৬২২।

www.bjilibrary.com

ও বিশৃঙ্খলা হচ্ছে, তার দায়-দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তায় না। অন্যান্য তুর্কমানরাও এখানে আছে এবং বাইরে থেকে অবিরাম আসছে। কারণ, আমুদরিয়া বা আসাম অঞ্চল এবং বালখান কুহ এর রাস্তা উন্মুক্ত আছে। সাথে সাথে তারা এ আবেদনও জানালেন যে ঃ

"আমাদেরকে যে এলাকা দেয়া হয়েছে, তা সংকীর্ণ এবং আমাদের লোকজনের জন্য অপর্যাপ্ত। এখন প্রয়োজন খাজা বুযর্গ মধ্যস্থতা করে এ এলাকার চারদিকে সংলগ্ন যেসব ছোট শহর আছে যেমন মার্ভ, সারাখস, বাওয়ার্দ প্রভৃতি সুলতানের নিকট আবেদন জানিয়ে আমাদের নিয়ে দেয়া। অবশ্য এ ক্ষেত্রে দূত নিয়োগের কর্তৃত্ব, বিচার ক্ষমতা ও বিচার বিভাগ বাদশাহর কর্তৃত্বাধীনেই থাকবে। তিনিই রাজস্ব আদায় করবেন এবং তার বিশ ভাগের এক ভাগ রেখে অবশিষ্ট আমাদেরকে দিয়ে দিবেন। কারণ, আমরা তারই সেনাবাহিনীর অংশ, আমরা যেন খুরাসানকে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের থেকে মুক্ত রাখতে পারি। যদি ইরাক বা অন্য কোথাও আর কোনো খেদমত আঞ্জাম দিতে হয় তাও যেন দিতে পারি এবং প্রতিটি কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজ করতে প্রস্তুত থাকতে পারি।

তাছাড়া দেহরক্ষী সুবাশী এবং সেনাবাহিনীকে যেন নিশাপুর ও হিরাতে মোতায়েন করা হয়। তারা যদি আমাদের দিকে অগ্রসর হয়, তাহলে বাধ্য হয়ে আমাদেরকে তাদের প্রতিরোধ করতে হবে। ফলে উভয়ের মধ্যেকার সুসম্পর্ক বিনষ্ট হবে।"

এই পয়গাম পেয়ে সুলতান অত্যন্ত রুষ্ট হলেন। একান্তে মন্ত্রীবর্গকে বললেন ঃ এদের ধৃষ্টতার প্রতি লক্ষ্য করো। একদিকে তারা খুরাসানের ওপর আকস্মিক আক্রমণ চালাচ্ছে কিন্তু অন্যদিকে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছে। পরিষ্কার ভাষায় তাদেরকে জানিয়ে দেয়া দরকার যে, তরবারিই আমাদের ও তোমাদের মধ্যেকার ফায়সালাকারী। উযীরে আজম পুনরায় এ সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করলেন এবং পরামর্শ দিলেন যে, তাদেরকে আপোষমূলক জবাব দিয়ে এড়িয়ে যেতে হবে এবং সুলতানকে হিরাতে গিয়ে অবস্থান করতে হবে। এরপর যদি যুদ্ধের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে অতি সহজেই তার আয়োজন করা যাবে। সুলতান এ পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং সে মোতাবেক তার জবাবও দিয়ে দেয়া হলো।[১]

গজনবী আমীর-উমরাদের অবহেলা

কিন্তু মাসউদের চরিত্রের খারাপ দিক ছিল এই যে, যখনই সে কোনো বিশেষ ঘটনার মুখোমুখি হতো তখনই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠতো এবং

১. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৬২৬-৬২৮।

www.bjilibrary.com

সময়টি চলে গেলেই গাফলতির মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যেতো। বাদশাহর নিজের অবস্থাই যখন এই তখন আমীর-উমরাগণ আরো গাফিল হবেন, একথা তো সুস্পষ্ট। সালজুক দূতদের চলে যাওয়ার পর পরিস্থিতির বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তা করা উচিত ছিল। কিন্তু তিন চার মাস অবধি এ ক্ষেত্রে কিছুই করা হয়নি। রবিউল আউয়াল মাসে খবর আসলো যে, তুর্কমানরা খুরাসানের আশেপাশে ছড়িয়ে পড়েছে, তৃণ শহর লুণ্ঠিত হয়েছে, গজনবী সেনাপতি আবুল হাসান ইরাকী মদের নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে, অনভিজ্ঞ দাসদেরকে কুর্দী ও আরব সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পাঠায়। ফলে তারা পরাজিত হয়ে ফিরে আসে। শাসক ও হিরাতের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা তার কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযোগ করে আসছিলো।

এসব খবর পুনরায় মাসউদকে সতর্ক করে দেয়। কিন্তু তার প্রভাব এতটা পড়ে না যে, সুলতান নিজে অকুস্থলে উপস্থিত হতেন। বরং তিনি সেনাবাহিনী দিয়ে উজীরে আযমকে হিরাত প্রেরণ করলেন এবং নিজে ভ্রমণ ও শিকারে মগ্ন থাকলেন।[১] হিরাত পৌঁছার পর উজীর তাকে সেখানকার সমস্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করলেন। তাছাড়া তিনি একের পর এক এ মর্মে আবেদন জানালেন যে, ব্যাপক সামরিক তৎপরতার মাধ্যমে তুর্কমানদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেয়া হয়েছে। এখন যদি সুলতান নিজে খুরাসান এসে যুদ্ধ করেন, তাহলে গোটা দেশই তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে নেয়া যাবে। কিন্তু সুলতান হিরাতের পরিবর্তে গজনীর অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং সেখানে পৌঁছে উজীরকে ডেকে পাঠালেন।[২]

ভারতবর্ষ আক্রমণ ও তার ফলাফল

৪২৮ হিজরীর যুলহাজ্জ মাসে সুলতান তার মসলিসে শুরার সামনে এ ধারণা পেশ করেন যে, এ বছর বুস্তে অবস্থানকালে আমি যখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, তখন মানত করেছিলাম যে, আমি যদি সুস্থ হয়ে উঠি, তাহলে ভারতে অভিযান চালিয়ে হানসি দূর্গ অধিকার করে নেব। তাই আমি সেখানে অভিযান চালানোর দৃঢ় সংকল্প পোষণ করেছি। উযীরে আযম ও আবু নসর মুশকান তার এ সংকল্পের ঘোর বিরোধিতা করে বললেন যে, যদি কেবল হানসি দখলের প্রশ্ন হয়, তাহলে মাত্র একজন সেনাপতি গিয়ে এ কাজ সম্পন্ন করতে পারে। আর যদি সুলতান তার মানত পূরণ করতে চান, তাহলে প্রথমে খুরাসানের ঝামেলার সুরাহা করতে হবে। এরপর তিনি মানত পূরণ করবেন।

---

১. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৬৪৪, ৬৪৬।
২. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৬৪৯, ৬৫১।

www.bjilibrary.com

এরূপ বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র ছেড়ে ভারতে যাওয়া কখনো বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হতে পারে না। কিন্তু সুলতান কারো কথায়ই কর্ণপাত করলেন না। ৪২৯ হিজরীর মুহাররাম মাসে তিনি ভারতে এসে উপস্থিত হলেন।[১]

জমাদিউস সানী পর্যন্ত এ যুদ্ধ চলতে থাকে। এ চার মাস সময়ের এক একটি মুহূর্ত ছিল অতীব মূল্যবান। কিন্তু গজনবীরা তার সদ্ব্যবহার করতে না পারলেও সালজুকরা ঠিকই তা করতে সক্ষম হয়। ভারতের জিহাদ ও হানসি অধিকারের পর মাসউদ গজনীতে ফিরে শুনলেন যে, সালজুকরা তালিকান ও ফারিয়াব লুণ্ঠন করেছে, রায় ও জিবাল অধিকার করেছে, সেনাধ্যক্ষ তাশকারাশকে হত্যা করেছে, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে বন্দী করে নিয়ে গেছে এবং বর্তমানে মার্ভ অধিকার করে আছে। তিনি আরো শুনলেন যে, প্রধান সেনাপতি হাজেব সুবাশী যার তত্ত্বাবধানে খুরাসান দেয়া হয়েছিল সে নিশাপুরে শরাব পান করে। দাসীদের নিয়ে ভোগে মত্ত আছে। যেখানে এক দিরহামে ৭ মণ গম পাওয়া যায় সেখান থেকে হাজার হাজার উটের পিঠে গম বহন করে নিয়ে যেখানে এক দিরহাম মণ দরে গম বিক্রি হচ্ছে সেখানে সৈন্যদের কাছে তা বিক্রি করে। নিজের আরামপ্রিয়তা ও স্বার্থের খাতিরে সৈন্যদেরকে এদিক সেদিক প্রেরণ করে এবং যুদ্ধ এড়িয়ে চলে।[২] এখন মাসউদ বুঝতে পারলেন হানসি অধিকারের জন্য তাকে কত মূল্য দিতে হয়েছে। তিনি নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হলেন। কিন্তু অনুশোচনা দিয়ে নির্বুদ্ধিতার প্রতিকার সম্ভব ছিল না।

চূড়ান্ত যুদ্ধ

সুলতানের প্রত্যাবর্তনে হাজেব এবং তার পরাশর্মদাতার নিদ্রাভঙ্গ হলো এবং শাহী দরবার থেকে ফরমান ও পত্রাবলী জারী করার পর একটি চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। আবুল ফযল সূরী ও আবু সাহল হামদাবী নিশাপুরের ধন-ভাণ্ডার ও শাহী মহলের সমস্ত মাল এবং নিজের ব্যক্তিগত সহায়-সম্পদ একত্র করে মিদালী দুর্গে স্থানান্তরিত করলো এবং হাজেব সুবাশী সব স্থান থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে সারাখসের দিকে অগ্রসর হলেন। এদিকে সালজুকরাও তাদের সমস্ত অর্থ-সম্পদ মার্ভ প্রান্তরে পাঠিয়ে দিয়ে ঝুঁকিহীন ও পিছুটানহীন অবস্থায় মোকাবিলার অপেক্ষায় থাকে, যাতে প্রতিকূল কোনো অবস্থার মুখোমুখি হলে সোজা রায়ের দিকে পলায়ন করতে পারে। সারাখসের ময়দানে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। সালজুকদের কোনো পিছুটান ছিল না। কিন্তু গজনবীদের সাথে শুধু মাল-সম্পদই ছিল না, তারা নারী ও শিশুদেরকেও সাথে করে এনেছিলো। এই অসম যুদ্ধের স্বাভাবিক পরিণতি যা হওয়ার কথা ছিল

---

১. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৬৬০, ৬৬৪; ইবনুল আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯৯; যায়নুল আখবার, পৃষ্ঠা-১০৩।
২. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৬৬৬, ৬৬৭।

৬—

www.bjilibrary.com

তাই হলো। গজনবী সৈন্যরা পরাজিত হয়ে চরম বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন করে। প্রধান সেনাপতি আহত হয়ে শুধু বিশটি দাস সাথে নিয়ে হিরাতে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং সালজুকরা অঢেল গনীমাতের মাল লাভ করে।[১]

এ ঘটনা সংঘটিত হয় শা'বান মাসের শেষে। এ খবর পেয়ে মাসউদ অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। শুধু শরবত দ্বারা ইফতার করলেন এবং খাবার পর্যন্ত গ্রহণ করলেন না।[২] উযীরে আযম হিরাত থেকে পত্র পাঠিয়ে বললেন ঃ এটা তাবারিস্তান ও ভারতে সেনা অভিযানের ফল। এখন শত্রুর শক্তি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তার মোকাবিলা শুধু সেনাধ্যক্ষ ও আমীর-উমরাদের সাধ্যের বাইরে। বাদশাহ যদি খুরাসান রক্ষা করতে চান, তাহলে তাঁকে আরাম-আয়েশ ও আনন্দ-ফূর্তি থেকে বিরত হতে হবে এবং নিজে এসে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিতে হবে।[৩]

নিশাপুরে তুগরীলের সিংহাসন আরোহণ

সারাখস বিজয়ের পর ইবরাহীম ইনাল[৪] দুই শ' অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে নিশাপুর শহরের দ্বার প্রান্তে উপনীত হলেন[৫] এবং শহরবাসীকে জানিয়ে দেয় যে, যদি অনুগত হয়ে থাক তাহলে ফটক খুলে দাও। আর যদি যুদ্ধ করতে চাও, তাহলে প্রস্তুত থাক। একটি বিশাল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যার সাথে তুগরীল, দাউদ ও বেগু আগমন করছে। এ খবর শুনে গোটা সেনাবাহিনীর মধ্যে হৈচৈ ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়ে যায়। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ কাজী সায়েদ এর কাছে গিয়ে হাজির হয় এবং বলে, আপনি আমাদের নেতা, উপযুক্ত জবাব দিয়ে দিন। তিনি সবার কাছে মতামত জানতে চাইলে তারা বললো ঃ যে সেনাবাহিনী হাজেব সুবাশীর বাহিনীকে পরাস্ত করেছে তার বিরুদ্ধে এই অরক্ষিত ও নিরস্ত্র শহর কি করে টিকে থাকবে ? কাজী সাহেবও এর সাথে একমত হলেন এবং বললেন ঃ আমরা প্রজা, বাদশাহদের বিরুদ্ধে লড়াই করা আমাদের কাজ নয়। যারা অধিক শক্তিশালী হবে, আমরা তার আনুগত্য করবো এবং তাকেই রাজস্ব প্রদান করবো। অবশেষে ইবরাহীমের দূতকে মসলিসে ডেকে এনে বলা হলো ঃ আমরা আনুগত্য করতে প্রস্তুত। কিন্তু তোমরা যেভাবে অন্যসব শহর লুটপাট করেছো তার কারণে শহরবাসীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে।

---

১. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৬৭৫-৬৭৯; ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯০।

২. বায়হাকী পৃষ্ঠা-৬৭৯।

৩. বায়হাকী পৃষ্ঠা-৬৮৩।

৪. তুগরীলের বৈপিত্রেয় ভাই (রাহাতুস সুদুর, পৃষ্ঠা-১০৪; ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯১)।

৫. ইবনে আসীর লিখেছেন ঃ তুগরীল দাউদকে নিশাপুর পাঠিয়েছিলেন (৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯০)। বায়হাকী সরকারী তথ্য অনুযায়ী ইবরাহীমের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। স্পষ্টত এটাই সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য।

www.bjilibrary.com

উত্তম হয় তোমরা যদি এই বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করো। এ জবাবে ইবরাহীম ইনইয়াল শহরবাসীর প্রশংসা করলো এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিল যে, তাদের জান-মালের ওপর হস্তক্ষেপ করা হবে না।

৪২৯ হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে তুগরীল নিজে নিশাপুর পৌছলেন। শহরবাসীরা ব্যাপক পূর্ব প্রস্তুতির মাধ্যমে তাঁকে স্বাগত জানালো। তারা দেখলো যে, বিজয়ী আমীর লৌহ বর্ম পরিহিত তিন হাজার অশ্বারোহীর সাথে এমন জাঁকজমকের সাথে এগিয়ে আসছেন যে, তাঁর কোমরে তীরদান, স্কন্ধ-দেশে কামান, শরীরে বুক খোলা ঢিলা জামা, মাথায় শিরস্ত্রান, পায়ে কোমল পশমী মোজা এবং সবরকম অস্ত্রে সজ্জিত। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অগ্রসর হয়ে স্বাগত জানালো এবং এক সময় মাসউদ যেখানে অবস্থান করতো সেই শাদিয়াখ বাগানে নিয়ে অবস্থান করালো। দ্বিতীয় দিন তুগরীল মাসউদের সিংহাসনে বসলেন এবং আম দরবার অনুষ্ঠিত করলেন।[১] ইতিমধ্যে সালজুক সেনাবাহিনী গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়লো এবং বলখ ছাড়া খুরাসানের আশপাশের সমস্ত এলাকা তাদের দখলে চলে আসলো।[২]

এক নজরে উত্থান যুগ

এ পর্যায়ে এসে ইতিহাস থেকে সালজুকদের যাযাবর জীবনের অবসান এবং শাহী জীবনের উদ্ভব ঘটছে। সামনে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে আমাদেরকে আরো একবার সেই অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা দরকার, যা আমরা ইতিপূর্বে দেখে এসেছি। সে সময় আমরা দেখেছি যে, তুর্কিস্তান থেকে একটি ক্ষুদ্র যাযাবর কওমের আগমন ঘটেছে। অর্ধ শতাব্দী বা তার কিছু বেশী সময় ধরে তারা এ স্থান থেকে সে স্থানে যাযাবর জীবনযাপন করছে। কখনো মাহমুদ গজনবী তাদের মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছেন, কখনো আলী তগীন খাঁ তাদের শাস্তি দিচ্ছেন। কখনো মালেক শাহ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছেন এবং কখনো তারা বুখারাতে আশ্রয় গ্রহণ করছেন। কখনো তারা খাওয়ারিজম শাহের আজ্ঞাবহ হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত সবদিক থেকে আশ্রয় ও নিরাপত্তাহীন হয়ে খুরাসানে এসে হাজির হচ্ছে। ৬২৬ হিজরী পর্যন্ত তাদের জীবনের এই বৈশিষ্ট্যই বজায় থাকছে যেখানে বাদশাহী ও শাসন ক্ষমতার নামগন্ধ পর্যন্ত তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। বরং অসহায় ও নিরাশ্রয় হতেই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু খুরাসানে এসে হঠাৎ করেই তাদের ভাগ্যের দুয়ার খুলে যাচ্ছে। গজনবীদের বিশাল সাম্রাজ্য যা মাত্র পাঁচ বছর পূর্বে সুলতান মাহমুদ শান-শওকত এবং ক্ষমতা ও দাপটের তুঙ্গে রেখে মৃত্যুবরণ করেছিলেন সেই সাম্রাজ্যের সাথে তাদের মোকাবিলা

১. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯১।
২. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৬৮৭-৬৯১।

www.bjilibrary.com

হচ্ছে এবং মাত্র তিন বছরের মধ্যে এই জংলী মেষপালকরা মরুভূমির ধূলাবালি থেকে উঠে বাদশাহী সিংহাসনে পৌছে যাচ্ছে। ভাসা ভাসা দৃষ্টির লোকেরা হয়তো এই বিস্ময়কর বিপ্লবের কারণ হিসেবে ভাগ্যের ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবেন না। কিন্তু যদি গভীর দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহলে গোটা এই বিপ্লবের স্বাভাবিক কার্যকারণ সক্রিয় বলে দেখা যাবে।

প্রথম যে সময় সালজুকরা খুরাসানে আগমন করে সেই সময় তারা প্রকৃতই এক দুর্বল ও অসহায় জনগোষ্ঠী ছিল। তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, তারা সুলতান মাসউদ গজনবীর নিকট থেকে এই সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নিতে পারবে। তাদের নিজেদেরও জানা ছিল না, বিশ্বও জানতো না কিংবা গজনবীদেরও জানা ছিল না যে, গজনবী সাম্রাজ্যের বিশাল ও জমকালো প্রাসাদের ভিত অন্তসারশূন্য হয়ে গেছে। তার আকাশচুম্বী বিশাল ইমারত দেখে গোটা বিশ্ব ভীত-সন্ত্রস্ত এবং গজনবীরা নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু পরীক্ষার প্রথম পর্বেই সালজুক তুর্কমানরা এক আঘাতেই সেই আকাশ ছোঁয়া গাম্ভীর্যকে ভূ-লণ্ঠিত করে ফেললো।

ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে গজনবী সালতানাতের চারটি সুস্পষ্ট ত্রুটি ধরা পড়ে ঃ

(১) তারা অকারণে সালজুকদের উত্যক্ত করেছে। অথচ সালজুকরা আপনা থেকেই আনুগত্য করতে প্রস্তুত ছিল। সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সাহসও তাদের ছিল না।

(২) তাদেরকে যখন উত্যক্ত করাই হলো তখন অত্যন্ত তৎপরতার সাথে তাদের মূলোৎপাটন করা উচিত ছিল। কিন্তু তারা তা করেনি এবং ভ্রান্ত যুদ্ধ কৌশলের মাধ্যমে যুদ্ধ করে তাদের সাহস বাড়িয়ে দিয়েছে।

(৩) প্রথমবার পরাজয়ের পর সুলতান সন্ধি ও আপোষের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং আপনা থেকেই দেশের একটি অংশ তাদের হাতে সমর্পণ করেছেন। সুলতানের এ আচরণ থেকে নিশ্চিতভাবেই প্রকাশ পায় যে, ঐ পরাজয় আকিস্মক কোনো ব্যাপার ছিল না, বরং তা ছিল সালতানাতের দুর্বলতার ফল। উপরন্তু এভাবে তিনি সালজুকদেরকে শাসন কর্তৃত্বের লোভনীয় স্বাদও পাইয়ে দিলেন।

(৪) তিনি তাঁর সামরিক শক্তিকে ভারতে ব্যবহার করে সালজুকদের শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ দিয়েছেন। এ ক্ষতির প্রতিকার করার চেষ্টা করলেও তা করেছেন একজন অযোগ্য জেনারেলকে অত্যন্ত দুর্বল সেনাদল দিয়ে তাদের

www.bjilibrary.com

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠিয়ে যাকে পরাজিত করে সালজুকরা সমগ্র খুরাসান অধিকার করার পথ সুগম করে নেয়।

এসব বাহ্যিক ঘটনাবলীর পেছনে কিছু নৈতিক কার্যকারণও সক্রিয় ছিল যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত, গজনবী সালতানাতের শাসক আরামপ্রিয়, লোভী, স্বেচ্ছাচারী ও বুদ্ধি-বিবেচনাহীন ছিলেন। তার কর্মচারীগণ অত্যাচারী, স্বার্থপর এবং ব্যক্তি স্বার্থের বেদিতে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বলি দিতে পটু ছিল। সালতানাতের মধ্যে যারা নিঃস্বার্থ, অভিজ্ঞ এবং কৌশলী প্রশাসক ছিল তিনি নিজের স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা তাদের মন ভেঙে দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, গজনবী সেনাবাহিনীর মধ্যেকার শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তাদের নৈতিক শক্তি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। অবাধ্যতা ও কর্মে ফাঁকি দেয়া —সামরিক শৃঙ্খলার জন্য যা ধ্বংসাত্মক তাই তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিলো। তাছাড়া সভ্যতার সামঞ্জস্যহীন অগ্রগতি তাদেরকে কর্মবিমুখ ও তাদের জীবনকে বোঝা বানিয়ে দিয়েছিল। নিজের আরামের বাসস্থান ছেড়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাওয়া তাদের জন্য কষ্টকর ছিল। শীত-গ্রীষ্ম ও দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। যুদ্ধে গেলে অনিচ্ছা নিয়ে যেতো এবং এতো সাজ-সরঞ্জাম ও ভোগের উপকরণ নিয়ে যেতো যে, স্থানান্তরে যাওয়া এবং প্রয়োজনে অগ্রসর হওয়া বা পশ্চাদপদ হওয়া তাদের জন্য কঠিন হতো।

তৃতীয়ত, তাদের মোকাবিলা ছিল এমন এক জাতির সাথে যাদের মধ্যে এসব দোষ তো ছিলই না বরং ছিল গুণাবলী। তাদের নেতা ছিল কষ্টসহিষ্ণু ও সমর বিদ্যায় পারদর্শী। যুদ্ধের ময়দানে তিনি সবার আগে থাকতেন এবং তারা নিজেরাও ছিল নেতাদের অনুগত। তার জীবনে ছিল গ্রাম্য জীবনের সরলতা। কর্মজীবনকে দুর্বলকারী সভ্যতা তখনো তাদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাদের সাজ-সরঞ্জাম ছিল নিতান্তই সংক্ষিপ্ত। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস সুদূর প্রান্তরে পড়ে থাকা ; অতি স্বল্প পরিমাণ ও সাদামাটা খাবার খেয়ে জীবনযাপন করা এবং প্রচণ্ড রোদ্রে ও হাড় কাঁপানো শীতে অভিযানে বের হওয়া। রাতের বেলা মাটিতে ঘুমানো এবং দিনের বেলা মাইলের পর মাইল দূরবর্তী এলাকায় আক্রমণ করা তাদের জন্য ছিল অতীব সহজ। তাদের হালকা সেনাবাহিনী অতি দ্রুততার সাথে যে কোন সামরিক কৌশল প্রয়োগ করতে পারতো। বিজয়ের সময় নিজের অনুকূলে তা কাজে লাগানো তাদের জন্য কঠিন ছিল না। ঠিক তেমনি পরাজয়ের সময় জীবন রক্ষার জন্য দ্রুত সরে পড়াও তাদের জন্য অসম্ভব ছিল না।

www.bjilibrary.com

অভ্যন্তরীণ এ অবস্থা দেখে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, সালজুক ও গজনবীদের মোকাবিলা ছিল সুস্থ ও রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যেকার মোকাবিলার মতই অসম। এই মোকাবিলার স্বাভাবিক পরিণতি তাই হতে পারে যা বাস্তবে হয়েছিলো।

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রতিষ্ঠা যুগ

তুগরীল বেগ

৪২৯ হিজরী থেকে ৪৫৫ হিজরী
১০৩৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১০৬৩ খৃষ্টাব্দ

ইতিপূর্বে আমরা এমন এক পর্যায়ে সালজুকদের বর্ণনা রেখে এসেছিলাম যখন তারা গজনবীদের পরাজিত করে নিশাপুর অধিকার করে নিয়েছিল এবং খুরাসানেরও একটি বড় অংশ তাদের দখলে চলে গিয়েছিল। প্রথমদিকে তারা শুধু চেয়েছিল খুরাসানে বসবাস করার এবং তাদের পশু চারণের চারণক্ষেত্র ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হোক। গজনীর সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ধারণা পর্যন্ত তাদের মনে আসেনি। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে তাদেরকে লড়তে হয় এবং লড়াইয়ে বিজয় অর্জন তাদের সাহস বাড়িয়ে দেয়। তা সত্ত্বেও গজনবী সালতানাতের প্রভাব তাদের মন থেকে পুরোপুরি কখনো দূর হয়নি। তারা বড়জোর যে জিনিসটির আকাংখা পোষণ করতো তাহলো, খুরাসানের যেসব জেলা তাদের অঞ্চল সংলগ্ন সেসব জেলাকে গজনবী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত রেখেই তাদেরকে জায়গীর হিসেবে দেয়া হোক। কিন্তু পরবর্তী সময়ের যুদ্ধসমূহ এবং তাতে বিজয়লাভ তাদেরকে তাদের নিজস্ব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প পোষণ করতে বাধ্য করে। অতএব, তারা যখন খুরাসানের রাজধানী নিশাপুরে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করে তখন সুলতান মাসউদের সিংহাসনে বসা এবং আম দরবারে নিজের শাসন পরিচালনার কথা ঘোষণা করা থেকে তাদের নেতা তুগরীল বেগকে কোনো কিছুই বিরত রাখতে পারেনি।

নিশাপুরে তুগরীলের দরবার

নবাগত এসব বদ্দুরা ইসলামী সভ্যতার কেন্দ্রে যেভাবে তাদের শাসনের ঘোষণা দেয় তার হৃদয়গ্রাহী রূপ বায়হাকী বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখছেন ঃ আম দরবারে কোনো নিময়-শৃঙ্খলা ছিল না। উঁচু-নীচু সবাই মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতো। যে চাইতো সেই তুগরীলকে সম্বোধন করে কথা বলতো। এ অবস্থায় কাজী সা'য়েদ উঠে একদিন বললেন ঃ

বাদশাহ দীর্ঘজীবী হোন। আপনি যে সিংহাসনে বসে আছেন তা সুলতান মাসউদের সিংহাসন। গায়েবের পর্দার আড়ালে বহু জিনিস লুকিয়ে আছে। জানা নেই, পরে আরো কি হতে যাচ্ছে। সতর্ক থাকুন। মহান আল্লাহকে ভয়

www.bjilibrary.com

করুন, ইনসাফ করুন, দুঃখ ক্লিষ্ট ও অসহায়দের কথা শুনুন এবং সেনাবাহিনীকে যুলুম-নির্যাতনের স্বাধীনতা দিবেন না। বে-ইনসাফী অকল্যাণ বয়ে আনে।"

তুগরীল এসব উপদেশ শুনলেন এবং বললেন ঃ আপনি যা বললেন আমি তা গ্রহণ করলাম এবং সে মোতাবেক কাজ করবো। তিনি আরো বললেন ঃ আমরা নবাগত এবং দরিদ্র। এখানকার আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে অনবহিত। উপদেশমূলক কোনো বিষয় থাকলে জানাতে দ্বিধা করবেন না।[১]

শান্তি প্রতিষ্ঠা

তুগরীল তাঁর এ প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন। বিজয়ী সালজুকরা যখন দলে দলে খুরাসানের রাজধানীতে প্রবেশ করে তখন শহরের আসবাব ও ধন-সম্পদ দেখে তাদের লোভ হলো এবং লুটপাট করতে চাইলো। তাঁর আপন ভাই চাগরী বেগ দাউদও তাই করতে চাচ্ছিলো। কিন্তু তুগরীল তাকে এই বলে নিরস্ত্র করলো যে, এখন রমযান মাস, এখন লুটপাট উচিত নয়। ঈদুল ফিতরের পর সেনাবাহিনী লুটপাট করতে মনস্থ করলো। কিন্তু তুগরীল তাদেরকে আবার নিরস্ত্র করলো। এবার তিনি একটা বড় যুক্তি পেলেন এই যে, ঐ মাসেই খলীফা কায়েম বি আমরিল্লাহর ফরমান এসেছিলো। যাতে সালজুকদের উপদেশ দেয়া হয়েছিল যে, লুট-তরাজ ও ফিতনা-ফাসাদ থেকে বিরত থাকবে।[২] তুগরীল সালজুক নেতাদের সামনে ঐ ফরমানটিই পেশ করলেন। খলীফার নাম শুনে কোনো কোনো নেতা চুপ হয়ে গেলেন। কিন্তু দাউদ এতে নিরস্ত্র হলো না এবং অনুমতি ছাড়াই লুটপাট করতে মনস্থ করলো। তখন তুগরীল একখানা খঞ্জর হাতে নিয়ে বললেন ঃ যদি তুমি এ কাজ থেকে বিরত না হও তাহলে এই খঞ্জর দ্বারা নিজের প্রাণ সংহার করবো। অবশেষে দু'জনের সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হলো যে, নিশাপুরের বাসিন্দাদের নিকট থেকে ত্রিশ বা চল্লিশ হাজার দিনার নিয়ে সেনাবাহিনীর মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। এর বিনিময়ে সেনাবাহিনী শহরের বাসিন্দাদের কাউকে কিছু বলবে না। এ ঘটনা থেকে জানা যায় যে, সাধারণ সালজুকরা তখনো পর্যন্ত নিজেদেরকে লুটেরা তুর্কমান বলেই মনে করছিলো। কিন্তু তুগরীলের এ উপলব্ধি হয়েছিলো যে, এখন আর সে লুটেরা নয়, বরং শাসনকর্তা।

---

১. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৬৯১-৬৯২।

২. কাতেব ইমাদ বর্ণনা করেছেন যে, আবু বকর তূসী এ ফরমান বহন করে এনেছিলেন। সালজুকরা তার প্রতি অত্যন্ত মর্যাদা প্রদর্শন করলো। তের রকমের খিলাত প্রদান করলো এবং খলীফার ফরমানকে নিজেদের জন্য সম্মানজনক মনে করলো।-(যুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-৭)

www.bjilibrary.com

এরপর তুগরীল যতদিন নিশাপুরে ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত সপ্তাহে দু' দিন (রোববার ও বুধবার) সাধারণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য দরবারে বসতেন।[১]

মাসউদ কর্তৃক খুরাসান পুনরুদ্ধারের শেষ চেষ্টা

কিন্তু এই মুহূর্তেই শাসন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার অবকাশ লাভ তুগরীলের জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল। গজনবীদের শক্তি এতো দুর্বল ছিল না যে, এত সহজেই তারা খুরাসান এলাকা হাতছাড়া করতে রাজি হতে পারে। অতএব, তাদের সাথে একটি চূড়ান্ত সংঘাত হওয়া অনিবার্য ছিল।

নিশাপুর বিজিত হওয়ার খবর শুনেই মাসউদ ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতি শুরু করলেন। বছরের শেষ নাগাদ এ প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো এবং পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী যুদ্ধের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তিন শত হাতিসহ সংগৃহীত হলো।[২] ৪৩০ হিজরীর (মোতাবেক ১০৩৮ খৃষ্টাব্দ) মুহাররাম মাসে তিনি এসব সাজ-সরঞ্জাম এবং জাঁকজমক ও প্রতিপত্তির সাথে এমনভাবে যাত্রা করলেন যে, খুরাসান পুনর্দখল কয়েক সপ্তাহ বা মাসের ব্যাপার বলে মনে হচ্ছিলো। কিন্তু তাঁর বিলাসপ্রিয়তা, স্বেচ্ছাচারিতা ও বুদ্ধি-বিবেচনার ধার না ধারার মানসিকতা তার সকল পরিকল্পনা নস্যাত করার জন্য তখনো বর্তমান ছিল। এমতাবস্থায় তিনি যদি এর চেয়ে দশগুণ তথা হাজার গুণ শক্তি নিয়েও অগ্রসর হতেন তবুও এর স্বাভাবিক ফলাফল যা হওয়ার তাই হতো। নিজের ভুলের এতবড় তিক্ত ফল দেখার পরেও তার কর্মপদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন সূচিত হয়নি। তিনি গজনী থেকে এমনভাবে যাত্রা করলেন যে, এক সপ্তাহ পর্যন্ত উৎসব করলেন এবং শরাব পান করতে থাকলেন।[৩] ওয়াল ওয়ালিজ পৌঁছে জানতে পারলেন যে, খুতিলানে পুর্তুগীন নামে একজন তুর্কী আমীর বিদ্রোহ করেছে। এ খবর শোনামাত্র তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন এবং খুরাসানের পরিবর্তে খুতিলান গিয়ে পুর্তুগীনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। উযীর অনেক বুঝিয়ে বললেন যে, পুর্তুগীনকে আনুকূল্য ও দান-দক্ষিণা দিয়ে সন্তুষ্ট করে সালজুকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করা অধিক সমীচীন। কিন্তু তিনি তা মেনে নিতে পারলেন না। অবশেষে বহু কষ্টে তাঁকে এ মর্মে রাজি করানো হলো যে, পুর্তুগীনের মোকাবিলার জন্য নিজে না গিয়ে দশ হাজার সৈন্যসহ অন্য কোনো সেনাধ্যক্ষকে পাঠিয়ে দেয়া হোক। আমীর-

১. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯০-১৯১; যুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-৭।

২. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৬৯২–৬৯৫। ৪২৬ হিজরীর রমযান মাসকে ইবনে আসীর গজনী থেকে যাত্রার তারিখ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বায়হাকী কর্তৃক তা সমর্থিত হয়নি।

৩. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৬৯৪।

www.bjilibrary.com

উমরা ও উযীরগণ এই অর্থহীন জেদ ও হঠকারিতায় অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। উযীর আবু নসরকে বললেন ঃ এই স্বেচ্ছাচারিতা ও বিবেকহীনতা দেখলে তো ? আশংকা করছি খুরাসান হয়তো আর ফিরে পাব না। কারণ, আমি অগ্রগতির কোনো লক্ষণই দেখতে পাচ্ছি না।[১]

ক্রমাগত ভুল

৪৩০ হিজরীর সফর মাসে মাসউদ বলখে উপনীত হলেন। এ সময়ের মধ্যে সেনাপতি আলী দায়া পুর্তুগীনকে পরাজিত করে বিতাড়িত করেছিলেন। এরপর উচিত ছিল এ দিকটা উপেক্ষা করে খুরাসানের প্রতি মনযোগী হওয়া। কিন্তু কেন যেন তার মাথায় পুর্তুগীন সম্পর্কে কি এক ধারণা চেপে বসেছিলো যার কারণে তিনি বলখ থেকে পুনরায় খুতিলান অভিমুখে যাত্রার জন্য মনস্থির করে ফেললেন। উযীর বাধ্য হয়ে পুনরায় আরজ করলেন যে, শীতের এই মওসুমে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নদীর পানি জমে বরফ হয়ে যায়। এরূপ নদী পার হয়ে অন্য এলাকায় চলে যাওয়া মোটেই উচিত হবে না। আমাদের সামনে এর চেয়েও বড় একটি কাজ আছে। এ কাজ ছেড়ে আমরা যদি পুর্তুগীনকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি তাহলে যে ক্ষতি ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে তার প্রতিকার কঠিন হয়ে যাবে। অন্য সব উযীর এবং আমীর-উমরাও এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন। কিন্তু মাসউদ কারো কথাই শুনলেন না। তিনি আমুদরিয়ার ওপর পুল তৈরী করে খুতিলান যেতে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকলেন। তাঁর হঠকারিতা এখন এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছলো যে, যারা তাঁকে সৎ পরামর্শ দিতো তিনি তার প্রতিই রুষ্ট হতে শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীবর্গ তাকে পরামর্শ দেয়াই বন্ধ করে দিলেন। তারা তাঁকে ভুল করতে দেখে ক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন এবং চুপচাপ থাকছিলেন।[২]

এ সময় গজনী থেকে যুবরাজের মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছলো। সালতানাতের এতো বড় গুরুত্বপূর্ণ খবর তৎক্ষণাৎ সুলতানকে দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেই সময় সুলতান শরাব পানে মশগুল ছিলেন। তাই কেউ তাঁর সামনে গিয়ে এ খবর দেয়ার সাহস পায়নি।[৩]

রবিউল আউয়ালের শেষ ভাগে মাসউদ আমুদরিয়া অতিক্রম করে তিরমিযে উপনীত হলেন এবং সেখান থেকে পুর্তুগীনের পশ্চাদ্ধাবধনে অগ্রসর হলেন। সালজুকদের জন্য এর চেয়ে সুবর্ণ সুযোগ আর কি হতে পারতো ? তারা

---

১. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৬৯৮-৬৯৯।

২. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৭০৩-৭০৪।

৩. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৭০৫।

www.bjilibrary.com

সারাখস থেকে একটি বিরাট বাহিনী প্রেরণ করে যাতে উক্ত বাহিনী আন্দখোদের পথে অগ্রসর হয়ে আমুদরিয়ার তীরে পৌছে পুল ধ্বংস করে দিতে পারে। মাসউদ সালজুকদের এ ইচ্ছার কথা জানতে পেরে অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েন। ফলে পুর্তুগীনের মোকাবিলা ও পশ্চাদ্ধাবনের সংকল্প পরিত্যাগ করে অতিদ্রুত তিরমিযে এসে উপস্থিত হন। এ অবস্থায় পুর্তুগীন পেছন দিক থেকে অকস্মাত হামলা চালিয়ে অনেক কিছু লুণ্ঠন করে নেয়। এ সময়ের মধ্যে যদি সালজুক সৈন্যরা আমুদরিয়ার তীরে উপনীত হয়ে পুল ধ্বংস করে ফেলতো, তাহলে তাঁকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো। সৌভাগ্যবশত তাদের পৌছতে বিলম্ব হয় এবং মাসউদ তার সেনাবাহিনী নিয়ে নদী অতিক্রম করে বলখে পৌছে যান।[১]

এসব ঘটনায় সালজুকদের সাহস এত বৃদ্ধি পায় যে, তাদের দশজন সৈন্য বলখে একেবারে সুলতানের বাগানে প্রবেশ করে। চারজন হিন্দু পেয়াদাকে হত্যা করে এবং একটি হাতি ধরে নিয়ে যায়। হাতিটিকে দাউদ নিশাপুর পাঠিয়ে দেয়। এটা গজনবীদের অসতর্কতার এতবড় প্রমাণ যে, যেসব এলাকার মধ্যে দিয়ে হাতিটিকে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানকার লোকজন তা দেখে এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতে থাকে যে, যাদের ঘর থেকে হাতি নিয়ে যাওয়া যায় তাদের রক্ষাকর্তা এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

এরপর দাউদ বলখের সন্নিকটবর্তী দু'টি গ্রামে হামলা চালিয়ে লুটপাট চালায়।[২]

উলিয়াবাদের যুদ্ধ

এরপর মাসউদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। তিনি যুদ্ধের সংকল্প করেন এবং সৈন্য নিয়ে সালজুকদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ৪৩০ হিজরীর রযব মাসের ৯ তারিখে উভয় পক্ষ উলিয়াবাদের ময়দানে পরস্পর মুখোমুখি হয়। প্রথম প্রথম গজনবী সৈন্য যুদ্ধ এড়িয়ে চলতে থাকে। শুধুমাত্র পাঁচ শত সৈন্য যুদ্ধ করছিলো আর অবশিষ্ট সৈন্যরা দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিলো। এতে মাসউদ ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হলেন এবং এক হাজার অশ্বারোহী নিয়ে অগ্রসর হলেন। বিলাসপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সাহসী ও যুদ্ধাভিজ্ঞ। সালজুকরা তার একটি হামলাও বরদাশত করতে সক্ষম হলো না। পঞ্চাশটি মৃতদেহ ও বিশজনকে বন্দী রেখে তারা পালিয়ে যায়। ঐ সময় যদি পলায়নরতদের পিছু ধাওয়া করা হতো, তাহলে তাদের একজনও জীবিত

১. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৭০৭-৭০৮, গ্রন্থকার (বায়হাকী) নিজেই এ সফরে মাসউদের সাথে ছিলেন। তিনি তার নিজের চোখে দেখা ঘটনা এখানে লিপিবদ্ধ করেছেন।

২. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৭০৯।

www.bjilibrary.com

থাকতো না। কিন্তু মাসউদ অত্যন্ত ভদ্রতার পরিচয় দিয়ে পলায়নরতদের পিছু ধাওয়া করতে বাধা দিলেন এবং নিজের অবস্থানস্থলে এসে বন্দীদেরকেও মুক্ত করে দিলেন।[১]

সালজুকদের যুদ্ধ সম্মেলন

এ যুদ্ধের পর সালজুকরা তাদের সমস্ত শক্তিকে সারাখসে সমবেত করে। এদিকে দাউদ পরাজিত হয়ে সেখানে উপনীত হয়। অপরদিকে নিশাপুর থেকে তুগরীল এবং মার্ভ থেকে বেগু এসে উপস্থিত হলে বিশ হাজার সৈন্যের সমাবেশ ঘটে। ভবিষ্যতে যুদ্ধের রূপরেখা তৈরীর জন্য এখানে সালজুক নেতাদের একটি যুদ্ধ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তুগরীল এবং অন্যসব নেতারা বললেন যে, এতো বড় বাদশাহ যার এতবড় একটা সেনাবাহিনী আছে তার সাথে যুদ্ধ করা কঠিন। তাই বর্তমানে আমাদের কর্তব্য রায় এবং জিবালের দিকে সরে যাওয়া। সেখানে মুষ্টিমেয় দায়লাম ও কুর্দী জাতি রয়েছে। আমরা সহজেই তাদেরকে পরাস্ত করতে পারবো। একথা শুনে দাউদ উঠে বললো ঃ

"বন্ধুগণ, আপনারা মারাত্মক ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত আছেন। আপনারা যদি খুরাসান থেকে সরে যান, তাহলে এই বাদশাহ আপনাদের পশ্চাদ্ধাবন করবেন এবং সর্বত্র আপনাদের শত্রুদেরকে উদ্বুদ্ধ করবেন। ফলে পৃথিবীতে কোথাও আপনারা টিকতে পারবেন না। আমি উলিয়াবাদে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। জনবল ও সামরিক সাজ-সরঞ্জাম যা চান সব তার কাছে আছে। কিন্তু তার সাজ-সরঞ্জাম অত্যন্ত বেশী। এসব সাজ-সরঞ্জাম সে নিজের কাছেই রাখে। সেগুলো ছাড়া তাঁর জীবনযাপন কঠিন। এসব কারণে সে দুর্বল। কারণ, ঐগুলোর যত্ন নেবে না নিজের দিকে তাকাবে। বেগতাগ্দী ও সুবাশীর ওপর যে মুসিবত আপতিত হয়েছে তা তাদের এত অধিক পরিমাণে সাজ-সরঞ্জাম থাকার কারণে। পক্ষান্তরে আমাদের সাজ-সরঞ্জাম অত্যন্ত হালকা ও সংক্ষিপ্ত। আমাদের এসব সাজ-সরঞ্জাম আমাদের ৬০/৭০ মাইল পশ্চাতে থাকে। আমরা জন্মগত সৈনিক। আমরা প্রথমে বীরত্বের সাথে লড়াই করতে অগ্রসর হবো এবং পরে দেখবো আল্লাহ আমাদের তাকদীরে কি লিখে রেখেছেন।"

এ বক্তৃতায় উপস্থিত সবাই সাহস ফিরে পেল এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খুরাসানে লড়াই করবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

ইতিমধ্যেই পুর্তুগীন এসে সালজুকদের সাথে শামিল হয়েছিলো। মাসউদের সেনাবাহিনীর বহু লোকও যেমন ঃ আমীর ইউসুফ, হাজেব আলী তাগীন, সুলায়মান, আরসালান জাযেব এবং কদর হাজেব প্রমুখও বিচ্ছিন্ন হয়ে

---

১. বায়হাকী এই যুদ্ধের চাক্ষুষদর্শী, (পৃষ্ঠা-৭১০-৭১১)

www.bjilibrary.com

সালজুকদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিলো। এসব দলছুট বা পক্ষত্যাগী লোকদের সাথে কি আচরণ করা হবে যুদ্ধ সম্মেলনে এ বিষয়টিও বিবেচিত হয়। দাউদ বললো ঃ এরা সব নেমক হারাম ও অকৃতজ্ঞ লোক। কোন অবস্থাতেই তাদের ওপর আস্থা রাখা যায় না। প্রয়োজনে আজ এরা আমাদের সাথে আছে, শত্রুরা যদি আগামীতে তাদের সাথে যোগাযোগ করে স্বমতে আনতে সক্ষম হয়, তাহলে এরা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। অতএব, তাদেরকে কোনো অবস্থাতেই পেছনে রাখা যাবে না। তাদেরকে বরং সেনাবাহিনীর সামনে রাখো। যদি তারা লড়াই করে তাহলে আমাদের উপকার হবে। আর যদি লড়াই না করে তাহলে কোনো ক্ষতি হবে না। অতএব, এই সিদ্ধান্ত অনুসারে পুর্তুগীন ও আরসালান জাযেব প্রমুখকে দুই হাজার সৈন্যের সাথে—যাদের অধিকাংশই ছিল পক্ষত্যাগী—সম্মুখভাগে রাখা হলো।[১]

এ দু'টি বিষয় থেকেই সামরিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে দাউদের গভীর দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় এবং এও জানা যায় যে, তিনি গজনবীদের প্রকৃত দুর্বলতা ভালভাবে বুঝে নিয়ে তা সঠিকভাবে কাজে লাগাচ্ছিলেন।

তালখ আবের যুদ্ধ

সারাখসে সালজুকদের সমাবেশের খরব পেয়ে মাসউদ শা'বানের মধ্যভাগে বলখ থেকে এদিকে চলে আসেন এবং রমযানের মাঝামাঝি স: য়ে তলখআবে পৌঁছে অবস্থান করতে থাকেন। সালজুক সেনাবাহিনী এখানেই অবস্থান করছিলো। সালজুক অশ্বারোহী সৈন্যরা গোটা রমযান মাস ধরে মাসউদের সেনাবাহিনীর ওপর আকস্মিক হামলা চালাতে থাকে এবং এভাবে মাসউদের সৈন্যদের জন্য তাঁবুর বাইরে গমন কঠিন করে তুলে। এমনকি পানি এবং পশুখাদ্য আনার জন্য কমপক্ষে পাঁচ শত সৈন্যের বাহিনী পাঠাতে হতো। এ পরিস্থিতি দেখে মাসউদ তাঁর পারিষদবর্গকে বললেন ঃ আমার জানাই ছিল না যে, এ জাতি এতো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। লোকজন আমাকে প্রতারণা করেছে। তাদের প্রকৃত অবস্থা আমাকে জানায়নি। তাহলে সূচনাতেই আমি ব্যবস্থা গ্রহণ করতাম।

ঈদের পরে তলখআবের ময়দানে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলো। মাসউদ নিজে একটি হাতির পিঠে আরোহণ করে বাহিনীর মধ্যভাগে অবস্থান গ্রহণ করলেন এবং পশ্চাদভাগে এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য মোতায়েন করলেন যাতে তারা রসদপত্রের রক্ষণাবেক্ষণ এবং কেউ পালাতে উদ্যত হলে তাকে হত্যা করতে পারে। এসব ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়। তুমুল যুদ্ধ

১. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৭১২-৭১৪।

www.bjilibrary.com

হলো। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উভয় পক্ষের পাল্লাই সমান থাকে। অবশেষে মাসউদ দুই হাজার বর্ম পরিহিত সৈন্য নিয়ে বিপক্ষ সৈন্য দলে যেখানে দাউদ, তুগরীল ও বেগু দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে আক্রমণ করেন। সালজুকরা এ হামলার প্রচণ্ডতা প্রতিহত করতে অক্ষম হয় এবং বিশৃঙ্খল অবস্থায় পরাস্ত হয়। এ ক্ষেত্রেও মাসউদ তাদের পিছু ধাওয়া করা থেকে বিরত থাকেন। অন্যথায় তার ওপর কঠিন বিপদ নেমে আসতো।[১]

যে বিজয় পরিণতিতে পরাজয়

সামনে অগ্রসর হয়ে মাসউদ শাওয়ালের ৩ তারিখে সারাখসে উপনীত হন। তিনি আশা করেছিলেন যে, সালজুকদের ওপর তিনি যে চরম আঘাত হেনেছেন তাতে তারা এমন উর্ধশ্বাসে পালাবে যে, আমুদরিয়া ও বালখানকুহ এলাকার এপারে মোটেই দাঁড়াবে না। কিন্তু তিনি দেখে বিস্মিত হলেন তাঁর সেনাবাহিনীর সামনে সালজুক বাহিনী হরিণের সম্প্রতিভ হয়ে চলাফেরা করছে এবং যখনই সুযোগ পাচ্ছে তখনই অকস্মাত আক্রমণ করে বসছে। তাদের এ উৎপাত ছিল এমন যে, তারা সারাখসের নিকটবর্তী নদী থেকে পানি সংগ্রহ করাও বিপজ্জনক করে তুললো। তাদের ক্রমাগত আক্রমণে মাসউদের বাহিনীতে চরম অসন্তোষ ও অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়লো। লোকজন তাঁবুর বাইরে যেতেও ভয় পেতে থাকলো, অফিসার নির্দেশ পালনে অন্যের দোয়াই দিয়ে গড়িমসি করতে থাকলো এবং ছোট ছোট কাজ থেকেও গা বাঁচিয়ে চলতে থাকলো। ঘটনা এতোদূর গড়ালো যে, পশুদের জন্য খাদ্য সরবরাহও বন্ধ হয়ে গেল। সালজুকরা পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো যে, এখন খোলা ময়দানে গজনবীদের সাথে লড়াই করা হবে না। কারণ, নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধে তাদের বাহিনীর মোকাবেলায় টিকে থাকা কঠিন। তাই এখন আমাদের জন্য উচিত হবে আমাদের নিজস্ব তুর্কী পদ্ধতিতে যুদ্ধ করা। আমরা মরুচারী লোক। সর্দি ও গরম আমরা ভালভাবেই বরদাশত করতে পারি। সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আমাদের কোনো চিন্তা নেই। বাদশাহ বাহিনীর মধ্যে এতোটা কষ্ট সহিষ্ণুতা নেই এবং তারা এতোটা হালকাও নয় যে, আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে পারবে। তারা দীর্ঘদিন আমাদের গেরিলা আক্রমণ সহ্য করতে সক্ষম হবে না এবং শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়বে।[২]

সন্ধির জন্য আলোচনা

মাসউদ প্রতিনিয়ত তাঁর সেনাবাহিনীর অস্থিরতা ও হতোদ্যম এবং সালজুকদের সাহসিকতা ও চৌকসভাব দেখে ঘাবড়িয়ে যাচ্ছিলেন। এ অবস্থায়

১. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৭১৪-৭২১।
২. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৭২২-৭২৪।

www.bjilibrary.com

কি করা যায়, সে বিষয়ে তিনি একান্তে পরামর্শ করলেন। উযীর পরামর্শ দিলেন যে, আমাদের সৈন্যরা যতটা মনমরা ও দুর্বল শত্রু সৈন্যরা তার চেয়েও মনমরা ও দুর্বল। তবে পার্থক্য এই যে, তারা অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু ও স্বতন্ত্র মেজাজ এবং বীরত্বের সাথে লড়াইয়ে জীবনপাত করছে। এ ক্ষেত্রে আমার কাছে উপযুক্ত মনে হয় কোনো ব্যক্তিকে তাদের কাছে পাঠানো। সে তাদেরকে বুঝিয়ে বলবে যে; বাদশাহ্ যদি তোমাদের পিছু ধাওয়া করতেন, তাহলে তোমাদের কারো জীবনই রক্ষা পেতো না। এখন তিনি যদি পুনরায় যুদ্ধ করতে সংকল্পবদ্ধ হন তাহলে তাতে তোমাদের কল্যাণ হবে না। তাই তোমাদের জন্য উচিত অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে ওজর পেশ করা। তাহলে আমি তোমাদের ত্রুটি মার্জনার জন্য রাজি করতে সুলতানের কাছে এই বলে আরজ পেশ করতে পারবো যে, তারা শুধু জীবনের আশংকায় এ কাজ করেছে। এভাবে সন্ধির খেলা খেলে হিরাতে চলুন। দুই পক্ষের দূতদের যাতায়াতকালীন সময়ে আপনি নতুন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। প্রথমে মাসউদ এ পরামর্শ মেনে নিতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কারণ, তা ছিল সুস্পষ্ট দুর্বলতা প্রদর্শন। কিন্তু শেষমেষ তা মেনে নিলেন।[১]

এ প্রস্তাবনা অনুসারে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও বাকপটু হাকেম মুতাওয়েয়েরীকে এ কাজে নিয়োগ করে অতীব গুরুত্ব সহকারে বলে দেয়া হলো যে, কোনোভাবেই যেন প্রকাশ না পায় যে, সুলতান বিষয়টি জানেন, বরং প্রকাশ করবে যে, আমি এবং উযীর শুধুমাত্র ইসলামী সমবেদনায় এটাকে কল্যাণকর বলে মনে করেছি। আমরা চাই যেন অযথা রক্তপাত না হয় এবং অযথা তোমাদেরকে নির্মূল করা না হয়। মুতাওয়ায়েরী সালজুকের ক্যাম্পে পৌছলে তাকে অতীব সমাদরে গ্রহণ করা হলো এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সুন্দরভাবে যে পয়গাম তিনি তুলে ধরলেন তা মনযোগ সহকারে শোনা হলো। এরপর সালজুক নেতারা সবাই একত্রে বসে পরামর্শ করলেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো যে, বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করলে উযীরের পরামর্শ গ্রহণ করাই যুক্তিগ্রাহ্য। তাই তারা হাকেম মুতাওয়েয়ীকে ডেকে তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল এবং উযীরের সাথে আলাপ-আলোচনা করার জন্য তার সাথে তাদের একজন দূতকে উযীরের কাছে পাঠিয়ে দিল।

হাকেম মুতাওয়েয়ী ফিরে এসে তার সাথে আগমনকারী সালজুক দূতকে উযীরের সামনে হাজির করলেন এবং যা দেখে এবং শুনে এসেছিলেন তা বর্ণনা করলেন। উযীর এসব বিষয়ে পুনরায় সুলতানের সাথে পরামর্শ করার পর দূতকে ডেকে বললেন ঃ আমি তোমাদের সুপারিশ গ্রহণ করার জন্য বড় কষ্টে সুলতানকে সম্মত করেছি। তোমাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে ঃ

---

১. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৭২৫-৭২৭।

www.bjilibrary.com

"এই সালতানাতের মধ্যে তোমরা বর্তমানে যেখানে অবস্থান করছো সেখানেই অবস্থান করো। আমরা হিরাতে ফিরে যাচ্ছি। নাসা, ফারাওয়া, আবীওয়ার্দ এবং এই প্রান্তর তোমাদের অধিকারে দেয়া হয়েছে। তবে শর্ত থাকে যে, তোমরা মুসলমান এবং সাধারণ প্রজাদের ভালমন্দ কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। মানুষের নিকট থেকে জরিমানা আদায় করবে না এবং যে এলাকা তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেই এলাকার মধ্যেই অবস্থান করো। আমরা হিরাত পৌছার পর তোমাদের ইউনিফর্ম পরা দূতকে পাঠাবে যাতে অপ্রত্যাখ্যানযোগ্য চুক্তিনামা প্রস্তুত করা যায়।"[১]

দূত এ সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। ফলে অস্থায়ী সন্ধিচুক্তি হয়ে যায়। কিন্তু উভয় পক্ষ থেকেই এ সন্ধি প্রদর্শনী ধোকাবাজি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। গজনীর সুলতান ও উযীরের উদ্দেশ্য পূর্বোক্ত বর্ণনা থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখন থাকে শুধু সালজুকদের উদ্দেশ্য। তাদের ক্যাম্প থেকে ফেরার পর গজনীর দূত যে বর্ণনা দিয়েছিলো তা থেকে তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যায়। তিনি উযীরকে বললেন ঃ

"কোনোভাবেই তাদের ওপর বিশ্বাসস্থাপন করা যায় না .... নিজের কাজ গুছিয়ে নেয়া, তাদের কাজ নস্যাত করে দেয়া কিংবা এ রাজ্য থেকে তাদের বহিষ্কার করা নিজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। তাদের প্রতারণাপূর্ণ এবং গর্বিত ভঙ্গির কথাবার্তায় ধোঁকায় পড়বেন না। তারা কখনো সোজা পথে চলবে না। বাদশাহী ও শাসন কর্তৃত্বের স্বাদ তারা যখন একবার পেয়েছে তখন তারা কখনো তা ভুলতে পারবে না। এবার বাদশাহ নিজে আক্রমণ করার কারণে তারা যে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে তার কারণেই তারা সন্ধি করতে সম্মত হয়েছে। কিন্তু সাধ্যমত তারা সবকিছুই করবে, যেমন ঃ ধোঁকাবাজি, বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতারণার মাধ্যমে জনাব বাদশাহর লোকদের বিভ্রান্ত করা, বিভিন্ন অঞ্চল দখল করা, সৈন্য পরিচালনা করা এবং মধ্য এশিয়া থেকে আরো জনশক্তি নিয়ে আসা, তারা তাদের সাথে ভিড়ে জনশক্তি বৃদ্ধি করবে। এসব কাজ করতে তারা মোটেই ত্রুটি করবে না। আমরা জানতে পেরেছি, তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, এ বাদশাহ দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং তার উযীর তার যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে আমাদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিপর্যয় রোধ করতে চেয়েছে, যাতে তার সেনাবাহিনী কিছুটা বিশ্রাম নিতে পারে এবং যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে। তারপরই তারা পুনরায় আমাদের পিছু ধাওয়া করবে এবং যতদিন এই এলাকা থেকে আমাদেরকে বহিষ্কার করতে না পারবে ততদিন আরাম করবে না। এ

---

১. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৭৩০-৭৩৩।

www.bjilibrary.com

কারণেই তারা সন্ধি ও বন্ধুত্বকে সবে এনে ব্যবহার করছে। আর আমারা সে জন্যই তা গ্রহণ করেছি অর্থাৎ তাদের ধাওয়া থেকে নিজেদেরকে নিরাপদে রেখে সেনাবাহিনীকে ভালভাবে প্রস্তুত করে নেব। তাই আমাদের অসতর্ক থাকা উচিত নয়, বরং সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার। কারণ, কোনো সময় যদি তারা আকস্মিকভাবে আমাদের ওপর আক্রমণ করে বসে তাহলে যেন আমরা তার জবাব দিতে পারি।"[১]

উভয় পক্ষের এ ধরনের নিয়তের ওপর যে সন্ধির ভিত্তি তাকে সন্ধি না বলে বরং সামরিক বিরতি বলা যেতে পারে।

যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি

৪৩০ হিজরীর যুলকা'দা মাসে (মোতাবেক ১০৩৯ খৃষ্টাব্দ) এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর মাসউদ হিরাত চলে যান এবং সালজুক নেতারা নিশাপুর, সারাখস্, নাসা ও আবিওয়ার্দের দিকে যাত্রা করেন। হিরাত পৌঁছে মাসউদ সেনাবাহিনী ও যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ বিষয়ে নির্দেশ জারী করেন এবং তারপর নিঃশঙ্কচিত্তে ভোগ-বিলাসে মত্ত হন। কিন্তু তুগরীল ও দাউদ প্রমূখ একটি মুহূর্তও অপচয় না করে অত্যন্ত তৎপরতার সাথে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকেন। তারা খাওয়ারিজম শাহ ইসমাঈল ইবনে আলতুনতাশের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। আলী তাগীনের সন্তানদের বিরুদ্ধে পুর্তুগীনকে সামরিক সাহায্য প্রদান করে এমনভাবে ব্যবহার করেন যে, মধ্য এশিয়ার ব্যাপক অঞ্চল তার কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে। তারা আমুদরিয়ার সকল পথ উন্মুক্ত করে দেন। ফলে ঐসব পথে দলে দলে লোক এসে সালজুকদের সাথে যোগ দিতে থাকে। এ পরিস্থিতি দেখে গজনীর বৃদ্ধ প্রশাসক অস্বস্তিবোধ করছিলেন। একদিকে তাদের বাদশাহ ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিলেন, কিন্তু অপরদিকে তাদের দুশমনরা অতীব তৎপরতার সাথে প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলো। তারা যে কৌশল গ্রহণ করেছিলে তা উল্টা তাদের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছিলো। কিন্তু করার ছিল না কিছুই। কারণ, যুবক বাদশাহকে কিছু বললে মর্যাদাহানির আশংকা ছিল।[২]

সফর মাসে গজনী থেকে মাসউদের কাছে যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য পৌঁছে। তিনি সেই সৈন্য নিয়ে হিরাত থেকে নিশাপুরের দিকে যাত্রা করে। তুগরীল এখানেই অবস্থান করছিলেন। এ যাত্রা সুলতান মাসউদ অনেক কম সফর উপকরণ সাথে নিয়েছিলেন এবং সৈন্যদেরকে এতটা হালকা রেখেছিলেন যাতে সহজেই একস্থান থেকে আরেক স্থানে চলাচল করা যায়।[৩]

---

১. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৭৩৪–৭৩৫।

২. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৭৩৮–৭৪৫।

৩. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৭৫৫।

www.bjilibrary.com

তুগরীল ঘিরে ফেলার জন্য তিনি কৌশল অবলম্বন করে সেনাবাহিনীকে তূসের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন, যাতে তুগরীল নিশ্চিন্তে নিশাপুর বসে থাকে এবং সে বুঝে উঠার আগেই নূকের পথে অগ্রসর হয়ে নামার সামরিক হেড কোয়ার্টার থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। এ কৌশল অবলম্বনের ক্ষেত্রে মাসউদ যদি সফল হতেন, তাহলে হিরাত এবং সারাখস না গিয়ে তুগরীলের জন্য নাসায় যাওয়ার আর কোনো পথ থাকতো না। আর ঐ পথে গেলে তার বন্দী হওয়া নিশ্চিত ছিলো। কিন্তু মাসউদের নিজের উদাসীনতার কারণেই তার এ কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। রাতে মাসউদ যখন একটি ক্ষিপ্রগতি হাতির পিঠে ঘুমাচ্ছিলেন তখন তুগরীল তার বাহিনীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যায়। জুরজানের সন্নিকটস্থ উসতুয়া এলাকায় গিয়ে মাসউদ তা জানতে পারেন।[১] তিনি তৎক্ষণাত একজন সামরিক কর্মকর্তাকে এক হাজার অশ্বারোহী নিয়ে পশ্চাদ্ধাবন করতে পাঠান। কিন্তু তুগরীল এতো দ্রুত অতিক্রম করে গিয়েছিলেন যে, এরা তার নাম গন্ধও খুঁজে পায়নি।

মাসউদের এই প্রস্তুতি দেখে সালজুকরা খুরাসানের সমস্ত প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নাসা ও কারাওয়ায় এসে সমবেত হয়। তিনি তার সমস্ত সহায়-সম্পদ এবং শিশুদেরকে মরুভূমিতে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে ঝামেলা মুক্ত হয়ে থেকে যান। তাদের সমবেত হওয়ার খবর শুনে মাসউদ ফারাওয়া অভিমুখে যাত্রা করেন এবং নিজের সব জিনিসপত্র বালখান কুহে পাঠিয়ে দেন। সালজুকদের জন্য এটা ছিল অত্যন্ত কঠিন সময়। তাদের সমস্ত সৈন্য অসহায়ভাবে প্রান্তরে অবস্থান করছিলো। তাদের ওপরে সর্বক্ষণ এক পরাক্রমশালী শক্তির আক্রমণের আশংকা বিরাজ করছিল। সৈন্যদের তো প্রশ্নই আসে না, তুগরীলের নিজের অবস্থাই ছিল এই যে, কয়েকদিন ধরে তিনি দিবারাত্র সবসময়ের জন্য শরীর থেকে বর্ম খুলেননি এবং রাতে বালিশ ছাড়া ঘুমিয়েছেন। সেই সময় মাসউদের সামান্য তৎপরতাই সালজুকদের ধ্বংস ডেকে আনতে পারতো। কিন্তু নাসাতে পৌঁছেই মাসউদ শরাব পানে মগ্ন হলেন এবং সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে আবিওয়ার্দের মধ্যে দিয়ে নিশাপুরের দিকে পিছিয়ে আসলেন।[২]

মাসউদের নিশাপুরে প্রবেশ

৪৩১ হিজরীর রবিউস সানীতে (১০৩৯ খৃঃ) মাসউদ নিশাপুরে প্রবেশ করেন। তুগরীল যে সিংহাসনে বসেছিলেন, তিনি সেটি বেদিসহ টুকরো টুকরো করে ফেলেন এবং সেস্থানে নতুন করে দরবার বসান। কিন্তু তখন নিশাপুর আর পূর্বের নিশাপুর ছিল না যার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণে গোটা খুরাসান গর্ব করতো।

---

১. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৭৫৬–৭৫৭ ; রাহাতুস সুদূর, পৃষ্ঠা-১০০; ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯২
২. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৭৫৮–৭৬১

www.bjilibrary.com

কয়েক বছরের যুদ্ধাবস্থা তার ঐশর্যকে ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছিলো। মানুষ তাদের ঘরের দরযা ও আসবাবপত্র পর্যন্ত বেচে খেতে বাধ্য হয়েছিলো। দুর্ভিক্ষ, খাদ্য শস্যের উচ্চ মূল্য এবং পশু খাদ্যের অভাব সীমাহীন পর্যায়ে পৌঁছেছিলো। এক সময় শাদিয়াগের নিকটবর্তী মুহাম্মাদ আবাদের এক যরীব ভূমি তিন হাজার দিরহামে বিক্রি হতো। কিন্তু এ যুদ্ধের ফলে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, সেই ভূমিই মাত্র এক মন গমের বদলে বিক্রি হচ্ছে। পশু খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তার সন্ধানে মানুষকে উটের পিঠে উঠে দামগান পর্যন্ত যেতে হতো।[১]

করুণ প্রত্যাবর্তন

এ দুর্ভিক্ষ শুধু নিশাপুর নয় বরং সমগ্র খুরাসানকে গ্রাস করেছিলো। গজনীর সেনাবাহিনী এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারলো না। আর এ কারণেই বাধ্য হয়ে মাসউদকে জমাদিউস সানীর শেষ ভাগে নিশাপুর ত্যাগ করতে হলো। তিনি তূস যেতে মনস্থ করলেন। পথিমধ্যে খাদ্য শস্য ও পশু খাদ্যের স্বল্পতার কারণে সেনাবাহিনীর বহু লোক এবং পশু মৃত্যু মুখে পতিত হলো। সৈন্যরা আশেপাশের জনপদে প্রবেশ করতো এবং কোথাও খাদ্য শস্যের নাম সন্ধান পেলেও ঝাঁপিয়ে পড়তো। তা সত্ত্বেও সৈন্যরা অনাহারে মারা যাচ্ছিলো। তূস নগরেও যখন নিরাপত্তা পাওয়া গেল না তখন সেনাবাহিনী ঘাবড়িয়ে গেল এবং সারাখ্স অভিমুখে যাত্রা করলো। পথিমধ্যে এতো পশু মারা গেল যে, তার সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সারাখ্সে পৌঁছার পর জানা গেল এখানেও পানি, খাদ্য ও পশু খাদ্যের দুর্ভিক্ষ চলছে। আমীর ও উযীরগণ হাজির হয়ে আরয করলেন যে, এখন এখান থেকে হিরাত যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কারণ, হিরাত দুর্ভিক্ষ মুক্ত এলাকা এবং বাদাগীস এলাকায় প্রচুর পশু খাদ্য আছে। সেখান থেকে সৈন্যরা আবার যখন চাঙ্গা হয়ে উঠবে তখন হামলা করা যাবে। কিন্তু মাসউদ অত্যন্ত রূঢ়তার সাথে এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে বললেন ঃ আমি মার্ভে গিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করবো। পারিষদবর্গ ফিরে এসে পুনরায় দুইজন বিশেষ পারিষদকে এ বলে পাঠালেন যে, বর্তমানে মার্ভে গেলে মারাত্মক ধ্বংসের আশংকা রয়েছে, এ সময় হিরাত যাওয়ার চাইতে উত্তম আর কিছু নেই। কিন্তু মাসউদ তাদেরকে তিরস্কার করে বললেন ঃ "তোমরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছো। তোমরা চাও আমি কষ্ট করি আর তোমরা চুরি করতে থাকো। আমি তোমাদেরকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে চাই, যেখানে তোমরা সবাই মৃত্যু মুখে পতিত হবে এবং তোমাদের বিশ্বাস ভঙ্গের হাত থেকে আমি মুক্তি লাভ করবো।" এই জবাবে আমীরদের মন ভেঙ্গে গেল এবং সবাই বাধ্য হয়ে

১. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৭৬১-৭৬৪।

www.bjilibrary.com

চুপ হয়ে গেলেন। উপরন্তু মাসউদ তাঁর সেনাধ্যক্ষ ও উযীরদের বাদ দিয়ে খাদেম ও মামুলি চাকর-বাকরদের সাথে পরামর্শ করতে শুরু করলেন এবং তাদের সামনে সালতানাতের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সমালোচনা করলেন। এসব ঘটনা তাদের মন আরো ভেঙ্গে দিল। এক বৃদ্ধ তুর্কী সেনাধ্যক্ষকে মাসউদ খুবই সম্মান করতেন। তাই বাদশাহকে সঠিক পথে আনার শেষ ব্যবস্থা হিসেবে উক্ত সেনাধ্যক্ষকে পাঠানো হলো, যাতে তিনি তাঁকে মার্ভ গমন থেকে বিরত রাখেন। কিন্তু মাসউদ তার কথাও প্রত্যাখ্যান করলেন এবং রমযানের দুই তারিখে মার্ভ অভিমুখে যাত্রা করলেন।[১] অবস্থা ছিল এই যে, গোটা সেনাবাহিনী তাপদাহ ও ক্ষুধার জ্বালায় মারা যাচ্ছিলো। পশুপাল খাদ্যের অভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছিলো, বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ এবং সালতানাতের উযীরবর্গ বাদশাহর এই স্বেচ্ছাচারিতায় ভগ্ন হৃদয় হয়ে পড়েছিলো। তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাদশাহর আনুগত্য করছিলো এবং সংগ দিচ্ছিলো। এ পরিস্থিতির মধ্যেই সালজুকরা এসে হাজির হলো এবং ধ্বংস প্রায় সেনাবাহিনীর ওপর অতর্কিতে হামলা চালাতে শুরু করলো। তারা গজনীর সেনাবাহিনীর অনুসরণ করে চলতো এবং যেখানেই সুযোগ পেতো হামলা করতো। তারা এভাবে যে কোনো দিক থেকেই কয়েকবার চড়াও হলো, মালামাল লুটপাট করলো, লোকজনকে হত্যা করলো এবং পশুপাল হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। তাদের আক্রমণে মাসউদের বাহিনী এমন ভীত-সন্ত্রস্ত ও সাহসহারা হয়ে পড়লো যে, সালজুকরা তাদের চোখের সামনেই পশুগুলোকে খুলে নিয়ে যেতো কিন্তু তারা তাদেরকে কিছুই বলতো না। বিশেষ করে সেনাবাহিনীর হিন্দু সৈন্যরা এতই হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলো যে, দশজন তুর্কমানকে দেখে তাদের পাঁচ শ' লোকও পালিয়ে আসতো। মাসউদ হিন্দু ও গজনবী সৈন্যদের অফিসারদের ডেকে এই ভীরুতার জন্য তিরস্কার করলেন। জবাবে তারা বললো ঃ মানুষ ও ঘোড়া ক্ষুধার জ্বালায় দুর্বল হয়ে পড়ছে। ঘোড়ার দৌড়ানোর শক্তি এবং মানুষের যুদ্ধ করার শক্তি নেই। এ পরিস্থিতিতে কিভাবে মোকাবিলা করা যায়?[২]

মাসউদের চরম পরাজয়

এখন মাসউদ মার্ভে আগমনের পরিণতি বুঝতে পারলেন। অনেক অনুশোচনা করলেন এবং পুনরায় হিরাতে ফিরে যেতে চাইলেন। কিন্তু পারিষদবর্গ বললেন, এখন ফিরে গেলে প্রভাব আরো খর্ব হবে। পরিণতি যাই হোক না কেন, মোকাবিলা করা দরকার। শেষ পর্যন্ত খোলা জায়গায় অবস্থান নিয়েই মানুষ তার বাহিনীকে নতুন করে ঢেলে সাজালেন এবং দ্রুততার সাথে

১. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৭৬৬-৭৭২।
২. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৭৭৩-৭৮০।

www.bjilibrary.com

মার্ভের দিকে অগ্রসর হলেন, যাতে অতিসত্তর সেখানে পৌছে বাহিনীকে চাঙ্গা করে নিতে পারেন। সালজুকরা উপলব্ধি করে ফেলেছিলো যে, মার্ভে পৌছলে শিকার হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই তারা দান্দানকানের[১] সন্নিকটস্থ উন্মুক্ত প্রান্তরেই একযোগে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। গজনীর সৈন্যরা লড়াই এড়িয়ে চলছিলো। তাই এ আকস্মিক আক্রমণের প্রচণ্ডতা সইতে পারলো না, প্রথম আক্রমণেই পালাতে শুরু করলো। মাসউদ একটি ছোট্ট বাহিনীর সাথে একাকী যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে গেলেন। কিন্তু ছিলেন অত্যন্ত সাহসী এবং ভয়ংকর শক্তিশালী ও তরবারি যোদ্ধা। তিনি দৃঢ়পদে বীরদর্পে লড়ছিলেন। যেদিকেই অগ্রসর হচ্ছিলেন সেদিকেই কাতারের পর কাতার নিশ্চিহ্ন করে ফেলছিলেন। কিন্তু সংখ্যাধিক্যের মোকাবিলায় কিছুই করতে পারলেন না। তাই পালাতে বাধ্য হলেন। কারণ, আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই নিশ্চিত বন্দী হতেন। যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে সোজা গৌর এলাকায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে অত্যন্ত নিসম্বল অবস্থায় ঈদ করলেন এবং পরে সেখান থেকে বিধ্বস্ত অবস্থায় গজনী পৌছলেন। গজনীর অধীবাসীরা আর কখনো কোনো বাদশাহকে এরূপ করুন অবস্থায় কোথাও প্রবেশ করতে দেখেনি।

এ যুদ্ধ মার্ভ ও সারাখসের মধ্যবর্তী স্থানে ৪৬১ হিজরী রমযানের শেষভাগে (১০৪০ খৃঃ) সংঘটিত হয়। এতে সুলতান মাসউদের বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়, সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম সালজুকদের হস্তগত হয় এবং খুরাসানের ভাগ্যের ফায়সালাও চিরদিনের জন্য হয়ে যায়।[২]

তুগরীলের শাহী ঘোষণা

মাসউদের পলায়নের সাথে সাথে সালজুকরা বিজয় ধ্বনি দিতে থাকে এবং তাদের নেতারা অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে মাটিতে শুকরিয়া জ্ঞাপক সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। এরপর মরুভূমিতে তাঁবু স্থাপন করে সিংহাসন পাতা হয় এবং তুগরীল সিংহাসনে বসেন। সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাকে খুরাসানের বাদশাহ হিসেবে সালাম পেশ করে। অগণিত গনীমতের মাল উদারভাবে বন্টন করা হয়। তুর্কীস্তানের খান এবং মধ্য এশিয়া প্রভৃতি এলাকার বাদশাহদের নামে বিজয়ের খবর জানিয়ে পত্র লেখা হয় এবং খুরাসানের অধিবাসীদেরকে এক বছরের রাজস্ব মাফ করে দেয়া হয়।[৩] অতপর তুগরীল তার খান্দানের লোকদের একত্রিত করে পরস্পর সহমত ও ঐক্যের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন।

---

১. এ স্থানটির নামের ব্যাপারে মতভেদ আছে। কেউ কেউ এটিকে, দান্দানকাদ বলে উল্লেখ করেছেন আবার কেউ কেউ দান্দানকান বলেছেন। তবে দান্দানকানই অধিক বিশুদ্ধ।

২. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৭৮১, ৭৮৬, ৭৯১, ৭৯৫; ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০১; রাহাতুস সুদূর, পৃষ্ঠা-১০০, যয়নুল আখবার- ১০৭-১০৮।

৩. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৭৮৭-৭৮৮; ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০১, আবুল ফিদা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৪

www.bjilibrary.com

কথিত আছে যে, এ সময় তুগরীল তার ভাইয়ের হাতে তীর দিয়ে বললেন, এটি ভেঙ্গে ফেলো। সে বিনা দ্বিধায় সেটি ভেঙে ফেললো। তারপর দু'টি তীর দিলে সে ঐ দু'টি তীরও ভেঙে ফেললো। অতপর তিনটি তীর দিলে সে বেশ কষ্ট করে সেটি ভাঙতে সক্ষম হলো। কিন্তু চারটি তীর দিলে সে কোনোক্রমেই তা ভাঙতে সক্ষম হলো না। তখন তুগরীল বললো ঃ আমাদের অবস্থাও এরূপ। আমরা যদি আলাদা আলাদা থাকি তাহলে শত্রু আলাদাভাবে প্রত্যেকের ওপর হামলা করবে এবং খুব সহজেই পরাস্ত করতে পারবে। কিন্তু আমরা যদি এক সাথে মিলেমিশে থাকি, তাহলে কোনো অতি শক্তিশালী শত্রুরও আমাদের ওপর হামলা করার ক্ষমতা হবে না। কেউ যদি হামলা করেও তাহলে সে নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে।[১]

মীর খোন্দ বর্ণনা করেন, এই যুদ্ধে মাসউদের বাহিনীর এক হাজার অফিসার সালজুকদের হাতে বন্দী হয়। সালজুকরা দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে মুক্ত করে দেয় এবং নিজেদের পক্ষ থেকে সওয়ারীর জন্য ঘোড়া, কাপড় এবং পথের সম্বল দিয়ে বাড়ী ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করে।[২]

খলীফার কাছে আবেদন

এ যুদ্ধের পর সালজুকরা খলীফা কায়েম বি আমরিল্লাহর খেদমতে একটি আবেদন প্রেরণ করেন। উক্ত আবেদনের বিষয়বস্তু ইবনুর রাওয়ানদী এভাবে উদ্ধৃতি করেছেন ঃ

> "আমরা সালজুক বংশের অনুগত ব্যক্তিবর্গ এমন এক গোষ্ঠীর লোক যারা সবসময় রাষ্ট্রের (আব্বাসীয়) এবং পবিত্র নবী (সা)-এর অনুগত ও কল্যাণকামী, সর্বদা জিহাদে ব্যস্ত এবং হজ্জ ও যিয়ারত আদায় করে আসছি। ইসরাঈল ইবনে সালজুক নামে আমাদের এক সম্মানিত ও বুযর্গ চাচা ছিলেন। ইয়ামীনুদ্দৌলা মাহমুদ ইবনে সবুক্তগীন তাকে বিনা অপরাধে বন্দী করে হিন্দুস্তানের কালিঞ্জর দুর্গে পাঠিয়ে দেন এবং সাত বছর যাবত বন্দী করে রাখেন। এমনকি সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে। আমাদের অন্যসব বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকেও তিনি দুর্গে বন্দী করে রাখেন। মাহমুদের

---

১. রাহাতুস সুদূর, পৃষ্ঠা-১০২; তারিখে গুজিদা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৬, ৪৩৭। প্রাচীন ইতিহাসসমূহে এ ধরনের কাহিনী বহুল পরিমাণে বর্ণনা করা হয় এবং এক একটি কাহিনী অনেক সময় একাধিক লোকের সাথে সম্পর্কিত করা হয়। সুতরাং এ কাহিনীও ইতিহাসে (তারিখে জাঁহা কুশায়) চেঙ্গিস খানের সাথে সম্পর্কিত। তবে এ ঘটনা যদি দু'টি স্থানে সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে তাও খুব একটা অসম্ভব কিছু নয়। কারণ, এ ধরনের জ্ঞানের কথা উপমা হিসেবে বর্ণনা করা প্রাচ্য মানসিকতার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

২. রাওদাতুস সাফা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৪, ইবনে আসীর যুদ্ধ বন্দীদের সংখ্যা উল্লেখ করেননি। তবে তিনিও বিষয়টি সমর্থন করেছেন।

www.bjilibrary.com

মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র মাসউদ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিনি দেশের কল্যাণের দিকে মনযোগ না দিয়ে খেলা-ধূলা ও রং তামাশায় মত্ত থাকেন। বাধ্য হয়ে খুরাসানের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাগণ তাদের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আমাদের কাছে আবেদন জানান। তার বাহিনী আমাদের মোকাবিলা করে। কিছুকাল আমাদের মধ্যে হাংগামা, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জয়-পরাজয় চলতে থাকে। পরিশেষে সৌভাগ্য আমাদের পানে মুখ তুলে হাসে। শেষবারে মাসউদ নিজে আমাদের মোকাবিলা করে পরাস্ত হন। মহান আল্লাহর সাহায্য এবং পবিত্র নবীর সৌভাগ্যের আনুকূল্যে আমরা বিজয়ী হই। মাসউদ পরাজিত ও অপদস্থ হয়ে ভূ-লুণ্ঠিত পতাকা নিয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে আমাদের জন্য সালতানাত রেখে যান। আমরা এ মহান দান ও সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ন্যায়বিচার ও ইনসাফের দাবি মনে করি। তাই আমরা যুলুম-অত্যাচারের নীতি পরিহার করেছি। এখন আমরা চাই, দীনের নিয়ম-পদ্ধতি ও আমীরুল মু'মিনীনের ফরমান অনুসারে এ কাজ আঞ্জাম পাক।"[১]

আবু ইসহাক কুকায়ীর মাধ্যমে এ পত্র প্রেরণ করা হয়েছিলো। এ সম্পর্কে ইমাদ কাতেব বলেন ঃ তিনি ছিলেন সুবক্তা ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এই দূতিয়ালির পরিণাম সম্পর্কে আমরা অধিক আর কিছু জানতে পারিনি। তবে দানদানকানের যুদ্ধের পরপরই যেহেতু সালজুকরা এ দূত প্রেরণ করেছিলেন, তাই বুঝা যায় যে, এই তুর্কমান বেদুঈনরা এ দেশের রাজনীতি ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলো। তারা এ বিষয়টিও উপলব্ধি করেছিলো যে, আমীরুল মু'মিনীনের নিকট থেকে দেশ শাসনের আইনগত পারোয়ানা লাভ করা ছাড়া কেবল মাত্র সামরিক বিজয়লাভের মাধ্যমে দারুল ইসলামের সুসভ্য অধিবাসীরা তাদের বৈধ শাসক হিসেবে স্বীকার করে নেবে না।

দেশের বিভক্তি

যেহেতু তিনজন সালজুক নেতা মিলে এদেশ দখল করেছিলো তাই পূর্ণাঙ্গ বিজয়ের পর তারা নিজেদের মধ্যে দেশ ভাগ করে নেয়া এবং প্রত্যেক নেতার জন্য বিজিত অঞ্চলের একটি নির্দিষ্ট অংশ ও ভবিষ্যত বিজয়ের এলাকাও নির্ধারণ করে দেয়া যুক্তিযুক্ত মনে করলো। সুতরাং উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে চাগরী বেগ দাউদের অংশে পড়লো। খুরাসানের গোটা উচ্চভূমি এলাকা যার রাজধানী ছিল মার্ভ পূর্ব ও উত্তরাঞ্চল তার সামরিক তৎপরতার জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হলো। মূসা বেগুর অংশে পড়লো বুস্ত, হিরাত, দক্ষিণ কোহিস্তান এবং

১. রাহাতুস সুদূর, পৃষ্ঠা-১০৩-১০৪ ; যুবদাতুন নুসরাদ (পৃষ্ঠা-৮)-ও এ পত্রের সারকথা উল্লেখ করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

সিস্তানের আশপাশের এলাকা এবং তুগরীল বেগের অংশে দেয়া হলো নিশাপুর, জিবাল, কিরমান, কোহিস্তান, কারেম, ইরাক এবং সেদিকের সমস্ত অঞ্চল।[১]

বলখ বিজয়

যে চাগরী বেগের অংশে পড়েছিলো খুরাসানের পূর্ব ও উত্তর এলাকা, এসব ব্যবস্থাপনার পর তিনি ৪৩১ হিজরী শাওয়াল মাসের শেষভাগে মার্ভ থেকে অগ্রসর হয়ে বলখের ওপর হামলা করেন। সেখানে গজনীর শাসনকর্তার কাছে অল্পসংখ্যক সৈন্য ছিল। তিনি দূর্গের মধ্যে অবস্থান করে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে থাকেন এবং সাহায্যের জন্য সুলতান মাসউদের কাছে পত্র প্রেরণ করেন। খুরাসানের অবশিষ্ট এলাকা রক্ষা এবং নিজের সালতানাতের ক্ষতিগ্রস্ত ভাবমূর্তিকে পুনর্জীবনের চেষ্টা করার নিমিত্তে এটা ছিল সুলতান মাসউদের জন্য শেষ সুযোগ। সালতানাতের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাগণ বলখের সাহায্যের জন্য বিশাল বাহিনী নিয়ে তাঁকে সশরীরে যেতে আবারো পরামর্শ দান করেন। কেননা, ঐসব অঞ্চল বে-দখল হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে শুধু তুখারিস্তান ও বদখশানেই হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার বিপদাশংকা ছিল না, বরং মধ্য এশিয়া (আমুদরিয়ার উত্তরে অবস্থিত সমগ্র অঞ্চল) এবং তুর্কিস্তানে গজনবীদের যেটুকু প্রভাব বর্তমান ছিল তাও চিরদিনের জন্য ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল। কিন্তু মাসউদ এ পরামর্শ অনুসারে কাজ করলেন না এবং একজন সেনাধ্যক্ষের নেতৃত্বে অল্পকিছু সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। ঐসব সৈন্য সালজুকদের সাথে সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা বলখে অবরুদ্ধ সৈন্যদের কোনো প্রকার সাহায্য করতে ব্যর্থ হয়। ৪৩২ হিজরীর (১০৪০ খৃঃ) মুহাররাম মাসে সুলতান মাসউদ সাহায্যকারী এই সেনাবাহিনীর পরিণতি সম্পর্কে জানতে পেরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তিনি উযীরে আযম খাজা আহমদ আবদুস সামাদের সাথে শাহজাদা মাওদূদকে বিশাল একটি সেনাবাহিনী দিয়ে বলখে প্রেরণ করেন এবং নিজে হিন্দুস্তানে পালিয়ে যেতে স্থির সংকল্প করেন। তার মনে সালজুক ভীতি এতটাই বদ্ধমূল হয়েছিলো যে, তিনি তাদের মোকাবিলায় বলখ তো দূরের কথা গজনীকেও অরক্ষিত মনে করতেন। তিনি সবসময় আশংকা করতেন যে, কখন যেন তারা রাজধানীর ওপর আক্রমণ করে অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল ধরে সঞ্চিত ধন-সম্পদ লুটে নিয়ে যাবে। তাই গজনীকে শেষবারের মত উপভোগ করার জন্য তিনি বাগে পায়রোজীতে শরাব পানের

---

১. রাহাতুস সুদূর, পৃষ্ঠা-১০৪, যুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-৮; তারিখে গুযীদাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৭; রাওদাতুস সাফা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৩; ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৪। দেশের এই বিভক্তিকরণ *সম্পর্কে সমস্ত বর্ণনা উৎসের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ আছে। কিন্তু আমি সবার বর্ণনা থেকে একটি মধ্যপন্থী মত গ্রহণ করেছি যা সকল ঐতিহাসিক বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।*

www.bjilibrary.com

আসর বসান। বায়হাকী তার ইতিহাস গ্রন্থে মাতলামির চোখে দেখা অবস্থার চিত্র অংকন করেছেন এভাবে ঃ এরপর তিনি স্বর্ণ, রৌপ্য এবং মূল্যবান সব সম্পদ একত্রিত করে তা সওয়ারীর পিঠে চাপাতে মহলের মহিলাদেরকে নিজ নিজ বোচকা-পেটরা প্রস্তুত করতে এবং পসন্দের কোনো জিনিস গজনীতে ফেলে না যেতে নির্দেশ দেয়। সুলতানের মা তাঁকে এ সংকল্প থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করলে তিনি তাকে বলেন ঃ কেউ শত্রুর হাতে বন্দী হতে চাইলে খুশীতে গজনীতে পড়ে থাকতে পারে। বলখ অভিযানে ব্যস্ত উযীরে আযম এ খবর পেয়ে বিচলিত হয়ে লিখলেন যে, এভাবে হিন্দুস্থানের দিকে যাত্রা করায় অবশিষ্ট মর্যাদাটুকুও ভূলুণ্ঠিত হয়ে যাবে এবং দেশের যেসব অঞ্চল এখনো অবশিষ্ট তাও হাতছাড়া হবে। কিন্তু মাসউদ বললেন ঃ বুড়োর বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। আমি যে কথা ভেবেছি তাই ঠিক। শেষ পর্যন্ত সবাই চুপ হয়ে গেলেন এবং সুলতান ৪৩২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে হিন্দুস্থান অভিমুখে যাত্রা করলেন।[১] স্বর্ণ, রৌপ্য ও মনি-মুক্তার প্রাচুর্য দেখে পথিমধ্যে সৈন্যরা লোভাতুর হয়ে পড়লো। চোখের সামনে এত প্রচুর পরিমাণ ধন-সম্পদ গাধা ও উটের পিঠে চাপানো দেখে ধৈর্যধারণ করা তাদের জন্য কঠিন ছিল। তাই বাধ্য হয়ে সবাই একযোগে ধন-ভাণ্ডারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সবকিছু লুটে নেয়। কিন্তু সুলতান মাসউদ তাদের এ অপরাধ কখনো ক্ষমা করবেন না একথা ভেবে তারা সুলতানের সহযাত্রী বন্দী ভাই আমীর মুহাম্মাদকে মুক্তিদান করে বাদশাহ বানিয়ে নেয় এবং সুলতান মাসউদকে অবরুদ্ধ করে। তাদের মোকাবিলা করার শক্তি মাসউদের ছিল না। তিনি ক্ষুদ্র একটি দল নিয়ে প্রতিরোধ করতে থাকনে। শেষ পর্যন্ত ১৫ই রবিউল আউয়ালে তিনি ভাইয়ের আনুগত্য মেনে নেন। ভাই তাঁকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন এবং সন্তান ও পরিবার-পরিজনসহ একটি দূর্গে[২] বন্দী করে রাখেন। কিন্তু মাসউদের শত্রুরা আমীর মুহাম্মাদের পুত্র আমীর আহমদের সাথে ষড়যন্ত্র করে ৪৩২ হিজরীর ১১ই জমাদিউল উলা (১০৪১ খৃষ্টাব্দ) তারিখে আমীর মুহাম্মাদের অনুমতি ছাড়াই হত্যা করিয়ে ফেলে।[৩]

---

১. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৮০৬, ৮৩৩; যায়নুল আখইয়ার, পৃষ্ঠা-১০৮, ১০৯ ; ইবনে আসীর ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০১, ২০২। শেষোক্ত দুইজন ঐতিহাসিকই মাসউদের হিন্দুস্থান যাত্রার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে ঃ তাঁর পিতার আমল থেকেই নিয়ম ছিল শীতকাল হিন্দুস্থানে কাটানো। তাছাড়া তিনি ভারত থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে আনতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক বায়হাকী সকল ঘটনা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন যা সবিস্তার পাঠের পর বুঝা যায় যে, তিনি সালজুকদের ভয়ে অত্যন্ত হতাশ হয়ে পালিয়েছিলেন।

২. গারদিযী ঐ দুর্গের নাম কিসরা বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনে আসীর কায়কী, আবুল ফিদা কায়দী এবং বায়হাকী কায়রী বলে উল্লেখ করেছেন।

৩. যায়নুল আখবার, পৃষ্ঠা-১০৯, ১১০ ; ইবনুল আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০২; আবুল ফিদা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৫।

www.bjilibrary.com

এসব ঘটনার ফল হয় এই যে, বলখ রক্ষার জন্য যে বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিলো তারা মানসিকভাবে পরাভূত হয়ে যায়। আমীর মওদূদ পিতার হত্যা ও চাচার ক্ষমতা দখলের খবর পেয়ে অশান্ত চিত্তে জন্মভূমির দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং বলখের অধিবাসীরা চাগরী বেগ দাউদের আনুগত্য গ্রহণ করলেন।[১]

স্বল্প সময়ের গৃহযুদ্ধের পর আমীর মওদূদ চাচাকে হত্যা করে গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করলে দেখতে পেলেন যে, অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পাল্টে গেছে। অর্থাৎ খুরাসানের সাথে তুখারিস্তান ও সিস্তানেরও একটি বিরাট অংশ হাতছাড়া হয়ে গেছে। এ ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য তিনি নিজেই প্রথমে চেষ্টা চালালেন। ৪৩৫ হিজরীতে একটি বিশাল সেনাবাহিনী দিয়ে খুরাসানের ওপর আক্রমণ চালালেন। কিন্তু চাগরী বেগ দাউদের পুত্র আল্প আরসালান একটি প্রচণ্ড আক্রমণের সাহায্যে এ বাহিনীকে পরাস্ত করে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন।[২] এরপর আমীর মওদূদ অন্যদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তারা যদি সালজুকদের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করে, তাহলে তিনি তাদেরকে খুরাসানের জেলাসমূহের অংশ প্রদান করবেন। তার এ ঘোষণায় প্রভাবিত হয়ে ইস্পাহানের শাসক আবু কালিজার কারশাফ ইবনে আলাউদ্দৌলা পশ্চিম দিক থেকে এবং খাকান তুর্কীরা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে খুরাসানের ওপর আক্রমণ চালালেন এবং আমীর মওদূদের নিজের পক্ষ থেকে আবদুর রাজ্জাক ইবনে আহমদ মায়মানদী সিস্তান অভিমুখে অগ্রসর হলেন। কিন্তু ইস্পাহানের সেনাবাহিনী খুরাসানের মরুপ্রান্তরে বিধ্বস্ত হয়ে গেল, খাকান তুর্কীদের সেনাবাহিনী তিরমিয পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে লুটপাট করে ফিরে গেল এবং আবদুর রাজ্জাক সিস্তানে কোনো সফলতা অর্জন করতে পারলেন না।[৩] এটা ছিল সালজুকদের বিরুদ্ধে গজনীর শাসকদের শেষ প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার সাথে সাথে এ দু'টি সাম্রাজ্যের মধ্যে কার্যত যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলো। এর কয়েক বছর পরে সুলতান ইবরাহীম ইবনে মাসউদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৪৫১ হিজরী মোতাবেক ১০৬০ খৃষ্টাব্দ সালজুক শাসক দাউদের সাথে এ শর্তে সন্ধি করেন যে, দু'টি সালতানাতই তার নিজ নিজ অধিকৃত অঞ্চল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে এবং পরস্পরের প্রতি শত্রুতা পোষণ থেকে বিরত থাকবে।[৪]

---

১. ইবনুল আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০১; রাওদাতুস সাফা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৪।

২. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৫, ২১৬।

৩. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩২।

৪. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২।

www.bjilibrary.com

খাওয়ারিজম অধিকার

বলখ বিজয়ের সাথে সাথে গজনীর পক্ষ থেকে বিপদের আশংকা প্রায় চিরদিনের জন্যই তিরোহিত হয়েছিলো। এ কারণে চাগরী বেগ বলখ থেকে অগ্রসর হয়ে জায়হুন নদীর তীরে ছাউনি ফেললেন এবং খাওয়ারিজমের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। এ রাজ্যটির রাজনৈতিক অবস্থা বাইরের আক্রমণ সফল হওয়ার ইংগিত দান করছিল। খাওয়ারিজম শাহ আলতুনতাশের মৃত্যুর পর সেখানে যে বিপ্লব দেখা দেয়, আমরা পূর্বের অধ্যায়ে সে ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করেছি। আলতুনতাশের স্থলাভিষিক্ত হারুন গজনীর সালতানাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সালজুকদের সাথে যোগসাজশ করে এবং মাওয়ারাউন নাহর বা ট্রান্স অক্সাইনের অন্যসব আমীরদের সাথে একত্রে খুরাসান অধিকার করতে চাচ্ছিলো। কিন্তু ৪২৬ হিজরীর জমাদিউস সানী মাসে গজনীর রেসিডেন্ট আবদুল জব্বারের ষড়যন্ত্রে সে মারা যায় এবং তদস্থলে তার ভাই ইসমাঈল সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইসমাঈল আবদুল জব্বার থেকে ভাইয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং তাকে হত্যা করে গজনীর অধীনতা পাশ থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা লাভ করেন। সেই সময় সালজুক সমস্যা গজনবী সালতানাতকে এমনভাবে অস্থির করে রেখেছিলো যে, তারা খাওয়ারিজমের প্রতি মনযোগই দিতে পারেনি। ফলে কয়েক বছর ধরে এ রাষ্ট্রটি পুরোপুরি স্বাধীনতা ভোগ করে। কিন্তু যে সময় সুলতান মাসউদ সালজুকদের হাতে পরাজিত হয়ে গজনী ফিরে আসেন তখন তার মস্তিষ্কে একটি চিন্তার উদ্ভব ঘটে। অর্থাৎ সালজুকদের পূরাতন শত্রু শাহ মালেককে ইসমাঈলের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিতে হবে এবং খাওয়ারিজম হুকুমতের পরোয়ানা দিয়ে তার সাহায্যে শুধু আলতুনতাশ খান্দানের মূলোৎপাটন করাতে হবে তাই নয়, বরং পরবর্তী সময়ে সালজুকদের বিরুদ্ধেও তাকে ব্যবহার করতে হবে। অতএব গজনী থেকে শাহ মালেকের নামে খাওয়ারিজম হুকুমাতের পরোয়ানা প্রেরণ করা হলো এবং তাকে জানিয়ে দেয়া হলো যে, তুমি ঐ দেশের বৈধ শাসক। ইসমাঈলকে পরাভূত করে সেখানে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠার অধিকার তোমার রয়েছে। এই ফরমান অনুসারে ৪৩২ হিজরীর জমাদিউস সানী মাসে শাহ মালেক খাওয়ারিজমের ওপর আক্রমণ করে। ইসমাঈল খান্দা ও তার উযীর শোকর খাদেম অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তার মোকাবিলা করে। তিনদিন ধরে দিবারাত্রি ব্যাপী যুদ্ধ চলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত শাহ মালেক বিজয়ী হন এবং শহর অধিকার করে তিনি সুলতান মাসউদের নামে খুতবা জারি করেন। অথচ তখন মাসউদ নিহত হওয়ার পর কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত হয়েছে। এদিকে ইসমাঈল এবং শোকর খাদেম আশ্রয়লাভের জন্য পালিয়ে সালজুকদের কাছে চলে আসে। দাউদ এখানে আগে থেকেই আমুদরিয়ার তীরে অবস্থান

www.bjilibrary.com

নিয়ে গভীরভাবে খাওয়ারিজমের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি তাদের দু'জনকেই সাদরে গ্রহণ করলেন এবং তাদের সাহায্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে খাওয়ারিজমের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করলেন। কিন্তু শাহ মালেক এমন দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করলেন যে, তাকে পশ্চাদাপসারণ করতে হলো।

খাওয়ারিজমের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান থেকে ফিরে এসে দাউদ পূর্ণ শক্তিতে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলেন এবং ঐ দেশটি অধিকারের অভিযানে শরীক হওয়ার জন্য তুগরীল বেগকেও আহ্বান জানালেন। সুতরাং ৪৩৪ হিজরী মোতাবেক ১০৪২ খৃষ্টাব্দে উভয়ে মিলে পুনরায় খাওয়ারিজমের ওপর আক্রমণ করলেন। এবারও কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কিন্তু সালজুকদের সামরিক কৌশল শেষ পর্যন্ত বিজয় লাভ করে এবং তাদের হাতে দেশ ছেড়ে দিয়ে শাহ মালেককে পালিয়ে যেতে হয়।[১] প্রথমত ইসমাঈল খান্দা ও শোকর খাদেমের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে এ যুদ্ধ শুরু করা হয়েছিলো, কিন্তু পরে কোন বিষয়ে তাদের সাথে বিবাদ হয় এবং সালজুকরা তাদের দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের জন্যই খাওয়ারিজম দখল করে।[২]

চাগরী বেগ সম্পর্কে ইতিহাস গ্রন্থসমূহ থেকে আমরা এসব তথ্য জানতে পারি। এরপর আমরা তুগরীল বেগের কৃতিত্ব সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো।

রায়, হামদান, জুরজান ও তাবারিস্তান অধিকার

দান্দানকানের যুদ্ধে বিজয়লাভের পর সালজুক আমীরদের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্য যেভাবে বণ্টিত হয়েছিলো সে অনুসারে নিশাপুর এবং তার পশ্চিমের গোটা এলাকা তুগরীলের অংশে পড়েছিলো তা আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। তিনি নিশাপুর আগমন করে প্রথমেই অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ঠিকঠাক করলেন এবং পরে তার ভাই ইবরাহীম ঈনালকে সৈন্য দিয়ে জিবাল অঞ্চলে প্রেরণ করলেন। এখানে পৌঁছে ইবরাহীম বনু যাকওয়াইয়ার নিকট থেকে রায় ও হামদান এলাকা অধিকার করলেন। অপর পক্ষে তুগরীল নিজে জুরজান ও তাবারিস্তান অভিমুখে অগ্রসর হলেন। এখানে আনুশিরওঁয়া ইবনে মনুচেহের ইবনে কাবূস[৩] ইবনে দাশ্‌মাগীর ও তার সেনাপ্রধান আবু কালীজার ইবনে দীহান আল কূহীর মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছিলো। তুগরীল তাদের এই

---

১. ইবনুল আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১০–২১১ ; বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৮৫৮, ৮৬৭ ; রাওদাতুস সাফা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৪।

২. বায়হাকী, পৃষ্ঠা-৮৬৭।

৩. কাবূস ইবনে দাশমাগীর সামানীদের পক্ষ থেকে জুরজানের শাসক ছিলেন। এ এলাকার শাসন ক্ষমতা সালজুকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত তাদের বংশের হাতেই ছিল এবং তিনি স্বাধীন মর্যাদা নিয়েই তা শাসন করতেন।

www.bjilibrary.com

আত্মকলহের সুযোগ গ্রহণ করেন এবং বিনাবাধায় দু'টি প্রদেশই অধিকার করে নেন। এলাকার অধিবাসী এক লাখ দীনার প্রদান করে তার বিনিময়ে প্রাণ ও সম্পদের নিরাপত্তা লাভ করে। মারদাবীজ ইবনে বাস্‌সুকে[১] এই গোটা অঞ্চলের গভর্নর নিয়োগ করা হয়। বাৎসরিক পঞ্চাশ হাজার দিরহাম ভূমিকর আরোপ করা হয় এবং সমগ্র অঞ্চলে তুগরীল বেগের নামে খুতবা পাঠ করা হয়।[২] এটা ৪৩৩ হিজরী (১০৪১ খৃষ্টাব্দ) এবং ৪৩৪ হিজরী (১০৪২ খৃষ্টাব্দ)-এর ঘটনা।

জিবাল অধিকার

তাবারিস্তান ও জুরজান অধিকারের পর তুগরীল উত্তর দিকে অগ্রসর হন এবং খাওয়ারিজমের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযানে দাউদকে সাহায্য করেন একথা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে ৪৩৪ হিজরীতে দেহিস্তান, জুরজান এবং তাবারিস্তান হয়ে রায়-[৩] এ উপনীত হন এবং ইবরাহীমকে সিজিস্তান অভিমুখে প্রেরণ করে নিজের হাতে ইরাকে আজমের কমাণ্ড গ্রহণ করেন। এখানে তিনি সর্বপ্রথম রায়কে পুনর্নির্মাণ করেন। কারণ, শহরটি যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো। নির্মাণকালে দারুল ইমারা (গভর্নমেন্ট হাউস) থেকে স্বর্নের জড়োয়া অনেক নৌকা এবং মূল্যবান মনি-মুক্তায় ভর্তি চীনামাটির দু'টি ভাণ্ড এবং আরো অনেক প্রকার মূল্যবান মাল তিনি লাভ করেন। এ কাজ সম্পন্ন করার পর তিনি রাষ্ট্রের বিস্তৃতি সাধনের দিকে মনযোগ দেন। কাযবীন আক্রমণের সময় ৮০ হাজার দীনার মূল্যের সংরক্ষিত ধন-সম্পদ হস্তগত হয় এবং সেখানকার শাসক কামরু বাৎসরিক ২৭ হাজার দীনার ভূমিকর এবং উপহার-উপঢৌকন প্রেরণ করে। ইস্পাহানের শাসনকর্তা ফারামুয ইবনে আলাউদ্দৌলা ইবনে কাকওয়াই নিজে তুগরীলকে বিপুল পরিমাণ মাল দিয়ে নিরাপত্তা লাভ করলেন, যাতে তুগরীল সে দিকে অগ্রসর না হয়। অথচ তা খুব একটা বেশী সময় স্থায়ী হওয়ার ছিল না।[৪] এভাবে এক বছরের মধ্যে সমগ্র আলজিবাল এলাকার ওপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং ইস্পাহান তার প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে।

বুওয়াইহিয়া শাসনের সাথে সমঝোতা

এ সময় তুগরীলের সালতানাতের সীমা বুওয়াইহিয়া সাম্রাজ্যের সীমা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিলো এবং এই দুঃসাহসী বিজেতার সাম্রাজ্যের সীমান্তের

১. ইবনে আসীর কোনো কোনো স্থানে তার নাম বাশ্‌শু বলে উল্লেখ করেছেন। তবে বাস্‌সু-ই বিশুদ্ধ উচ্চারণ।
২. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০৭, ২১১ ; আবুল ফিদা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৫; যুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-৮, ৯।
৩. বর্তমান তেহরান।
৪. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১২।

www.bjilibrary.com

সাথে কোনো সাম্রাজ্যের সীমান্তের সংলগ্নতার সুস্পষ্ট অর্থ ছিল আজ হোক বা কাল হোক উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য। এ কারণে খলীফা কায়েম বি আমরিল্লাহ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন এবং প্রধান কাজী আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাবীব আল মাওয়ার্দীকে সুলতান তুগরীলের কাছে প্রেরণ করেন যাতে তিনি তার মধ্যস্থতায় বুয়াইহিয়া সাম্রাজ্য ও সালজুক সাম্রাজ্যের মধ্যে সন্ধি ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত করে দেন। সেই সময় তুগরীল জুরজানে অবস্থান করছিলেন। প্রধান কাজী জুরজানের সন্নিকটবর্তী হলে তুগরীল বার মাইল পথ অগ্রসর হয়ে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান, অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করেন এবং খলীফার আনুগত্য করার ও আদেশ পালনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।[১] এ দূতিয়ালি করা হয় ৪৩৫ হিজরীতে,[২] যখন বুওয়াইহিয়া খান্দানের শাসক জালালুদ্দৌলা জীবিত ছিলেন। সন্ধির আলাপ-আলোচনা চলাকালীন সময়ে তিনি ইনতিকাল করেন। দূতিয়ালির কাজ ৪৩৬ হিজরীর এমন এক সময় শেষ হয়, যখন আবু কালীজার জালালুদ্দৌলার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। তুগরীল কোনো প্রকার সমঝোতা বা সন্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে ইবনে আসীর স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। তা সত্ত্বেও সবকিছু থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিবেশী দুই সালতানাতের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ধরনের কোনো চুক্তি অবশ্যই স্বাক্ষরিত হয়েছিলো যা খুববেশী দিন টিকতে পারেনি। যদিও আবু কালীজার নিজে সরাসরি সালজুকদের বিরক্ত করেননি। তথাপি যেহেতু দু'টি সালতানাতের সীমান্তে যেসব ছোট ছোট রাজ্য ছিল সেগুলো কখনো এদিকে এবং কখনো সেদিকে আনুগত্য প্রকাশ করে শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি করেছিলো। ৪৩৬ হিজরীতে জিবালের নেতা কারশাসিক ইবনে আলাউদ্দৌলা হামদানের ওপর আক্রমণ চালিয়ে সেখান থেকে তুগরীলের গভর্নরকে বহিষ্কার করে এবং আবু কালীজারের নামে খুতবা জারি করে। তাকে পরাভূত করার জন্য তুগরীল ৪৩৭ হিজরীর প্রারম্ভে ইবরাহীম ঈনালকে নির্দেশ দেন। ইবরাহীম কিরমানের দিক থেকে অগ্রসর হয়ে কারশাসিফের ওপর আক্রমণ করে এবং হামদান অধিকার করার পর তার নিকট থেকে একে একে দায়নাওয়ার, কারমায়সীন, হুলওয়ান ও সীরাওয়ান ছিনিয়ে নেন।[৩]

---

১. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৭-২১৮ ; তুগরীলের জীবন কাহিনীতে ইবনে খাল্লেকানও এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।

২. অন্য একটি স্থানে কাজী আবুল হাসানের নিজের জবানীতে ইবনে আসীর ও ইমাদ কাতেব উভয়েই এ বর্ণনাটি উদ্বৃত করেছেন যে, তিনি ৪৩৩ হিজরীতে সেখানে গিয়েছিলেন (ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১; যুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-১২৭)।

৩. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৯-২২০।

www.bjilibrary.com

৪৩৭ হিজরীর মুহাররাম মাসে ইস্পাহানের নেতা আবু মনসূর ফারামুয ইবনে আলাউদ্দৌলাও তুগরীলের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করে আবু কালীজারের আনুগত্য গ্রহণ করে সে আবু কালীজারকে পরিত্যাগ এ আশায় সালজুকদের কাছে গিয়েছিলো যে, এই নবীন সালতানাতের কাছে তার খুববেশী সমাদর হবে। এ আকাংখা পূরণ না হওয়ায় সে পুনরায় তার প্রথম প্রভুর আস্তানায় এসে হাজির হয়।[১] কিন্তু পরের বছরই তুগরীল একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়ে ইস্পাহান অবরোধ করে এবং এমতাবস্থায় বাধ্য হয়েই তাকে তার আনুগত্যের কেন্দ্রবিন্দু তুগরীলকেই বানাতে হয়।[২]

৪৩৮ হিজরী মোতাবেক ১০৪৬ খৃষ্টাব্দে কুর্দিস্তানের নেতা আবুশ্ শাওক এর মৃত্যুর পর তার ভাই মুহালহিল ইবনে মুহাম্মদ ৪৩৭ হিজরীতে ইবরাহীম ঈনাল কর্তৃক বিজিত এলাকার ওপর আক্রমণ করেন। হুলওয়ান, মায়েদাশত, দীনাওয়ার ও কারমায়সীনে তুগরীলের পক্ষ থেকে যেসব সৈন্য মোতায়েন ছিল তাদের মেরে বিতাড়িত করা হয় এবং কুর্দিস্তান সালজুকদের আধিপত্য থেকে মুক্ত করার সংকল্প করা হয়। জবাবে সালজুকরা আবুশ শাওকের পুত্র সা'দীকে নিজের পক্ষে ভিড়িয়ে ঘোষণা করে যে, তার পিতার রাজ্য তাকে দিয়ে দেয়া হবে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কুর্দি যারা আবুশ শাওক ও তার সন্তানদের প্রতি সমবেদনা অনুভব করতো এ ধরনের কর্মকৌশলের ফলে সালজুকদের সহযোগী হয়ে যায় এবং তারা সালজুক সৈন্যদের সাথে মিশে রবিউল আউয়াল মাসে মুহালহিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। ফলে কয়েক মাসের মধ্যেই সমগ্র কুর্দিস্তান অঞ্চল তার হাতছাড়া হয়ে যায় এবং তাকে যূর শহরের দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। আবু কালীজার এবং তার মন্ত্রীবর্গ ইরাকের বিরুদ্ধে সালজুকদের এই বাড়াবাড়ি দেখে সীমান্তে সৈন্য সমাবেশের নির্দেশ দেয় এবং এ সংকল্প পর্যন্ত করে যে, প্রয়োজনে মুহালহিলের সাহায্যেও দ্বিধা করা হবে না। কিন্তু সে সুযোগ আর আসেনি।[৩] পরের বছরই সা'দী সালজুকদের প্রতি রুষ্ট হয়ে পুনরায় আবু কালীজারের আনুগত্য গ্রহণ করলে এ অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়।[৪]

সন্ধিচুক্তির নবায়ন

একের পর এক সংঘটিত এসব ঘটনাবলীর ফলে পুনরায় এ আশংকা সৃষ্টি হয় যে, এ দু'টি বড় প্রতিবেশী সালতানাতের সীমান্তে অস্থিরতার কারণে

---

১. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২০।
২. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২২।
৩. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২১-২২২।
৪. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৩।

www.bjilibrary.com

সংঘাত বেধে না যায়। সুতরাং এ যাত্রা আবু কালীজার নিজেই সন্ধির জন্য তৎপরতা শুরু করেন এবং ৪৩৯ হিজরী মোতাবেক ১০৪৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান তুগরীলের কাছে একজন দূত প্রেরণ করেন যার প্রচেষ্টায় দু'টি সালতানাতের মধ্যকার বিবাদমান বিষয়সমূহের সমাধান হয়ে যায়। এ সমাধানের আলোকে তুগরীল বেগ তার প্রধান সেনাপতি ইবরাহীম ঈনালকে এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, তোমার অধিকারে যেসব এলাকা আছে তা রক্ষা করো এবং তোমার দখল বহির্ভূত এলাকার দিকে হস্ত প্রসারিত করো না।

এ সন্ধিচুক্তিকে আরো দৃঢ় করার জন্য এ সিদ্ধান্তও গৃহীত হয় যে, দু'টি শাসক পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সুতরাং ৪৩৯ হিজরীর রবিউস সানী মাসে আবু কালীজারের কন্যার সাথে তুগরীল বেগের এবং দাউদের কন্যার সাথে আবু কালীজারের পুত্র আবু মনসূরের বিয়ে সম্পন্ন হয়। এ বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে দু'টি পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক আরো অধিক গভীর হওয়ার সুফল অবশ্যই অর্জিত হয়েছে। কিন্তু এভাবে রাজনৈতিক জটিলতা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়নি। একই বছর রযব মাসে সালজুক সৈন্যরা সা'দী ইবনে আবুশ শাওকের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে। কারণ, সে তার আনুগত্য বর্জন করে আবু কালীজারের আনুগত্য গ্রহণ করেছিলো। বাজাস্‌রার সন্নিকটে সা'দী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন এবং তার বাহিনীর বড় অংশ ধ্বংস হয়ে যায়, তার সকল ধন-সম্পদ লুট করে নেয়া হয়। সা'দী নিজে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যান এবং সালজুক সৈন্যরা দাস্‌কারা, বাজাসরা, হারুনিয়া সাবুর প্রাসাদ ও বাগদাদের সম্মুখবর্তী সকল জিলায় চরম লুটপাট চালান। এসব ঘটনায় বাগদাদে একটা হৈচৈ পড়ে যায় এবং খোদ রাজধানীতে এ প্লাবনের ধাক্কা এসে লাগতে পারে এ আশংকায় বুওয়াইহিয়া সালতানাত প্রতিরোধের প্রস্তুতি শুরু করে।[১] যদিও ঐ সময় পর্যন্ত সালজুকদের মনে বাগদাদের ওপর হামলা করার কোনো অভিসন্ধি ছিল না, তাই দুই সালতানাতের মধ্যে কোনো বড় বা চূড়ান্ত সংঘাত হয়নি। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, সালজুক বাহিনীর এ শক্তি প্রদর্শন ও বাড়াবাড়ি চলছিলো বুওয়াইহি এলাকার মধ্যে। এ স্পষ্ট বাড়াবাড়িকে কোনো সালতানাতই মেনে নিতে পারতো না। ফলে আবু কালীজার নিজে আমেদে গিয়ে সেনা সংগ্রহ করলেন এবং সালজুকদের ওপর হামলা করে নিজের এলাকা থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করতে সচেষ্ট হলেন। এছাড়া হুলওয়া ও বুন্দনাহ ইয়ানেও তার ও সালজুক বাহিনীর মধ্যে দু' তিনটি যুদ্ধ হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সালজুকরাই বিজয় লাভ করে। আবু কালীজারের এই কর্মকাণ্ডে তুগরীল বেগকেও যুদ্ধের আশংকায়

১. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৪, ২২৫ ও ২২৬

www.bjilibrary.com

পেয়ে বসলো এবং তিনি নিজে রায় থেকে সীমান্তের দিকে চলে গেলেন। কিন্তু এ পর্যায়ে পৌঁছে পরিস্থিতি আপনা থেকেই শুধরে যায়। সালজুক সৈন্যদের মনযোগ ইরাক থেকে সীরওয়ানের দিকে নিবদ্ধ হয় ; কারণ সা'দী ইবনে আবু শাওকের লোকজন সেখানে বেশ কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করেছিলো। এভাবে একটি ভয়াবহ যুদ্ধের বিপদ কেটে যায়।[১]

সেই সময় সালজুক সেনাবাহিনী আলজিবাল ও উত্তর ইরাকে যে ধ্বংসযজ্ঞ ও সামরিক তৎপরতা চালায় তাতে বুওয়াইহিয়া সাম্রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে ব্যাপক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের হাজার হাজার অধিবাসী পালিয়ে বাগদাদে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা গুজ তুর্কমানদের নির্যাতনের এমন সব কাহিনী শুনায় যা শ্রবণ করে বাগদাদ ও ইরাকের জনমত তুর্কমানদের বিরুদ্ধে অনেকটা উত্তেজনাকর পর্যায়ে পৌঁছে এবং এ বিষয় নিশ্চিত হয়ে যায় যে, সালজুক ও বুওয়াইহি সালতানাতের মধ্যে আর বেশী দিন সন্ধি ও শান্তি অবস্থা টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে।[২]

রোমান ও আবখাযদের সাথে যুদ্ধ

৪৪০ হিজরীতে ট্রান্স অক্সাইন এলাকা থেকে গুজ তুর্কমানদের একটি বড় দল তুগরীল বেগের এলাকায় অনুপ্রবেশ করে। সালজুকরা ছাড়া আর কোনো কওমই ঐ জাতি সম্পর্কে অধিক জানতো না। তারা বুঝতে পারলেন যে, এই যুদ্ধবাজ ও বর্বর মানবগোষ্ঠী যেখানে যাবে সেখানেই হত্যা ও ধ্বংসের চূড়ান্ত করে ছাড়বে। তাই তারা এই বিপদের মুখ রোমের খৃষ্টান সাম্রাজ্যের দিকে ঘুরিয়ে দিল। তারা নিজেরাও যুদ্ধ করে যুদ্ধলব্ধ অর্থ অর্জন করতে চাচ্ছিলো। তাই অগ্রভাগে তাদের বিশাল দল এবং ইবরাহীম ঈনালের নেতৃত্বে সালজুক সেনাবাহিনী রোমের দিকে যাত্রা করে। জিবাল এলাকা সংলগ্ন আজারবাইজান অঞ্চল পদদলিত করে তারা আর্মেনিয়ায় প্রবেশ করে এবং মালাযগির্দ অধিকার করে।[৩] অতপর পশ্চিম ফোরাত তীরবর্তী আরযান আররূম অধিকার করে নেয় এবং সমগ্র কালীকালা অঞ্চল পদদলিত করে। এরা রোমান এলাকায় প্রবেশ করে এবং ট্রাবজন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। রোম সাম্রাজ্য এবং আবখায রাজ্য[৪] এ মহাপ্লাবন দেখে তা প্রতিরোধের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রস্তুত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু করে। কিন্তু যুদ্ধে

১. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৪, ২২৫, ২২৬।
২. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৪।
৩. এটি আর্মেনিয়া, রোম ও আলজাযীরা সীমান্তে অবস্থিত। একটি অতি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ঐতিহাসিকগণ স্থানটিকে মালাযে ফির্দ, মালাযে জিদ ও মানাযে বির্দ প্রভৃতি নামে উল্লেখ করেছেন।
৪. বর্তমান জর্জিয়ার প্রাচীন নাম আবখায।

www.bjilibrary.com

গুযরা বিজয়ী হয় এবং আবখাযের বাদশাহ্ কারীত নিজে বন্দী হন। অতপর এ প্লাবন অগ্রসর হতে হতে রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে এতদূর অগ্রসর হয় যে, কনষ্টান্টিনোপল থেকে মাত্র পনের দিনের দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে। অবশেষে রোম সম্রাট কাইজার তুগরীল বেগের কাছে দূত প্রেরণ করেন। দূত এসে মূল্যবান উপহার-উপঢৌকন পেশ করে উভয় সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আবেদন জানান। এছাড়াও তারা নাসরুদ্দৌলা ইবনে মারওয়ানকে মধ্যস্থতায় এনে আবখাযের বাদশাহর মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা চালান। এ ক্ষেত্রে তুগরীল অত্যন্ত বিচক্ষণতা এবং প্রখর রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে তাদের দু'টি আবেদনই মঞ্জুর করেন। তিনি কোনো প্রকার আর্থিক বিনিময় ছাড়াই আবখাযের বাদশাহকে মুক্ত করে দেন এবং ৪৪১ হিজরীতে (১০৪৯ খৃষ্টাব্দ) রোমান সাম্রাজ্যের সাথে যথারীতি চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তির ফলে রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে সালজুকদের অগ্রযাত্রা থেমে যায়। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কাইজার কনষ্টান্টিনোপলের মসজিদ নামাযের জন্য খুলে দিতে অনুমতি দান করেন। মুসলমানরা সেখানে স্বাধীনভাবে নামায আদায় করতে থাকে এবং তুগরীলের নামে খুতবা পড়া হতে থাকে।

এ যুদ্ধে সালজুকরা অঢেল গনীমতের মাল লাভ করেন। তাদের রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি আজারবাইজান, আর্মেনিয়া ও পশ্চিম ফোরাত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। গিরজিস্তান (জর্জিয়া) ও এশিয়া মাইনরে তাদের প্রভাবের বিস্তার ঘটে, নিকটবর্তী অ-ইসলামী সাম্রাজ্যসমূহের সাথে তাদের রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইতিপূর্বে ইসলামী দেশসমূহে ধ্বংসযজ্ঞের জন্য তাদের যে কুখ্যাতি হয়েছিলো তার পরিবর্তে কিছুটা উত্তম ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে।

বুওয়াইহিয়া খান্দানে অনৈক্য-

এ সময়ের মধ্যে বুওয়াইহিয়া খান্দানের শাসনের মধ্যে আরো বেশী বিকৃতি দেখা দেয়। ৪৪০ হিজরীতে আবু কালীজার ইনতিকাল করেন এবং তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে বুয়াইহিয়া খান্দানের অবশিষ্ট শেষ শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে যায়। তাঁর নয়জন পুত্র সন্তান ছিল। এদের মধ্যে ছয়জনই তাঁর মৃত্যুর সময় যুবক ছিল। অর্থাৎ আবু নসর খসরু ফিরোজ, আবু মনসূর ফালাসতূন, আবু তালেব কামরু, আবুল মুজাফফর বাহরাম, আবু আলী কায়খসরু ও আবু সা'দ খসরুশাহ। তাদের মধ্যে প্রথমোক্ত আবু নসর ছিলেন বাগদাদের তিনি সৈন্য সংগ্রহ করে আল মালেকুর রাহীম উপাধি ধারণ করেন এবং নিজেকে বাদশাহ ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় পুত্র আবু মনসূর ফালাসতূন তার আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জানান এবং সিরাজে তার নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। মালেক আর

১. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৬, ২২৭, ২৩১; আবুল ফিদা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৯।

www.bjilibrary.com

রাহীম তাকে পরাভূত করার জন্য একটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। এ বাহিনী শাওয়াল মাসে তাকে ও তার মাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে।[১] কিন্তু ফারেসের দায়লামী সেনাবাহিনী তার প্রতি আকৃষ্ট ছিল। তাই তাকে বেশীদিন বন্দী থাকতে হয়নি। ৪৪১ হিজরীর মুহাররম মাসে তিনি বন্দীখানা থেকে পালিয়ে গিয়ে ইসতাখার, আররাজান, সিরাজ প্রভৃতি এলাকা দখল করে গোটা ফারেস প্রদেশের ওপর পুনরায় নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন।[২] তারপর যুলকা'দা মাসে অগ্রসর হয়ে খুজিস্তানের ওপর আক্রমণ করেন। আল মিলহ উপত্যকায় মালেক আর রাহীমের সাথে তার মোকাবেলা হয়। মালেক আর রাহীম পরাজিত হন এবং আহওয়াকের ওপর ফালাসতূনের পতাকা উড্ডীন করা হয়।[৩] এভাবে বুওয়াইহিয়া সালতানাত দুই টুকরো হয়ে যায়। ফারেস আবু মনসূর ফালাসতূনের কর্তৃত্বাধীনে চলে যায়, বসরা ও ওয়াসিতসহ ইরাক মালেক আর রাহীমের অধিকারে থাকে এবং খুজিস্তান উভয়ের মধ্যে গৃহযুদ্ধের মল্লভূমিতে রূপান্তরিত হয়।

ইস্পাহান বিজয়

এ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তুগরীল ৪৪২ হিজরীতে মুহাররম মাসে (১০৫০ খৃষ্টাব্দ) ঐসব সীমান্ত রাজ্যের একটির বিলুপ্তি সাধন করেন যা বুওয়াইহিয়া ও সালজুক সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল এবং উভয় সাম্রাজ্যের সাথেই বিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতার খেলা খেলছিলো এটি ছিল ইস্পাহান রাজ্য। রাজ্যটির কাজকর্ম প্রথম থেকেই সন্দেহজনক ছিল। কখনো সেটি বওুয়াইহিয়া খান্দানের প্রতি আনুগত্য পোষণ করতো আবার কখনো সালজুক খান্দানের প্রতি আনুগত্য দেখাতো। তবে তার সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল এই যে, এর শাসক কারশাসিফ ইবনে আলাউদ্দৌলা সুলতান মওদূদ গজনবীর আবেদনে সাড়া দিয়ে ত্রিশক্তির মিত্রতা চুক্তিতে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলো যাদের উদ্দেশ্য ছিল ইস্পাহান, সিজিস্তান ও তুর্কিস্তানের দিক থেকে একযোগে খুরাসানের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করা। এ ষড়যন্ত্রে যদিও তারা সফল হতে পারেননি, কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে, নিজের দোরগোড়ায় এতবড় বিপজ্জনক শত্রুকে পুষে রাখা যেতে পারে না। তাই তুগরীল যখন দেখলেন যে, বুওয়াইহিয়া সামাজ্যের মধ্যে কারশাসিফের আদৌ কোনো সাহায্যকারী শক্তি নেই তখন তিনি তার ওপর আক্রমণ করলেন এবং ইস্পাহান প্রদেশ দখল করে ফারেস অঞ্চলের ইয়ায্দ ও আবরকুহ এলাকা ছেড়ে দিতে বাধ্য করলেন।[৪]

---

১. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৭।

২. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩০-২৩১।

৩. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৩ ; আবুল ফিদা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭০।

৪. ইবনে আসীর, ৯ম পৃষ্ঠা-২৩৪।

www.bjilibrary.com

অপর দিকে তুগরীলের ভাতিজা আল্প আরসালান খুরাসানের মরুভূমি অতিক্রম করে ফারেসের ওপর আক্রমণ করলেন এবং অগ্রসর হয়ে ফাসা পৌঁছে পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন। কিন্তু গৃহযুদ্ধের ফলে দায়লামীদের মধ্যে এতটা শক্তি অবশিষ্ট ছিল না যে, তারা তাদের মোকাবিলা করতে পারতো।[১]

একের পর এক গৃহযুদ্ধ

এই গৃহযুদ্ধের কারণে অপর সীমান্ত রাজ্য কুর্দিস্তান সালজুকদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে। তাই আবুশ শাওকের ভাই মুহালহিল নিজে তুগরীল বেগের সামনে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তুগরীল তাকে সিরওয়ান, ওয়াক্কুকা, শাহরজোর এবং সামেগান এলাকা জায়গীর হিসেবে প্রদান করেন। এরপর সা'দী ইবনে আবুশ শাওকও ক্ষমাপ্রার্থী হয় এবং তাকে জায়গীর হিসেবে রাওয়ামদীন এলাকা প্রদান করা হয়।[২]

৪৪৩ হিজরী মোতাবেক ১০৫১ খৃষ্টাব্দে আমীর ফালাসতূনের অবস্থা কিছুটা প্রতিকূল হয়ে ওঠে যার কারণে মালেক আর রাহীম সাময়িকভাবে পুনরায় ইস্তাখার ও সিরাজ অধিকার করে নেয়ার সুযোগ পেয়ে যান। কিন্তু হাজার ইস্প ও মনসূর হুসাইনের অধীনস্ত একটি দল তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। সেই সময় তুগরীল বেগ ফারেস ও খুজিস্তানের দ্বারপ্রান্তে ইস্পাহানে অবস্থান করছিলেন। তিনি তাদেরকে অর্থ ও সৈন্য-সামন্ত দিয়ে পূর্ণরূপে সহযোগিতা করেন, যার ফলে মালেক আর রাহীম শোচনীয়রূপে পরাজিত হয়ে ওয়াসেতের দিকে পশ্চাদাপসারণ করেন এবং এসব লোক ফিরে এসে সিরাজের ওপর হামলা করেন। কিন্তু মালেক আর রাহীমের ভাই আবু সা'দ খসরুশাহ সেখানে পূর্ব থেকেই অবস্থান করছিলেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে তাদের মোকাবিলা করেন এবং খুজিস্তানের দিকে সরে যেতে বাধ্য করেন।[৩] পরবর্তী বছরেই তুগরীল বেগের বাহিনীর কয়েকটি অংশ পুনরায় ফারেসে প্রবেশ করে এবং শিরাজ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। কিন্তু যেহেতু তখনো বুওয়াইহিয়াদের সংগে যথা-রীতি যুদ্ধ করার মত অবস্থা সৃষ্টি হয়নি তাই শুধুমাত্র আকস্মিক খণ্ড আক্রমণ পরিচালনা এবং দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকেই যথেষ্ট মনে করা হয়।[৪]

অন্যদিকে সালজুক সৈন্যরা অগ্রসর হয়ে ইরাকেও আকস্মিক খণ্ড আক্রমণ শুরু করেছিলো। তাদের তৎপরতার ক্ষেত্র নু'মানিয়া পর্যন্ত ছিল।[৫]

---

১. ইবনে আসীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৫
২. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৭
৩. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৮-২৩৯
৪. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৩
৫. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৫

www.bjilibrary.com

৪৪৪ হিজরীতে (১০৫২ খৃষ্টাব্দ) মালেক আর রাহীমের অপর এক ভাই বসরার শাসক আবু আলী কায়খসরু তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। মালেক আর রাহীম তার ওপর আক্রমণ করে সমগ্র অঞ্চল তার থেকে ছিনিয়ে নেন। কিন্তু এর ফল দাঁড়ায় এই যে, সে সোজা তুগরীলের কাছে চলে যায়। তুগরীল তাকে উপযুক্ত হাতিয়ার মনে করে অত্যন্ত সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন এবং নিজ খান্দানের এক মেয়ের সাথে তাকে বিয়ে দেন এবং জায়গীর হিসেবে খুজিস্তান ও ইরাক সন্নিহিত জারবাযকান এলাকা প্রদান করেন।[১]

খলীফার দরবারে সালজুক দূত

এ পরিস্থিতিতে খলীফার সাথে যোগাযোগের জন্য তুগরীল সর্বোত্তম সুযোগ পেয়ে যান। বিগত এক দেড় শ' বছর থেকে খিলাফতের কেন্দ্রভূমি বাগদাদের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো যে কোনো শক্তিমানকে সাদরে গ্রহণ করা এবং দুর্বলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। এ সময় বুওয়াইহিয়া খান্দানের দুর্বলতা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো এবং সালজুক ক্ষমতার দাপট সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এই পটভূমিতে ৪৪৩ হিজরীর রমযান মাসে তুগরীল বাগদাদে একটি কূটনৈতিক মিশন প্রেরণ করেন। এ মিশনের মাধ্যমে তিনি দশ হাজার দিনার এবং মহামূল্যবান মণিমুক্তা, পোশাকাদি ও সুগন্ধি দ্রব্যাদি খলীফাকে উপহার হিসেবে দেয়ার জন্য, তাঁর সভাসদ ও দরবারের লোকদের জন্য পাঁচ হাজার দিনার এবং খলীফার প্রধান উযীরের জন্য দুই হাজার দিনার প্রেরণ করেন। তাছাড়া কাজী আবুল হাসান মাওয়ারদীকে দূত হিসেবে পাঠিয়ে যে মেহেরবানী করেছিলেন সে বিষয়ে খলীফার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপনের সাথে সাথে তাঁর প্রতি অত্যন্ত ভক্তি ও আনুগত্য প্রকাশ করলেন। খলীফা অত্যন্ত সম্মান ও আড়ম্বরের সাথে তুগরীলের দূতদের গ্রহণ করলেন। তাদের প্রতি চরম ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রকাশ করা হলো এবং ঈদের সময় বাগদাদের সেনাবাহিনী তাদের সম্মানে অতি উত্তম ও মনমুগ্ধকর পোশাকে সজ্জিত হয়ে উন্নত জাতের ঘোড়া নিয়ে কুচকাওয়াজ করলো।[২]

এ কূটনৈতিক মিশন কোনো প্রকার রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান না করলেও উভয় পক্ষ থেকে পরস্পরের প্রতি সম্মান ও সৌজন্য প্রদর্শনই বলে দেয় ভবিষ্যত ঘটনাস্রোত কোনো দিকে প্রবাহিত হবে।

আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া বিজয়

৪৪৬ হিজরীতে (১০৫৪ খৃষ্টাব্দ) তুগরীল বেগ এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আজারবাইজান অভিমুখে রওয়ানা হন। তাবরীযে গিয়ে পৌঁছলে সেখানকার

১. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৫।
২. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪১।

www.bjilibrary.com

শাসক আবু মনসূর দাহসুজান নিজে এসে আনুগত্য প্রকাশ করেন। বিরাট অংকের কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। তুগরীলের নামে খুতবা পাঠ করেন এবং নিজের পুত্রকে জামিন হিসেবে তার সাথে পাঠিয়ে দেন। এরপর আজার বাইজানের আশেপাশের সমস্ত আমীর-উমরা তার আনুগত্য গ্রহণ করে বার্তা পাঠাতে শুরু করে। তুগরীলের নামে খুতবা পাঠ করতে থাকে এবং নিজেদের সন্তানদেরকে জামিন হিসেবে তার কাছে পাঠিয়ে দেয়। আবখায সীমান্ত সংলগ্ন জানযার শাসক আবুল আসওয়ার ও অন্যসব আমীর-উমরাদের অনুসরণ করেন। অতপর তুগরীল আর্মেনিয়ায় প্রবেশ করেন এবং তা অধিকার করার পর মালাযগির্দ গিয়ে উপনীত হন। ঐ স্থানটি তখনো রোমানদের অধিকারে ছিল। কিন্তু কিছুদিন পর্যন্ত অবরুদ্ধ রাখার পর অবরোধ উঠিয়ে নেন এবং আরযানুর রোম (বর্তমান রোমান ভূখণ্ড) পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করে প্রত্যাবর্তন করেন।

এই যুদ্ধে তুগরীলের সাম্রাজ্য উত্তরে জানযা এবং পশ্চিমে দিয়ারে বকর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।[১]

এ বছরই মুসেলের শাসক আবুল মা'আলী কুরাইশ ইবনে বাদরান আমবার ও হারবা অধিকার করে তুগরীলের আনুগত্য গ্রহণ করেন এবং ঐ অঞ্চলেও সালজুক সুলতানের নামে খুতবা জারি হয়।[২]

বাসাসিরীর সৃষ্ট গোলযোগ

এ সময় সালজুক সালতানাত উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদিক থেকে বওয়াইহিয়া সাম্রাজ্যকে ঘিরে ফেলে। বুওয়াইহিয়াদের অধিকৃত ভূখণ্ড সংকুচিত হতে হতে ফারেস, খুজিস্তান ও ইরাকের প্রদেশসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রদেশসমূহের অবস্থাও ছিল এমন যে, এর কোনো কোনো জেলা ইতিমধ্যেই বুওয়াইহিয়া সাম্রাজ্যের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিলো। কোনো কোনো জেলার ওপর একের পর এক আক্রমণ হচ্ছিলো। দেশের অভ্যন্তরেও গৃহযুদ্ধ ও অব্যবস্থার কারণে চরম বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছিলো। সালজুকরা তাদের দায়লামী প্রতিবেশীর এই দুর্বলতা পুরদমে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছিলো। সুতরাং তাদের সৈন্যরা লুটপাট করতে করতে একদিকে বাগদাদের দোরগোড়ায় অবস্থিত দাসকারা ও বাজসিরা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো, অপরদিকে খুজিস্তান প্রদেশ তাদের ক্রমাগত আকস্মিক খণ্ড আক্রমণের লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়েছিলো এবং অনেক আহওয়ায পর্যন্ত তাদের এসব আক্রমণে প্রভাবিত হচ্ছিলো। তাছাড়া ফারেস অঞ্চলে অবিরাম বিদ্রোহ চলছিলো এবং সিরাজে অধিকাংশ

---

১. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৯।

২. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫০।

www.bjilibrary.com

সময়ই তুগরীলের নামে খুতবা পড়া হচ্ছিলো। মালেক আর রাহীমের দুই ভাই আবু মনসূর ফালাসতূন ও আবু আলী কায়খসরু তুগরীল বেগের আনুগত্য গ্রহণ করেছিলো এবং তুগরীল তাদেরকে বাগদাদের দায়েলামী শাসকের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলো।

এ সালতানাতের প্রাণহীন দেহ দাফন করে বাগদাদের ওপর সালজুক আধিপত্যের পতাকা উড্ডীন করা এবং আব্বাসীয় খিলাফতের দায়লামীদের স্থান সালজুকদের অধিকার করার উপযুক্ত সময় সমুপস্থিত হয়েছিলো। সময়ের আনুকূল্য বশত এর কারণসমূহও দায়লামীদের নিজেদের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছিলো।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৪২৬ হিজরীর শা'বান মাসে (১০৫৫ খৃষ্টাব্দ) মুসেলের শাসক কুরাইশ ইবনে বাদরান উকায়লী আমবার ও হারবা অঞ্চল দখল করেছিলেন এবং পাল্টা আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য তুগরীলের আনুগত্য গ্রহণ করেছিলো। প্রকৃতপক্ষে এ এলাকাটি ছিল ইরাকের সকল তুর্কী সৈনিকদের নেতা আরসালান বাসাসিরীর[১] জায়গীরভুক্ত। তিনি এ অন্যায় বরদাশত করতে পারলেন না এবং নিজের জায়গীরভুক্ত ঐসব এলাকা ফিরিয়ে নিতে অগ্রসর হলেন। রমযান মাসে কুরাইশ ইবনে বাদরানের পক্ষ থেকে আবুল গানায়েম ও আবু সা'দ নামক দুই ব্যক্তি গোপনে খলীফার দরবারে আসলেন। সম্ভবত এই বিবাদে মীসাংসা করানোই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এ খবর জানতে পেরে বাসাসিরী এমন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন যে, তিনি তাদের দু'জনকে গ্রেফতার করতে উদ্যত হলেন কিন্তু বাগে পেলেন না। এতে তিনি টাকশাল থেকে খলীফা ও খলীফার প্রধানমন্ত্রী রাইসুর রুয়াসার[২] মাসিক ভাতা বন্ধ করে দেন এবং তিন চার মাস পর্যন্ত উভয়কে বেশ ক্লেশের মধ্যে রাখেন। খলীফার সাথে এই অন্যায় আচরণের ফলে বাসাসিরীর বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং প্রধানমন্ত্রী রাইসুর রুয়াসা তাতে উৎসাহ দান করেন। ধীরে ধীরে বিষয়টি এতদূর গড়ায় যে, ৪৪৭ হিজরীর রমযান মাসে বাসাসিরী যখন ওয়াসেতে অবস্থানরত ছিলেন তখন বাগদাদের জনগণ তার প্রাসাদের ওপর আক্রমণ করে বসে এবং তার সমস্ত অর্থ-সম্পদ লুট করে নেয়।[৩]

---

১. বাসাসিরী বাসা নামকস্থানের সাথে সম্পর্কিত ছিল। একে আরবরা ফাসা বলতো। এ ব্যক্তি বাহাউদ্দৌলা ইবনে আযুদুদ্দৌলার ক্রীতদাস। খলীফা কায়েম বিআমরিল্লাহ তাকে তুর্কীদের প্রধান নেতা নিয়োগ করেছিলেন। ক্রমে তার প্রভাব এতটা বৃদ্ধি পায় যে, খুজিস্তান ও ইরাকে মিম্বরে তার নাম উচ্চারণ পর্যন্ত করা হতো।

২. আবুল কাসেম আলী ইবনুল হাসান ইবনে মাসলামা এবং উপাধি রাইসুর রুয়াসা।

৩. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫০-২৫৩।

www.bjilibrary.com

তুগরীলের বাগদাদ অধিকার

তুগরীল এ পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। বাগদাদে যখন গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা চরম আকার ধারণ করে তখন তিনি ৪৪৭ হিজরীর মুহাররম মাসে রায় থেকে হামদান অভিমুখে এগিয়ে আসেন এবং ঘোষণা করেন যে, আমি হজ্জ সম্পাদনের ইচ্ছা রাখি তাই মক্কায় গমনের পথ ঠিকঠাক করা এবং তারপর শাম ও মিসরের ওপর আক্রমণ করে ফাতেমী খিলাফতের উচ্ছেদ সাধনেরও সংকল্প রাখি। এ ঘোষণার নেপথ্যে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও স্বার্থ ছিল তা হচ্ছে দায়লামী সালতানাতের সমস্ত সুন্নী প্রজা এবং দরবারে খিলাফতের সহানুভূতি যেন তুগরীলের পক্ষে চলে আসে। কারণ, শাম ও মিসর থেকে আব্বাসীয়দের প্রতিপক্ষের খিলাফতের উচ্ছেদ সাধন এবং সেসব স্থানে আব্বাসীয় খিলাফতের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা হওয়া এমন একটি বিষয় যার প্রতি সাধারণভাবে সকল আহলে সুন্নাত এবং আব্বাসীয় খলীফাদের সকল মঙ্গলকামী গভীর আগ্রহ পোষণ করতো। কিন্তু তুগরীল শুধু জনসমর্থনের ওপরই নির্ভর করলেন না। বরং তিনি তার সামরিক শক্তিকেও পুরোপুরি প্রস্তুত করলেন এবং দ্বীনাওয়ার, কারমাইসীন, হুলওয়ান প্রভৃতি এলাকার সামরিক গভর্নরদের নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেন পথিমধ্যেই শাহী কাফেলার সাথে শরীক হওয়ার জন্য সৈন্যদল এবং প্রয়োজনীয় রসদ ও সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখে। এসব প্রস্তুতি শেষে তুগরীল থামদান থেকে রওয়ানা হন এবং ইরাক ও কুর্দিস্তান সীমান্তে অবস্থিত হুলওয়ানে তাঁবু স্থাপন করেন। এ খবর ইরাকে পৌঁছলে সেখানে হৈচৈ শুরু হয়ে যায়। বাগদাদের দায়লামী ও তুর্কীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়। মালেক আর রাহীম ওয়াসেত থেকে বাসাসিরীকে সাথে নিয়ে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হন। খলীফা কায়েম বিআমরিল্লাহর অবস্থা এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি মালেক আর রাহীমকে লিখে জানালেন যে, বাসাসিরী বিদ্রোহী। যদি তুমি তাকে ভালবেসে থাক, তাহলে আমার সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই। আর যদি এখনো আমার অনুগত থেকে থাক, তাহলে তাকে তোমার নিকট থেকে সরিয়ে দাও। অন্য কোনো পরিস্থিতিতে এ ধরনের বার্তা খলীফার খিলাফত এমনকি তার প্রাণ সংহারক হতে পারতো। কিন্তু এখন পরিস্থিতিই ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। মালেক আর রাহীম দ্বিধাহীন চিত্তে তার নির্দেশ মাথা পেতে নিলেন এবং বাধ্য হয়েই বাসাসিরীকে নূরুদ্দৌলা দুবাইস ইবনে আলী ইবনে মায্ইয়াদুল আসাদীর কাছে আশ্রয় নিতে হলো।

রমযানের প্রারম্ভে তুগরীল তার দূতদেরকে বাগদাদ পাঠালেন। তারা খলীফার সামনে তাদের বাদশাহর পক্ষ থেকে আনুগত্য প্রকাশ করলো এবং বাগদাদের তুর্কী সৈন্যদেরকে জানিয়ে দিল যে, সুলতান তুগরীল তাদের সাথে

www.bjilibrary.com

উত্তম এবং সহানুভূতিমূলক আচরণ করবেন। তুর্কীরা বিষয়টি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। খলীফা ও রাইসুর রুয়াসা মনেপ্রাণে কামনা করছিলেন যেন দায়লামীদের কর্তৃত্ব উৎখাত হয়ে যায় এবং সালজুকরা ইরাকে প্রভাব বিস্তার করে।[১] তারা একদিকে তুর্কীদেরকে বুঝিয়ে শান্ত করলো এবং অপরদিকে মালেক আর রাহীম ও আমীর-উমরাদের সাথে আলোচনা করে সৈন্যদেরকে বাগদাদের বাইরে সরিয়ে নিয়ে শহরের মধ্যস্থিত ব্যারাকসমূহে রাখতে এবং আনুগত্য প্রকাশ করে ও খুতবা পাঠ করে তুগরীল বেগকে সন্তুষ্ট করে যুদ্ধের বিপদ থেকে মুক্ত থাকতে সম্মত করলেন। ফলে দায়লামীদের পক্ষ থেকে তুগরীলের কাছে আনুগত্য প্রকাশ করে পত্র পাঠানো হলো এবং ৪৪৭ হিজরীর (১০৫৫ খৃষ্টাব্দ) রমযান মাসে জুম'আর দিন বাগদাদের মসজিদসমূহের মিম্বর থেকে তুগরীলের নামে খুতবা পাঠ করা হলো।

এরপর বাগদাদে আর এমন কোনো শক্তি ছিল না যে, তুগরীলের আগমন ঠেকাতে পারতো ? তিনি রাজধানীতে উপস্থিত হওয়ার জন্য খলীফার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তাকে সন্তুষ্টচিত্তে সে অনুমতি দেয়া হলো। এবার তিনি বাগদাদের দিকে অগ্রসর হলেন। নাহরোয়ানে[২] পৌঁছতেই বাগদাদ থেকে রাইসুর রুয়াসা, প্রধান বিচারপতি, নকিবগণ, সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এবং দায়লামী সালতানাতের আমীর-উমরা পুরো শান-শওকতের সাথে স্বাগত জানাতে এসে পৌঁছলেন। তুগরীলের পক্ষ থেকে তার উযীর আমীদুল মালেক আবু নসর কুনদুরী তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করলেন। প্রধানমন্ত্রী রাইসুর রুয়াসাকে সুলতানের জন্য নির্দিষ্ট ঘোড়ার সওয়ারী পেশ করা হলো এবং নাহরোয়ানেই সুলতানের সাথে তার সাক্ষাত হলো। এই সাক্ষাতে সুলতান খলীফার আনুগত্য ও মালেক আর রাহীমের সাথে কোনো প্রকার বিরোধ বা শত্রুতামূলক আচরণ না করার শপথ করলেন। এরপর তিনি বাগদাদ অভিমুখে অগ্রসর হলেন এবং ৪৪৭ হিজরীর ২৫শে রমযান সেখানে পৌঁছে বাবুশ শাহরিয়ায় অবস্থান করলেন।[৩]

---

১. ইমাদ কাতেব ও ইবনুর রাওয়ানদী বর্ণনা করেন, খলীফা কায়েমের দূত আবু মুহাম্মাদ হায়বতুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনুল মামুন বহুদিন থেকে তুগরীলের কাছে অবস্থান করেছিলেন এবং সবসময় খলীফার পক্ষ থেকে তাকে বাগদাদে আগমনের আমন্ত্রণ জানাতেন।-(যুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-১৯ ; রাহাতুস সুদূর, পৃষ্ঠা-১০৫)

২. যুবদাতুন নাসরা গ্রন্থে নাহরাইন বলে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু ইবনে আসীরও মীর খোন্দ নাহরোয়ান লিখেছেন এবং এটিই বিশুদ্ধ।

৩. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫৪-২৫৫ ; আবুল ফিদা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৩ ; রাওদাতুস সাফা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৮ এবং ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৪, ৯৫; যুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-১০, রাহাতুস সুদূর, পৃষ্ঠা-১০৫। আমরা জানি না, হামদাল্লাহ মুস্তাউফী কোন্ সূত্রের ওপর নির্ভর করে লিখলেন যে, তুগরীল সত্যিই হজ্জ পালন করতে গিয়েছিলেন এবং প্রত্যাবর্তনের পর তিনি বাগদাদে এসেছিলেন। অন্য কোনো ইতিহাস থেকে এ বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায় না।

www.bjilibrary.com

বুওয়াইহিয়া খান্দানের শাসনের অবসান

এই আধিপত্যের ফলে সালজুকী সালতানাত বুওয়াইহিয়া সালতানাতের ওপর সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করে এবং এরপর বুওয়াইহি সালতানাতের জন্য পুনর্জীবনলাভের খুব কম সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকে। তা সত্ত্বেও যে সম্ভাবনাটুকু অবশিষ্ট ছিল আকস্মিক ঘটনাবলী তাও অবশিষ্ট থাকতে দেয়নি। বাগদাদে পৌঁছার পরের দিনই যখন সালজুক সৈনিক তার প্রয়োজনীয় জিনিস শহরে নিয়ে যায় তখন ভাষা না জানা থাকার কারণে এক ঘাস বিক্রেতার সাথে কয়েকজন সৈন্যের ঝগড়া হয়। এরা তার নিকট থেকে ঘাস খরিদ করতে চাচ্ছিলো। কিন্তু সে মনে করে যে, তারা লুট করতে চাচ্ছে, তাই চিৎকার করতে শুরু করে। এতে বাজারের লোক জড়ো হয় এবং তারা সালজুক সৈন্যদেরকে মারপিট করে। শহরের অন্যান্য অংশে এ খবর পৌঁছলে ব্যাপক হাংগামা শুরু হয় এবং প্রত্যেক স্থানেই লোকজন সালজুক সৈন্যদের ওপর আক্রমণ করে এবং যাদের একা পায় তাদের দু'য়েকজনকে হত্যা করে। অতপর সবাই দল বেঁধে শহরের বাইরে সুলতানের খাস ছাউনির ওপর হামলা করার জন্য অগ্রসর হয়। এখানে নিয়মিত সৈন্যরা তাদের মোকাবিলা করে এবং প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি করে তাদের তাড়িয়ে দেয়। এরপর সালজুক সৈন্যরা নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে এবং শহরে প্রবেশ করে নির্বিচারে লুটপাট ও মারধর শুরু করে। এমনকি তারা রাইসুর রুয়াসার প্রাসাদ এবং আব্বাসীয় খলীফাদের কবরস্থান পর্যন্ত লুট করে। এই গোলযোগে মালেক আর রাহীম ও তার লোকজন সম্পূর্ণরূপে নিজেদেরকে সরিয়ে রাখেন। কিন্তু তুগরীল প্রকৃতপক্ষেই কিংবা কৃত্রিমভাবে সন্দেহ করেন যে, মালেক আর রাহীমের ইংগিতেই এসব কাজ হয়েছে। তাই তিনি খলীফাকে লিখে জানান যে, যদি মালেক আর রাহীম ও তার আমীর-উমরা এ অপরাধের দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে আমার সামনে হাজির হোন। অন্যথায় আমি মনে করবো তারাও এ অপরাধের সাথে জড়িত। এই চাতুর্য ফলবতী হয় এবং খলীফা তাদেরকে নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়ে তাঁর দূতদের সাথে তুগরীলের কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তারা তুগরীলের ছাউনির কাছে পৌঁছামাত্র তুর্কমানরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং খলীফার দূতদের সহ সবাইকে লুণ্ঠন করে এমনকি তাদের পরিধানের বস্ত্র পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখেনি। অতপর তারা তুগরীলের সামনে উপস্থিত হলে তিনি খলীফার দূতদের মুক্ত করে দেন এবং মালেক আর রাহীমসহ অন্য সবাইকে বন্দী করে সিরাওয়ান দূর্গে পাঠিয়ে দেন। যে দায়লামী খান্দান এক শতাব্দীকালের অধিক সময় ধরে ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রভূমিতে শাসনকার্য পরিচারনা করেছিলো, এভাবে তাদের শক্তিশালী শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

www.bjilibrary.com

তুগরীলের এই বিশ্বাস ভঙ্গকে খলীফা অত্যন্ত খারাপ দৃষ্টিতে দেখলেন এবং তাকে লিখলেন যে, তারা আমার নিরাপত্তার আওতায় তোমার কাছে গিয়েছিলো। তুমি যদি তাদেরকে মুক্তি দাও তবে উত্তম। অন্যথায় আমি বাগদাদ ছেড়ে চলে যাব। আমি তোমাকে ডেকে এনেছিলাম এ জন্য যে, খিলাফতের বিষয়সমূহের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু আমি তার সম্পূর্ণ উল্টা ফলাফল দেখতে পাচ্ছি। এই তিরস্কার পত্রে এতটা কাজ হলো যে, কিছুসংখ্যক লোককে মুক্তি দেয়া হলো। কিন্তু মালেক আর রাহীম মুক্তি পেলেন না। তাছাড়া তার ব্যক্তি ব্যয় নির্বাহের সমস্ত সম্পদ এবং তার সেনাবাহিনীর অফিসারদের সমস্ত জায়গীর জব্দ করা হলো। গুজ তুর্কমানরা বাগদাদের অধীনস্ত এলাকা পশ্চিমে তাকরীত থেকে আননাইল পর্যন্ত এবং পূর্বে আননাহ রোয়ানাত থেকে ইরাকের নিম্ন এলাকা পর্যন্ত মনের মত করে লুণ্ঠন করলো। এর ফলে অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, বাগদাদে পাঁচ কিরাতে একিট করে গরু এবং দুই কিরাতে একটি করে গাধা বিক্রি হতে থাকে।[১]

খলীফার খান্দানের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক

একের পর এক এসব বিশৃঙ্খলার কারণে আব্বাসীয় খিলাফতের সাথে সালজুক সালতানাতের সংঘাতের একান্ত সম্ভাবনা ছিল এবং তাতে সালজুক শাসন ক্ষমতার উন্নতি ও সমৃদ্ধির ওপর তার মন্দ প্রভাব পড়তো। কিন্তু তুগরীলের উযীর আমীদুল মালেক আবু নসর কুনদুরী পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করতে পারলেন এবং তার গৃহীত কর্মকৌশলের মাধ্যমে উভয় পক্ষের সম্পর্ক যে শুধু শুধরে গেল তাই নয়। বরং তা আরো সৌহার্দপূর্ণ করার জন্য সিদ্ধান্ত হলো যে, খলীফা কায়েম বি আমরিল্লাহর সাথে তুগরীল বেগের ভ্রাতুষ্পুত্রী খাদিজা আরসালান খাতুনের[২] বিয়ে হবে। সুতরাং ৪৪৫ হিজরীর মুহাররম মাসে (১০৫৬ খৃষ্টাব্দ) বিবাহ মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে তুগরীলের পক্ষ যে আমীদুল মালেক কুনদুরী, আবু আলী কায়খসরু দায়লামী, হাজার আস্প ইবনে বনকীর কুর্দি, ইবনে আবিশ শওক এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও বাগদাদের উলামাদের মধ্য থেকে কাজীউল কুযা (প্রধান বিচারপতি) আবুল হাসান মাওয়ারদী এবং নাকীবুল নুকাবা আবু আলী ইবনে আবু হাতেম অংশগ্রহণ করলেন। রাইসুর রুয়াসা বিয়ের খুতবা পাঠ করলেন। শা'বান মাসে খাদীজা খাতুনকে মার্ভ থেকে বাগদাদে আনা হলো এবং খলীফা মাতা নিজে খিলাফতের অন্দর মহলে গ্রহণ করলেন।[৩]

---

১. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫৫–২৫৬ ; রাওদাতুস সাফা ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৮। ইমাদ কাতেব, আবুল ফিদা, ইবনুর রাওয়াদী এবং হামদাল্লাহ মুসতাওফী এসব ঘটনা অস্বাভাবিক সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনা করেছেন।

২. তিনি ছিলেন চাগরী বেগ দাউদের কন্যা এবং আল্প আরসালানের ভগ্নি।

৩. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫৭ ; যুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-১১–১২।

www.bjilibrary.com

বাসাসিরীর গোলযোগ

উপরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, খলীফার নির্দেশে মালেক আর রাহীম আরসালান বাসাসিরীকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। এখান থেকে পালিয়ে তিনি আমীরে আরব নূরুদ্দৌলা দুবাইস ইবনে মাযইয়াদের কাছে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তার সাথে বাসাসিরীর আত্মীয়তার বন্ধন ছিল। কিন্তু তিনি সেখানেও অধিক সময় টিকে থাকতে পারেননি। কারণ, তুগরীলের ভয়ে নূরুদ্দৌলা তাকে বহিষ্কার করে এবং তাকে শামে গিয়ে রাহবা মালেকে অবস্থান করতে হয়। এখন সে ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। সে আব্বাসীয়দের বিপরীতে মিসরের ফাতেমীয় খলীফা আল মুনতাসির বিল্লাহর সাথে পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে তার আনুগত্য গ্রহণ করেন এবং নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করেন। এদিকে তুগরীল বেগ বাগদাদে মালেক আর রাহীম ও তার আমীর-উমরাদের সাথে যে আচরণ করেন তা দেখে বহুসংখ্যক দায়লামী ও তুর্কী সৈন্য পালিয়ে তার কাছে চলে যেতে থাকে। কিছুদিনের জন্য তার কাছে বিরাট একটি দল সমবেত হয়।[১] তার ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে নূরুদ্দৌলাও তার সাথে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং উভয়ে মিলে ৪৪৮ হিজরীতে (১০৫৬ খৃষ্টাব্দ) মুসেলের ওপর আক্রমণ করেন। সেখানে কুরাইশ ইবনে বাদরানের সাথে তুগরীলের চাচাতো ভাই কুতলুমুশ ইবনে আরসালানও অবস্থানরত ছিলেন। তারা উভয়েই হামলাকারীদের বিরুদ্ধে লড়তে অগ্রসর হন। সানজারের সন্নিকটে যুদ্ধ হয়। কুতলুমুশ পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন এবং কুরাইশ বন্দী হয়ে নূরুদ্দৌলা ও বাসাসিরীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। এভাবে তারা মুসেল অধিকার করে এবং সেখানে মিসরের ফাতেমীয় খলীফা মুসতানসির বিল্লাহর নামে খুতবা চালু করেন।[২]

এদিকে সালজুক সৈন্যরা বাগদাদে চরম হাংগামা সৃষ্টি করে রেখেছিলো। যার ফলে শহরের অধিবাসীরা তাদের প্রতি ক্রমেই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিলো। অবশেষে খলীফা কায়েম বি আমরিল্লাহর নির্দেশে রাইসুর রুয়াসা তুগরীলের উযীর আমীদুল মুলককে ডেকে বাগদাদের সাধারণ অধিবাসীদের অভিযোগ সম্পর্কে তাকে অবহিত করে বলেন যে, তুমি যদি এই যুলুম-নির্যাতন বন্ধ না করো, তাহলে খলীফা বাগদাদ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবেন, যাতে এসব কাজ-কর্ম নিজ চোখে তাকে দেখতে না হয়। এতে আমীদুল মালেক সুলতানের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে ওযর পেশ করেন এবং এর পরপরই সুলতান বাগদাদ

১. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫৬।

২. ইমাদ কাতেব লিখেছেন যে, সানজারের যুদ্ধের পূর্বেই কুরাইশ ইবনে বাদরান আক্রমণকারীদের সাথে হাত মিলিয়ে ছিলেন। কিন্তু ইবনে কাসীর বলেন যে, ঐ যুদ্ধের পরে সে তাদের উভয়ের সাথে হাত মিলায়।

থেকে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। ঠিক এই সময়েই সানজার যুদ্ধের খবর এসে পৌঁছে এবং ৪৪৮ হিজরীর যিলকাদ মাসে তুগরীল মুসেল অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি পথিমধ্যে থাকতেই কুরাইশ এবং নূরুদ্দৌলা উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করে। কিন্তু বাসাসিরী পালিয়ে পুনরায় আর রাহবার চলে যায়।[১]

খলীফার সাথে তুগরীলের সাক্ষাত

কয়েক মাসের মধ্যে মুসেল, সানজার, দিয়ারে বকর এবং জাযিরা ইবনে উমর প্রভৃতি এলাকাকে অনুগত ও তাবেদার বানিয়ে সমগ্র এলাকা ইবরাহীম ঈনালের তত্ত্বাবধানে দিয়ে তুগরীল নিজে বাগদাদে ফিরে আসলেন। কাফাসে এসে পৌঁছতেই রাইসুর রুয়াসা এসে খলীফার সালাম পৌঁছালেন এবং তার পক্ষ থেকে মণিমুক্তা খচিত পানপাত্র, একটি লম্বা কুর্তা এবং একটি পাগড়ি পেশ করেন যা সুলতান আভূমি নত হয়ে গ্রহণ করেন এবং তারপর বাগদাদ পৌঁছে প্রথমবারের মত খলীফার দরবারে হাজির হওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন, যা গৃহীত হয় এবং ৪৪৯ হিজরীর ২৫শে যিলকাদ (১০৫৭ খৃষ্টাব্দ) তার জন্য আম দরবার অনুষ্ঠিত হয়। তুগরীল বাবুর রাক্কা পর্যন্ত নৌকায় যান। সেখানে তাকে খলীফার পক্ষ থেকে ঘোড়া পেশ করা হয়। ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সেহনুস সালামের দহলিজ পর্যন্ত যান। অতপর ঘোড়া থেকে নেমে আমীর-উমরা পরিবেষ্টিত নিরস্ত্র অবস্থায় পায়ে হেঁটে খিলাফতের সিংহাসন পর্যন্ত যান যা ভূমি থেকে সাত হাত উঁচুতে অবস্থিত ছিল। সেই আসনের ওপরে খলীফা কায়েম বি আমরিল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাদর পরিধান করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লাঠি হাতে নিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। তার সামনে লটকানো ছিল পর্দা। তুগরীল খলীফার পর্দার নিকটবর্তী হলে পর্দা সরিয়ে দেয়া হলো এবং তিনি খলীফার সামনে মাটিতে চুম্বন করলেন। রাইসুর রুয়াসা যথানিয়মে পেশ করার প্রথা পালন করলে খলীফা সুলতানকে কুরসী দেয়ার আদেশ দিলেন। অতপর রাইসুর রুয়াসাকে বললেন যে, তাকে বলো ঃ আমীরুল মু'মিনীন তোমার চেষ্টা সাধনার জন্য কৃতজ্ঞ। তোমার কাজ মূল্যবান মনে করেন এবং তোমার নৈকট্যে সন্তুষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে যেসব দেশের বেলায়েত দান করেছেন তিনি তোমাকে সেইসব দেশের শাসক মনোনীত করেছেন এবং আল্লাহর বান্দাদের সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব তোমার ওপর ন্যস্ত করেছেন। সুতরাং তোমার দায়িত্বে যা ন্যস্ত করা হয়েছে, সে বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করো, নিজের জন্য আল্লাহ্র নিয়ামত কি তা জানো এবং ন্যায়বিচার ব্যাপকতর করতে, যুলুম

১. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫৬, ২৬১, ২৬২; যুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-১২-১৩ ; রাওদাতুস সাফা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৮।

www.bjilibrary.com

প্রতিরোধ করতে এবং প্রজাকুলের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করো। এতে তুগরীল পুনরায় ভূমি চুম্বন করলেন। অতপর খাদেমগণ তাকে খিলাতের স্থানে নিয়ে যায়। এখানে তাকে আজমের (অনারব) মুকুট এবং আরবের সোনালী পাগড়ি পরিয়ে দেয়া হয়। গলায় গলাবন্ধ ও মালা পরিয়ে দেয়া হয়, সাত অঞ্চলের বেলায়েতের ইংগিত সূচক সাত প্রস্ত কালবস্ত্রের খিলাত দেয়া হয় এবং স্বর্ণের কারুকার্য খচিত তরবারি তার কোমরে বেঁধে দেয়া হয়। খিলাত গ্রহণ করে তিনি পুনরায় তার স্থানে আসলেন। ভূমি চুম্বন করে পুনরায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু মুকুটের কারণে মস্তক আনত করতে সক্ষম হলেন না। তিনি খলীফার সাথে মুসাফাহার আকাংখা প্রকাশ করলেন। তাই খলীফা হাত বাড়িয়ে দিলেন। তুগরীল তাতে চুম্বন করে চোখে লাগালেন। এরপর তাকে আরো একখানা তরবারি দেয়া হলো এবং খলীফা তাকে মাশরিক ও মাগরিব (প্রাচ্য ও প্রতীচ্য) এর বাদশাহ বলে সম্বোধন করলেন। অবশেষে খলীফা তাকে বেলায়েত বা নেতৃত্বের ফরমান দিয়ে বিদায় করলেন। প্রত্যাবর্তনের পর তুগরীল খলীফার খেদমতে অতি মূল্যবান উপহার-উপঢৌকন প্রেরণ করলেন যার মধ্যে ছিল নগদ ৫০ হাজার দিনার। পঞ্চাশজন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তুর্কী খাদেম এবং উন্নতজাতের পঞ্চাশটি ঘোড়ায় বসিয়ে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পঞ্চাশজন তুর্কী খাদেমকে জৌলুসময় পোশাকে সজ্জিত করে প্রেরণ করা হয়।[১]

ইবরাহীম ঈনালের বিদ্রোহ

এর অল্প কিছুকাল পরেই পর পর এমন দু'টি ঘটনা সংঘটিত হলো যা এক বছর পর্যন্ত তুগরীল বেগ ও খলীফা কায়েম বি আমরিল্লাহকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন রাখলো।

এর মধ্যে প্রথমটি ছিল ইবরাহীম ঈনালের বিদ্রোহ। ইবরাহীম ছিলেন তুগরীলের বৈপিত্রেয় ভাই। প্রথমদিকে তিনি তুগরীলের বহু সামরিক খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েক বছর থেকে তার মনে একথা বদ্ধমূল হয়েছিলো যে, তুগরীলের সকল বিজয়ই আমার তরবারির দান। তাই তিনি বিদ্রোহ প্রকাশ করতে শুরু করেন। তিনি সর্বপ্রথম ৪৪১ হিজরীতে তুগরীলের নির্দেশ অমান্য করেছিলেন। ফলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং তুগরীল বিজয়ী হন। ইবরাহীম নিজের দোষ স্বীকার করে অপরাধের ক্ষমা চেয়ে নেন। এর পর তুগরীল তার ওপর বিভিন্ন রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করেন এরপর তিনি বিদ্রোহের জন্য যথোপযুক্ত সুযোগ না পেয়ে অনুগত হয়ে তার খেদমত আঞ্জাম দিতে থাকেন। অবশেষে তাকে যখন মুসেলের শাসন ক্ষমতা দেয়া হয় তখন তিনি বাসাসিরীর সাথে যোগসাজস করেন এবং রাজ্যটিকে আপন অবস্থায়

১. ইবনে আসীর, ৯ম পৃষ্ঠা-২৬৪, ২৬৫; যুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-১৩, ১৪, আবুল ফিদা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৬।

www.bjilibrary.com

পরিত্যাগ করে জিবাল অঞ্চলের দিকে চলে যান। এর ফলে জিবাল এলাকার লোকজন রাজ্যটিতে প্রবেশ করে তা অধিকার করে নেয়। তুগরীল তার এহেন আচরণের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি তাকে ক্ষমা করতে চেয়েছিলেন এবং অত্যন্ত সদয় আচরণ করে বাগদাদে ডেকে নিলেন। কিন্তু তিনি সুযোগ পেয়ে ৪৫০ হিজরীর রমযান মাসে (১০৫৮ খৃষ্টাব্দ) পুনরায় হামদানে পালিয়ে গেলেন। ঘটনাক্রমে ঐ সময় তুগরীলের কাছে খুব অল্প সংখ্যক সৈন্য ছিল, অধিকাংশ সৈন্যই ছুটি নিয়ে চলে গিয়েছিলো। পক্ষান্তরে ইবরাহীম বিপুল সংখ্যক তুর্কীদের সংগ্রহ করেছিলেন এবং তার কাছে এমন ভয়ানক শক্তি সঞ্চিত হয়েছিলো যে, তাকে সামান্য অবকাশ দেয়াও ছিল সালতানাত হারানোর সমার্থক। এ কারণে তার মোকাবিলা করতে তুগরীল বেগকে কঠিন সমস্যায় পড়তে হলো এবং গোটা সালতানাতে তার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হতে থাকলো। অবশেষে তিনি তার ভাই দাউদের আল্‌প আরসালান, ইয়াকূতী ও কাওয়ার্ত বেগের কাছে সাহায্য চাইলেন। তারা বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে তার কাছে পৌঁছলেন। ৪৫১ হিজরীর জমাদিউস সানী মাসে (১০৫৯ খৃষ্টাব্দ) রায়-এর সন্নিকটে যুদ্ধ হয় যাতে তুগরীল বিজয় লাভ করেন এবং ইবরাহীম বন্দী হয়। তুগরীল ইতিপূর্বে যদিও তাকে কয়েক দফা ক্ষমা করেছিলেন। কিন্তু এবার সে এত ভয়ংকর কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলো যে, পুনরায় তাকে আর ক্ষমা করা যেতে পারতো না। তাই তিনি তাকে ধনুকের দড়িতে ঝুলিয়ে ফাঁসি দিলেন।[১]

বাসাসিরীর বাগদাদ অধিকার

তুগরীল এভাবে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পর বাসাসিরীর জন্য ময়দান পরিষ্কার হয়ে যায়। সুতরাং সে এবং তার সাথী বাগদাদের ওপর আক্রমণ করে এবং ৪৫০ হিজরীর ৬ই যিলকাদ শহরে প্রবেশ করে। খলীফার লোকজন কিছুটা প্রতিরোধের সৃষ্টি করে কিন্তু সহজেই পরাজিত হয় এবং বিদ্রোহী সৈন্যরা খলীফার খাস আবাসে প্রবেশ করে। অবশেষে খলীফা কায়েম বি আমরিল্লাহ কালবস্ত্র পরিধান করে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করেন এবং তরবারি হাতে নিয়ে অগ্রসর হন। তাঁর মুষ্টিমেয় খাদেম এবং আব্বাসীয় বংশের একদল লোক উন্মুক্ত তরবারি হাতে তাঁর সাথে অগ্রসর হতে থাকে। রাইসুর রুয়াসা অগ্রসর হয়ে কুরাইশ ইবনে বাদরানকে চিৎকার করে ডেকে বলেন ঃ

> "হে আলামুদ্দীন, আমীরুল মু'মিনীন তোমার কাছে তাঁর নিজের, নিজের পরিবার-পরিজনের এবং সংগী-সাথীদের জন্য আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আবাবিয়াতের আশ্রয় চাচ্ছেন।"

১. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩১, ২৬৭, ২৭০; যুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-১৫-১৬; রওদাতুস সাফা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৫।

www.bjilibrary.com

কুরাইশ এ আবেদন গ্রহণ করে এবং খলীফাকে রাইসুর রুয়াসা ও তার সমস্ত সংগী-সাথীসহ তার নিজের নিরাপত্তায় গ্রহণ করে। কিন্তু এই নিরাপত্তা বাতিল করার জন্য বাসাসিরী কুরাইশের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। ফলে বাধ্য হয়ে কুরাইশ রাইসুর রুয়াসাকে বাসাসিরীর হাতে তুলে দেন এবং খলীফাকে তাঁর চাচাতো ভাই মুহিউদ্দীন আবুল হারেস মুহারিশ ইবনুল মুজাল্লা আল 'উকায়লির কাছে হাদীসা আনা নামকস্থানে পাঠিয়ে দেন। তাঁর স্ত্রী আরসালা খাতুনের দেখা শোনার দায়িত্ব আবু আবদুল্লাহ ইবনে জারদার ওপর ন্যস্ত করেন, খলীফার খাদেম ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদের তার নিজের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। বাসাসিরীর তুর্কী অনুগামীরা এবং বনু 'উকাইলির বন্দুরা খলীফার অন্দর মহলে প্রবেশ করে ব্যাপক লুটতরাজ চালায়। এখন বাসাসিরী সমগ্র ইরাক ও আলজাযিরার একটি বিরাট অংশের শাসক। তিনি বাগদাদে যথারীতি তার সরকার চালু করে দেন, ইরাকের আশেপাশে গভর্নর নিয়োগ করেন এবং আব্বাসীয় খিলাফতের কেন্দ্রভূমিতে এক বছর পর্যন্ত ফাতেমী খিলাফতের খুতবা পড়তে থাকেন। ঈদুল আযহার দিন যখন তিনি বাগদাদের ঈদগায় যান তখন ইতিহাসে প্রথমবারের মত সেখানে আব্বাসীয় পতাকার পরিবর্তে মিসরীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। যুলহাজ্জ মাসের শেষ দিকে তিনি রাইসুর রুয়াসা ও ইরাকের আমীদকে হত্যা করান।[১]

বাসাসিরীর উৎখাত এবং খলীফার বাগদাদ প্রত্যাবর্তন

খলীফা কায়েম বি আমরিল্লাহ বাগদাদ থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রথমেই যে কাজটি করলেন, তা হচ্ছে—নিজের বিপদের বিষয়ে তুগরীলকে অবহিত করলেন। তিনি তাকে লিখলেন যে, ইসলামের ঘরে কারামেতাদের রীতিনীতি ও আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে। এখন যদি কিছু করতে হয়, তাহলে অনতিবিলম্বে ইসলামের সাহায্যে হাজির হও। তুগরীল বেগ তখন তার নিজের বিপদ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। তিনি সাহায্যের জন্য এসে পৌঁছতে সক্ষম হলেন না। কিন্তু সান্ত্বনার জন্য জবাবে নিচের আয়াতটি লিখে পাঠালেন ঃ

ارْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّاقِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا اَذِلَّةً وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ ০[২]

১. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৭–২৬৯; যুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-১৫–১৬; আবুল ফিদা ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৭–১৭৮, রাহাতুস সুদূর, পৃষ্ঠা-১০৭–১০৮; রাওদাতুস সাফা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৮, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৫ ; ইবনে খাল্লিকান, তারজুমায়ে আরসালান বাসাসিরী।

২. রাহাতুস সুদূর, পৃষ্ঠা-১০৮–১০৯ ; রাওদাতুস সাফা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৮; তারীখে গুযীদা, পৃষ্ঠা-৩৫৭।

www.bjilibrary.com

"তাদের কাছে ফিরে যাও। আমি তাদের বিরুদ্ধে এমন বাহিনী নিয়ে আসবো যার মোকাবিলা করার সাধ্য তাদের নেই। তারা সেখান থেকে তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে বহিষ্কার করবে।"

অতপর ইবরাহীম ঈনালের বিরুদ্ধে অভিযান শেষ করে তিনি বাসাসিরী ও কুরাইশকে লিখলেন যে, তোমরা খলীফাকে বাগদাদে নিয়ে আসলে আমি ইরাকে আসবো না এবং আমার নামে খুতবা ও মুদ্রা চালু হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করবো। কিন্তু বাসাসিরী সন্ধি প্রস্তাব সম্বলিত এ বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে তুগরীল এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি এমন জাঁকজমক ও ভয়ংকর ভাবমূর্তি নিয়ে অগ্রসর হন যে, শত্রু অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তার বাহিনীর অগ্রগামী অংশ কাসরে শিরীন পর্যন্ত না পৌছতেই বাসাসিরী বাগদাদ ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং অত্যন্ত কাকতালীয়ভাবে তা সংঘটিত হয়। অর্থাৎ ৪৫০ হিজরীর ৬ই যিলকাদ সে বাগদাদে প্রবেশ করেছিলো এবং ৪৫১ হিজরীর ৬ই যিলকাদ তারিখেই সে আবার বাগদাদ ছেড়ে চলে যায়। এভাবে আব্বাসীয় রাজধানীতে তার দৌরাত্ম চলে ঠিক এক বছর পর্যন্ত।

এ খবর পাওয়া মাত্রই তুগরীল খলীফাকে বিজয়ের সুসংবাদ দান ও তাঁকে বাগদাদে নিয়ে আসার জন্য ইমাম ও আবু বকর কুরাককে তাঁর কাছে প্রেরণ করেন। ওদিকে মুহারিশ ইবনে মুজাল্লা এর পূর্বেই খলীফাকে নিয়ে বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। পথিমধ্যে আমীদুল মালেক কুন্দুরী সৈন্য-সামন্ত, বড় পর্দা, তাঁবু এবং স্বর্ণখচিত সওয়ারীসমূহ নিয়ে খলীফার সাথে সাক্ষাত করলেন এবং তাঁকে অত্যন্ত জাঁকজমক ও ধুমধামের সাথে বাগদাদের দিকে নিয়ে চললেন। নাহরোয়ানে তুগরীল নিজে তাকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন। খলীফা সওয়ারীর সামনে এসে হাজির হলে তিনি সাত বার ভূমি চুম্বন করলেন। সামনে অগ্রসর হয়ে নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য মোবারকবাদ জানালেন এবং ওজর পেশ করে বললেন যে, ইবরাহীমের বিদ্রোহের কারণে যথাসময়ে সাহায্য প্রদান করতে পারেননি এবং তাকে হত্যা করেছেন। কারণ, তার জন্যেই আব্বাস (রা)-এর বংশধরদের ওপর মসিবত আপতিত হয়েছে। অতপর বললেন যে, এখন আমি বাসাসিরীর পশ্চাদ্ধাবন করবো এবং সিরিয়ায় গিয়ে মিসরের ফাতেমীদের থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। এই খেদমতের বিনিময়ে খলীফা তাকে তরবারি উপহার দিলেন। এরপর খলীফা বাগদাদ অভিমুখে অগ্রসর হলেন এবং ৪৫১ হিজরীর ১৫ই যুলকা'দা (১০৫৯ খৃষ্টাব্দ) মাসে (এক বছর পূর্বে বাগদাদ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এই একই তারিখে) শহরে প্রবেশ করলেন। এ সময় আব্বাসীয় খিলাফতের রাজধানীতে কাজী আবু

www.bjilibrary.com

আবদুল্লাহ আদ দামেগানী ছাড়া কেউ-ই স্বাগত জানানোর জন্য বেঁচে ছিল না। নগরীর পক্ষ থেকে তুগরীল নিজেই প্রথামাফিক স্বাগত জানানোর দায়িত্ব পালন করলেন এবং বাবুন নূবীতে দাঁড়িয়ে দ্বার রক্ষীর ভূমিকা পালন করলেন। তিনি খলীফার খচ্চরের লাগাম ধরে পায়ে হেঁটে তার কক্ষ পর্যন্ত গেলেন।

এরপর সুলতান তুগরীল সারহাং, সাদতগীন, আনওশেরওয়াঁ ও খামার তগীন তুগরাইকে বাসাসিরীর পশ্চাদ্ধাবনের জন্য প্রেরণ করলেন। তারা তাকে সিরিয়ার দিকে পলায়নরত অবস্থায় একস্থানে গিয়ে ধরে ফেললেন। নামমাত্র সংঘর্ষের পর তার সংগীরা বন্দী এবং সে নিজে নিহত হলো। যিলহাজ্জের ১৫ তারিখে তার মস্তক বাগদাদে আনা হলো। একটি বর্শাগ্রে গেঁথে তা গোটা শহরে প্রদর্শিত হলো এবং শেষ পর্যন্ত বাবুন নূবীতে লটকিয়ে দেয়া হলো।[১]

ইরাকের দিওয়ানী

আমীদুল মালেক কুন্দরীর বুদ্ধিদীপ্ত প্রচেষ্টায় এ যাত্রা সালজুকরা ইরাকের দিওয়ানী লাভ করে। প্রথম প্রথম সুলতান তুগরীলের ইচ্ছা ছিল এই যে, তাকে ইরাকে একটি বড় জায়গীর দান করা হোক যাতে তা দিয়ে তার সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার মেটানো যায়। কিন্তু আমীদুল মালেক তাকে এ আকাংখা প্রকাশ করা থেকে বিরত রাখলেন। খলীফা নিজেই অবশ্য তাঁর ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য তুগরীলের কাছে অর্থ বরাদ্দের আকাংখা প্রকাশ করলেন। এ সুযোগের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তুগরীল ইরাকের দিওয়ানী নিজের হাতে নিয়ে নিলেন এবং খলীফার জন্য একটি বড় অংকের অর্থ নির্ধারণ করে দিলেন।[২]

খলীফার কন্যার সাথে তুগরীলের বিবাহ

৪৫২ হিজরীর (১০৬০ খৃষ্টাব্দ) যুলকা'দা মাসে সুলতান তুগরীলের স্ত্রী যানজানে ইন্তিকাল করেন। স্ত্রীর প্রতি তার ছিল গভীর ভালবাসা। পরের বছর তুগরীল রায়-এর কাজী আবু সা'দের মাধ্যমে খলীফার কন্যাকে[৩] তার সাথে বিয়ে দেয়ার জন্য খলীফার কাছে পয়গাম পাঠালেন। এ ধৃষ্ঠতা খলীফা পসন্দ করলেন না। তিনি আবু তামিমীকে এ নির্দেশ পাঠালেন যে, তিনি যেন তুগরীলকে এ আকাংখা পোষণ থেকে বিরত রাখেন এবং তাকে বুঝান যে, এ বিষয়টি খলীফাদের কর্মনীতির পরিপন্থী। কিন্তু এ সত্ত্বেও যদি সে না মানে,

---

১. ইবনে আসীর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭০, ২৭১; যুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-১৬, ১৮, রাওদাতুস সাফা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৮ ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৫, তারিখে গুযীদা, পৃষ্ঠা-৩৫৭, ৩৫৮; আবুল ফিদা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৮, ১৭৯, ইবনু খাল্লিকান, বর্ণ আলিফ, আরসালান বাসাসিরীর জীবন।

২. বাহাতুস সুদূর, পৃষ্ঠা-১১০, ১১১; তারিখে গুযীদা, পৃষ্ঠা-৪৩৮।

৩. ইবনুর রাওয়ানদী খলিফার বোনের কথা উল্লেখ করলেও অন্য কোনো ইতিহাসে তার সমর্থন পাওয়া যায় না।

www.bjilibrary.com

তাহলে তার কাছে মহরানা হিসেবে তিন লাখ দিনার এবং ওয়াসেতের গোটা কর্তৃত্ব যেন দাবি করে। রায়-এ পৌঁছার পর এ দূত উযীর আমীদুল মালেকের সাথে সাক্ষাত করেন এবং তিনি যে জবাব নিয়ে এসেছিলেন তা তাকে শুনান। আমীদুল মালেক বললেন ঃ সুলতানকে অস্বীকৃতিমূলক জবাব দেয়া ঠিক নয়। কারণ, এ সম্পর্কের জন্য তিনি অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন এবং সনির্বন্ধ অনুরোধের সাথে খলীফার কাছে আবেদন করেছেন। তাছাড়া অর্থ দাবি করা এ জন্য উচিত নয় যে, তোমরা যে পরিমাণ অর্থ দাবি করছো তিনি আপনা থেকেই তার চেয়ে কয়েকগুণ অধিক অর্থ দিতে প্রস্তুত আছেন। এতে দূত বললেন ঃ আপনার বিচারে যা যথোপযুক্ত মনে হয় তাই করুন। এ কাজের দায়িত্ব আমি আপনার উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি। দায়িত্ব অর্পণের এ সুযোগ গ্রহণ করে আমীদুল মালেক সুলতানকে জানিয়ে দিলেন যে, খলীফা আপনার পয়গাম মঞ্জুর করেছেন। এতে সুলতান অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং মহত্ত্ব ও গৌরব প্রকাশের জন্য তিনি এই বাগদানের বিষয় আম ঘোষণা করলেন। কারণ, এটি ছিল এমন এক সম্মান ও গৌরব যা ইতিপূর্বে আর কোনো বাদশাহ লাভ করেননি। এমনকি অতি বড় কোনো বাদশাহর পক্ষে এর আকাংখা পোষণের সাহসও হয়নি। এরপর তুগরীল তার ভাতিজী খলীফার স্ত্রী আরসালান খাতুনকে বিবাহপূর্ব উপঢৌকন হিসেবে নগদ এক লাখ দিনার এবং এক লাখ দিনারের অলংকার ও মণিমুক্তা দিয়ে রায় থেকে বাগদাদ পাঠিয়ে দিলেন এবং তার সাথে আমীদুল মালেক এবং ফারামুর্জ ইবনে কাকওয়াই প্রমূখ বড় বড় আমীরদেরকেও পাঠিয়ে দিলেন। তারা বাগদাদ পৌঁছে তাদের আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করলে খলীফা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি বিবাহের এই সম্পর্ক মেনে নিতে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করলেন এবং একথাও বললেন যে, তোমরা যদি না মান তাহলে আমি বাগদাদ ছেড়ে চলে যাব। এতে আমীদুল মালেকও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। বাগদাদ থেকে তিনি তাঁবু তুলে নিয়ে নাহরোয়ানে স্থাপন করলেন এবং আব্বাসীয়দের কাল প্রতীক বর্জন করে অবাধ্যতার সুস্পষ্ট প্রতীক সাদা রং গ্রহণ করলেন। প্রধান কাজী এবং শায়খ আবু মনসূর ইবনে ইউসুফ এ অবস্থা দেখে আপোষ-রফার প্রচেষ্টা চালালেন। খলীফার উযীর ইবনে দিরাসত ও আমীদুল মালেককে সন্তুষ্ট করার জন্য তাকে দাওয়াত দিলেন। এছাড়া তাদের ফলে খলীফাও এতটা নম্র হলেন যে, তিনি আমীদুল মালেককে লিখলেন ঃ এ বিষয়টি আমরা তোমার ওপরেই ছেড়ে দিচ্ছি। তোমার বিশ্বস্ততা ও দীনদারির ওপর আমাদের বিশ্বাস আছে। এরপর আমীদুল মালেক খলীফার খেদমতে হাজির হলেন। খলীফা তাকে উদ্দেশ করে বললেন ঃ

www.bjilibrary.com

"আমরা বনী আব্বাসের বংশধরগণ শরীয়তের খান্দানের অধিকারী। কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য আমাদের কাছে ইমামত ও নেতৃত্ব থাকবে। যে ব্যক্তি আমাদের সাথে থাকবে সে সত্য-সঠিক পথ লাভ করবে। আর যে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে সে পথভ্রষ্ট হবে।"

জবাবে আমীদুল মালেক বললেন, যদি আমাদের প্রভু আমীরুল মু'মিনীন অনুমতি দেন, তাহলে আমি একনিষ্ঠ ও কল্যাণকামী শাহানশাহ রুকনুদ্দীন তুগরীল বেগের এমন কিছু মর্যাদা ও সম্মান বর্ণনা করবো যার কারণে তিনি যে আকাংখা প্রকাশ করেছেন তা গ্রহণ করার উপযুক্ত। খলীফা উপলব্ধি করতে পারলেন যে, এখন সে তুগরীলের খেদমত ও অবদানের কথা বর্ণনা করবে যা উল্লেখের পর তাঁকে লজ্জিত হয়েই এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য তিনি বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন। ফলে আমীদুল মালেক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাদের দলটি ২৬শে জমাদিউ সানী সুলতানের প্রেরিত বিবাহপূর্ব উপঢৌকনের মাল ও সামগ্রী নিয়ে বাগদাদ থেকে ফিরে গেল এবং হামদানে তুগরীল বেগের কাছে পৌঁছে সকল ঘটনা বর্ণনা করলো। এতে তুগরীল খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি প্রধান বিচারপতি এবং শায়খ আবু মনসূর ইবনে ইউসুফকে লিখলেন ঃ

"আমি খলীফার জন্য যেসব খেদমত আঞ্জাম দিয়েছি এটা তারই প্রতিদান। তাঁর কারণে আমি আমার ভাইকে হত্যা করেছি। তাঁর জন্য আমার অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছি, তাঁর সাহায্যের নিমিত্তে আমার জন্য জীবন কুরবানকারী সংগী-সাথীদের খুন ঝরিয়েছি। আজ আমি এসব কাজের প্রতিদান লাভ করলাম এই যে, তিনি আমার প্রস্তাবকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন।"

একদিকে তুগরীল ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়াপূর্ণ এ পত্র লিখলেন অন্যদিকে আমীদুল মালেক নির্দেশ দিলেন যে, খলীফাকে যেসব জায়গীর দেয়া হয়েছে, ঐ সব জব্দ করে নেয়া হোক এবং শুধুমাত্র সেসব জায়গীর তার জন্য বহাল থাকবে যা পূর্ব থেকেই ইমাম কাদের বিল্লাহর নামে চলে আসছে। তিনি আরো নির্দেশ দিলেন যে, আরসালান খাতুনকে খলীফার নিকট থেকে ফিরিয়ে আনা হোক। তিনি এর চেয়েও কঠোর কর্মপন্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ৪৫৪ হিজরীর মুহাররম মাসে (১০৬৩ খৃষ্টাব্দ) খলীফা নিজেই হার স্বীকার করে এ বিবাদের অবসান ঘটালেন। তিনি আমীদুল মালেকের নামে বিয়ের উকালতনামা লিখলেন, প্রধান বিচারপতি এবং ইবনে ইউসুফ প্রস্তাব গ্রহণের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করলেন এবং আবুল গানায়েম ইবনে আল-মাহলাবান এসব কাজগ-পত্র নিয়ে তুগরীলের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি সে সময় তাবরীজের বাইরে অবস্থান করছিলেন। ৪৫৪ হিজরীর শা'বান মাসে বিয়ে সম্পাদিত হয় এবং শাওয়াল মাসে সুলতানের পক্ষ থেকে মূল্যবান উপহার দিয়ে ইরাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে

www.bjilibrary.com

বাগদাদ প্রেরণ করা হলো। ঐসব উপহারের মধ্যে ত্রিশজন তুর্কী দাসদাসী, ত্রিশটি অশ্ব, দু'জন খাদেম, মণিমুক্তা ও স্বর্ণের কারুকার্যখচিত জিনসহ একটি উন্নতজাতের ঘোড়া, খলীফার জন্য দশ হাজার দিনার, বা'কূবা অঞ্চল, সুলতানের প্রথম স্ত্রীর পরিত্যক্ত সমস্ত ইরাকী জায়গীর, প্রতিটি এক মিসকাল ওজনের ত্রিশটি মোতি খচিত হার, কন্যার জন্য নগদ দশ হাজার দিনার, রাজকুমার উদ্দাতুদ দীনের জন্য পাঁচ হাজার দিনার এবং কন্যার মায়ের জন্য নগদ তিন হাজার দিনার ছিল। উপহার বহনকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইরাকের সন্নিকটে পৌঁছলে শহরের অধিবাসীরা তাদের স্বাগত জানাতে বেরিয়ে আসলো এবং ইমামত ও সুলতানতের মধ্যে মযবুত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য মোবারকবাদ পেশ করলো। বাবুন নূবীতে পৌঁছে তিনি ভূমি চুম্বন করলেন এবং আরসালান খাতুনের মাধ্যমে এসব উপহার খলীফার দরবারে পেশ করলেন।[১]

কন্যা বিদায়

বিয়ের পর তুগরীল কয়েক মাস আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ায় কাটিয়ে ৪৫৫ হিজরীর মুহাররম মাসে বাগদাদে উপস্থিত হলেন এবং আমীদুল মালেকের মাধ্যমে খলীফার কাছে কন্যাকে বিদায় দিতে আবেদন জানালেন। জবাবে খলীফা বললেন ঃ তোমার লিখিত শর্তাবলী আমার কাছে আছে। এ বিয়ের মাধ্যমে নবী বংশের সাথে তোমার সম্পর্ক হবে এটাই ছিল তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য। তোমার সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। তুমি মর্যাদালাভের প্রত্যাশী ছিলে, একত্রিত হওয়ার নয়। এখন যদি কেবল কন্যা দর্শন লাভ করতে চাও, তাহলে তার ব্যবস্থা রাজধানীতেই হতে পারে। তুগরীল এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। কিন্তু আবেদন জানালেন যে, নববধূকে দারুল মামলাকাতে স্থানান্তরিত করা হোক যেখানে তার জন্য প্রাসাদ, খাদেম, সেবিকা এবং স্বতন্ত্র দ্বার রক্ষী নিয়োগ করা হবে। সুতরাং ১৫ই সফর তাকে দারুল মামলাকাতে স্থানান্তরিত করা হলো। তিনি একটি স্বর্ণ সিংহাসনে উপবেশন করলেন। সুলতান তার কাছে হাজির হলেন, তার সামনে ভূমি চুম্বন করলেন এবং তাকে অতীব মূল্যবান উপহার-উপঢৌকন দান করলেন। কিন্তু রাজকুমারী না সুলতানের সামনে দাঁড়ালেন, না তার চেহারার নেকাব উঠালেন। সুলতান এভাবে এক সপ্তাহ যাবত যাতায়াত করতে থাকলেন এবং এই মর্যাদা ও গৌরবের আনন্দে মানুষের মধ্যে অঢেল দান-দক্ষিণা করতে থাকলেন।

---

১. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮-৯; যুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-১৯, ২২; রাহাতুস সুদূর, পৃষ্ঠা-১১১; তারীখে ওযীদাহ, পৃষ্ঠা-৪৩৮।

www.bjilibrary.com

তুগরীলের মৃত্যু

রবিউল আউয়াল মাসে সুলতান রায় অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং খলীফার অনুমতি নিয়ে নববধু ও আরসালান খাতুনকেও নিয়ে গেলেন। আরসালান খাতুন নিজেই যাওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। কারণ, তার অভিযোগ ছিল যে, খলীফার কাছে তার আর পূর্বের ন্যায় মর্যাদা নেই। রায় পৌছার পর তিনি অকস্মাত অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং সত্তর বছর বয়সে ৪৫৫ হিজরীর (১০৬৩ খৃষ্টাব্দ) রমযান মাসে মৃত্যু মুখে পতিত হলেন।[১] কথিত আছে যে, ঐ সময় প্রচণ্ড গরম পড়ছিলো। ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্য সুলতান রায়-এর বাইরে তাজ্জারাশ্‌ত নামক গ্রামে তাঁবু খাটালেন। এখানে হঠাৎ তিনি নাসিকা থেকে রক্তক্ষরণ রোগে ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়েন যে, কোনোক্রমেই তা বন্ধ হয় না। শেষ পর্যন্ত তিনি দৈহিক শক্তি হারিয়ে ফেলেন এবং তার জীবনাবসান ঘটে।[২] শেষ মুহূর্তে তিনি তার শুশ্রূষাকারীদের বলছিলেন যে, আমার উদাহরণ দেয়া যেতে পারে এমন মেষের সাথে যাকে পশম কাটার জন্য বেঁধে রাখা হয়। কিন্তু সে মনে করে যে, তাকে জবাই করার জন্য বাঁধা হচ্ছে, তাই খুব চেঁচামেচি করে। কিন্তু বন্ধনমুক্ত করে দিলে অত্যন্ত আনন্দিত হয়। কিন্তু যখন পুনরায় তাকে জবাই করার জন্য বাঁধা হয়, তখন সে মনে করে যে, আমাকে পশম কাটার জন্য বাঁধা হয়েছে। তাই সে চুপচাপ পড়ে থাকে। অথচ তখন তাকে জবাই করে ফেলা হয়। এই রোগে আমার হাত-পা জবাই করার জন্য বাঁধা হয়েছে।[৩]

তুগরীলের চরিত্র

তুগরীল ছিলেন অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী। তিনি যে সফলতার সাথে সালজুকদের পথপ্রদর্শন করে গজনবীদের নিকট থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন এবং ২৬ বছরের শাসনকালের মধ্যে যেভাবে মধ্যপ্রাচ্য তছনছ করে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য কায়েম করেন তা তার রাজনীতি ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা, বীরত্ব ও সাহসিকতা এবং উন্নত নেতৃত্ব গুণের পরিচালক। তিনি ৩০ বছর পূর্বে তার গোত্রের কয়েক হাজার যাযাবর ও সহায়-সম্বলহীন লোকের সাথে যে অবস্থায় খুরাসান আগমন করেছিলেন সে সম্পর্কে বিগত অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা

---

১. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯-১০; যুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-২৫-২৬; রাহাতুস সুদূর, তারীখে গুযীদাহ এবং রাওদাতুস সাফার লিখক বৃন্দ অত্যন্ত সংক্ষেপ করতে গিয়ে এ বর্ণনার বিকৃতি ঘটিয়েছেন।

২. রাহাতুস সুদূর, পৃষ্ঠা-১১২; তারীখে গুযীদাহ, পৃষ্ঠা-৪৩৯।

৩. যুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-২৭।

www.bjilibrary.com

হয়েছে। পাঁচ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তিনি চাগরী বেগ দাউদ ও মূসা বেগুকে সাথে নিয়ে গজনবী সালতানাতকে পরাভূত করেন এবং শুধুমাত্র খুরাসান প্রদেশ নিয়ে গঠিত দেশকে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেন এবং নিজের জন্য শুধু তুস ও রায়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছোট্ট অঞ্চলটি নিজের জন্য রাখেন। এই ক্ষুদ্র অঞ্চল থেকেই তিনি তার নিজের সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের কাজ শুরু করেন এবং ২৪ বছরের মধ্যে জুরজান, তাবারিস্তান, আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, জিবাল, ইস্পাহান, কুর্দিস্তান, ফারেস, কিরমান, খুজিস্তান, ইরাক ও আলজাযিরা অধিকার করে বুওয়াইহিয়া সাম্রাজ্যকে পদদলিত করেন। রোম ও আবখায সাম্রাজ্যকে কাবু করে এবং বাগদাদের খলীফার খেদমত ও হিফাজতের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিয়ে ইসলামী দুনিয়ায় কেন্দ্রীয় মর্যাদা অর্জন করেন। মূলত বেদুঈন বংশোদ্ভূত একজন তুর্কী সিপাহীর মরুভূমির একজন মা'মুলি গোত্রপতি হিসেবে জীবন শুরু করে সিকি শতাব্দীর মধ্যে এতটা শক্তি অর্জন করা একথাই প্রমাণ করে যে, তার মধ্যে পরিস্থিতি উপলব্ধি করে তা কাজে লাগানোর অসাধারণ যোগ্যতা ছিল।

দিগ্বিজয়ী এবং শাসক হওয়া ছাড়াও একজন মানুষ হিসেবেও তিনি বহুবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন। তার চরিত্রে মহানুভবতা ও বিশ্বস্ততার গুণাবলী ছিল সুস্পষ্ট। কাজী আবুল হাসান মাওয়ারদী বলেন, ৪৩৩ হিজরীতে খলীফা কায়েম বি আমরিল্লাহ যখন প্রথম প্রথম আমাকে দূত হিসেবে তার কাছে পাঠিয়েছিলেন তখন আমি তাঁর সম্পর্কে খলীফাকে একখানা পত্র লিখেছিলাম। ঐ পত্রে আমি তার এবং তার শাসনব্যবস্থার অনেক মন্দ দিক তুলে ধরেছিলোম। ঘটনাক্রমে পত্রখানা আমার খাদেমের হাত থেকে পড়ে যায় এবং তা তুগরীল বেগের হাতে পৌঁছে যায়। তিনি ঐ পত্র পাঠ করেন এবং নিজের কাছে তা সংরক্ষণ করেন। কিন্তু তার কথার মাধ্যমে কোনোদিনও একথা প্রমাণ হতে দেননি যে, তিনি পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত।[১] তাছাড়া বদান্যতা ও উদারতার মাধ্যমে শত্রুকে কিভাবে বশ করতে হয় তা তিনি ভাল করেই জানতেন। আবখাযের বাদশাহ ইবরাহীম ঈনালের হাতে বন্দী হলে তার মুক্তির জন্য ইবরাহীম চার লাখ দিনারের বিনিময়েও যথেষ্ট মনে করেননি। কিন্তু রোমের কাইজারের আবেদনে সাড়া দিয়ে তুগরীল তাকে বিনা পণে মুক্তিদান করেন এবং সম্মানের সাথে বিদায় দেন। এর ফল দাঁড়ায় এই যে, রোমান সালতানাতের সাথে তার বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে এ সম্পর্ক তার প্রভাব অনেক গুণে বর্ধিত করে দেয়। ঐতিহাসিকগণ তার দীনদারির কথাও উল্লেখ

১. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১ ; যুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-২৭।

www.bjilibrary.com

করেছেন। তারা লিখেছেন যে, তিনি ছিলেন নিয়মিত নামায আদায়কারী এবং সোম ও বৃহস্পতিবারে কঠোরভাবে রোযা পালনকারী। অবশ্য তার এই দীনদারির ওপর প্রতিশ্রুতি ও বিশ্বাসভঙ্গের এবং যুলুম-নির্যাতনের কিছু কুৎসিত দর্শন কলঙ্কও ছিল।

তুগরীলের সাফল্যের কারণসমূহ

নিশাপুর বিজয় থেকে শুরু করে তুগরীলের মৃত্যু পর্যন্ত ২৬ বছর কয়েক মাস সময়ের মধ্যে সালজুকরা যে সাফল্য লাভ করেছে তার সম্পূর্ণ বিবরণ পাঠ করলে জানা যায় যে, এটা কোনো আকিস্মক সাফল্য ছিল না, বরং এর পেছনে ছিল কার্যকারণসমূহ। খুরাসান অধিকারের পর সালজুক নেতারা বড় রকমের যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন, তাহলো তারা আপোষে নিজেদের মধ্যে দেশ ভাগ করে নেন এবং নিজেদের জন্য প্রভাব বিস্তারের আলাদা আলাদা অঞ্চলও নির্দিষ্ট করে নেন। ফলে তাদের জন্য যে সুবিধা অর্জিত হয় তা হচ্ছে—নিজেদের মধ্যে বিবাদ ও সংঘাতের সম্ভাবনা তিরোহিত হয় এবং পরস্পরের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত ও নিশ্চিন্ত হয়ে প্রতিবেশী দেশসমূহ অধিকার করতে নিজেদের শক্তি ব্যয় করতে থাকেন। তাদের শক্তির মূলকেন্দ্র ছিল খুরাসান। এখানে তাদের শাসনের কেন্দ্র যে শুধু নিরাপদ ছিল তাই নয়। বরং তাদের প্রত্যেকের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দুই দুইজন সাহায্যকারী বর্তমান ছিল যাদেরকে প্রয়োজনের মুহূর্তে সাহায্যের জন্য ডেকে নেয়া যেতো। একদিকে সালজুকরা এভাবে যুথবদ্ধ ছিল, অন্যদিকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ ছোট ছোট রাষ্ট্র হিসেবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তাদের মধ্যে কোনো ঐক্য ছিল না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতা। বাগদাদে দায়লামীদের একটি বিশাল সালতানাত ছিল বটে, কিন্তু জালালুদ্দৌলার মৃত্যুর পর তার অবশিষ্ট শক্তিও নিঃশেষিত হয়েছিলো। আবু কালীজার সালজুকদের সাথে সন্ধি ও বন্ধুত্ব কায়েম করে তা টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট হন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর আল মালেকুর রাহীম ও তার ভাইদের মধ্যে যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তা এই সালতানাতকে এমনভাবে মৃত করে ফেলে যে, তুগরীলকে শুধু তার জানাযা ও কাফন-দাফনের কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সালজুক সালতানাতের এত দ্রুত ও এত সহজে প্রসারিত হওয়া ছিল একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। এ সাফল্যের ক্ষেত্রে সালজুকদের বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা যতটুকু ছিল ঠিক ততটুকুই ছিল তাদের প্রতিপক্ষসমূহের নির্বুদ্ধিতার ভূমিকা।

www.bjilibrary.com

তুগরীলের সালতানাতের ব্যবস্থাপনা

এবার তুগরীলের সালতানাতের ব্যবস্থাপনার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, প্রাচীন ইতিহাসসমূহে তার রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার পূর্ণ সবিস্তার আলোচনা নেই। তা সত্ত্বেও গভীরভাবে অধ্যয়নের ফলে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তা থেকে তার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার একটি অস্পষ্ট চিত্র লাভ করা যায়।

তুগরীল তার সালতানাতের ব্যবস্থাপনায় দেওয়ানী ও সামরিক বিভাগকে সম্পূর্ণ আলাদা রেখেছিলেন। সামরিক বাহিনী সরাসরি তার নিজের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং তিনি নিজেই ছিলেন প্রধান সেনাপতি। দেওয়ানী বিষয়সমূহের সকল এখতিয়ার প্রধানমন্ত্রীর ওপর ন্যস্ত ছিল। তার নিয়ম ছিল, ব্যবস্থাপনায় দক্ষ ব্যক্তিদের বাছাই করে তাদের ওপর মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব অর্পণ করতেন এবং তাদের এখতিয়ারে হস্তক্ষেপ করতেন না। প্রথমদিকে তার উযীর ছিলেন সালার তুরকান অথবা সালার বুঝকান এবং সম্ভবত সাত বছর পর্যন্ত সে ঐ দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ৪৩৬ হিজরীতে আবুল কাসেম আলী ইবনে আবদুল্লাহ আল জুয়াইনীকে উযীর নিয়োগ করেন। সম্ভবত এর কারণ ছিল এই যে, তিনি সুসভ্য ইসলামী দেশসমূহের ওপর শাসন কর্তৃত্ব চালানোর জন্য ঐসব দেশের উপযুক্ত প্রশাসকদের খেদমত করার প্রয়োজন অনুভব করে থাকবেন। আবুল কাসেমের পর আবু আবদুল্লাহ আল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মিকাঈল এবং আবু মুহাম্মাদ আল হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আদদিহিস্তানী (যিনি ইসলামে সর্বপ্রথম নিজামুল মুলক উপাধি লাভ করেছিলেন) পর পর উযীর হন। সর্বশেষে এই পদমর্যাদায় অভিষিক্ত হন[১] আবু নাসর মনসূর ইবনে মুহাম্মাদ আল কুন্দরী যিনি ছিলেন সালজুক সালতানাতের যোগ্যতম উযীর। তিনি তার ওজারতকালে যে সাহসিকতা ও যোগ্যতার সাথে সালজুকদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়সমূহ ব্যবস্থাপনা আঞ্জাম দেন তা দেখে তুগরীল তার সালতানাতের প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বিধানের সকল বিষয় তার ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। তুগরীলের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ছিলেন সালতানাতের সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। আমীর-উমরাদের কেউ-ই তার কাজে নাক গলাতে পারতো না। তুগরীল নিজেও রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে তার মতের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করতেন না।[২]

---

১. ইবনে খাল্লিকান, বর্ণ মীম আমীদুল মালেকের জীবনী।
২. ইবনে খাল্লিকান, বর্ণ মীম, আমীদুল মালেকের জীবনী।

www.bjilibrary.com

তুগরীলের অধীনস্ত সালজুক অধিকৃত অঞ্চলসমূহ ছিল তিন শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল সেইসব স্বাধীন রাজ্যসমূহ। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিষয়ে ঐসব রাজ্যের স্বতন্ত্র এখতিয়ার ছিল। ঐসব রাজ্যের ওপর তুগরীলের এখতিয়ার ছিল শুধু এতটুকু যে, ঐগুলো তুগরীলের রাষ্ট্রকে তাদের চাইতে কর্তৃত্বশালী বলে মনে করতো। এসব রাজ্যের শাসক ছিলেন সেইসব সালজুক নেতা যারা তুগরীলের সাথে একত্রে ঐসব দেশ অধিকার করেছিলো। অর্থাৎ চাগরী বেগ দাউদ ও মূসা বেগু। প্রথমোক্ত রাজ্যটির শাসনকেন্দ্র ছিল মার্ভ। খাওয়ারিজম থেকে তুখারিস্তান পর্যন্ত ছিল এর বিস্তৃতি। এর নেতা চাগরী বেগ তুগরীলের জীবদ্দশায়ই ইনতিকাল করেন[১] এবং তদস্থলে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র আল্প আরসালান সিংহাসন লাভ করেন। শেষোক্ত রাজ্যটির প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল হিরাত। এটি দক্ষিণ খুরাসান, কুহিস্তানের অংশবিশেষ এবং সিস্তানের একটি অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। এর শাসক তুগরীলের মৃত্যুর পরেও জীবিত ছিলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল সেইসব অর্ধ স্বাধীন রাজ্য যেগুলো তুগরীল বাহুবলে অধিকার করেছিলেন কিংবা যেগুলো তার বাহুবল দেখে নিজেরাই আনুগত্য গ্রহণ করেছিলেন। এর নেতাদেরকে তাদের রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় বহাল রাখা হয়েছিলো। অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তারা ছিল স্বাধীন। কিন্তু যেহেতু তাদের আনুগত্য ছিল বাধ্য হয়ে তাই কঠোরভাবে তাদের তত্ত্বাবধান করা হতো। তাদের থেকে ভূমি রাজস্ব আদায় করা হতো, প্রয়োজনে তাদের থেকে সামরিক সেবা চাওয়া হতো এবং শত্রুদেশের সাথে সম্পর্ক রাখা থেকে বিরত রাখা হতো। জুরজান, তাবারিস্তান, ইস্পাহান, ফারেস, খুজিস্তান, ইরাক, কুর্দিস্তান, আজারবাইজান, আলজাযিরা এবং আর্মেনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় এসব রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এদের স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব ছিল না। কারণ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ঐসব রাজ্যকে টিকিয়ে রাখা হতো এবং যখন ঐ উদ্দেশ্য অবশিষ্ট থাকতো না। তখনই ঐসব রাজ্যের অস্তিত্বও নিশ্চিহ্ন করা হতো। এসব রাজ্য অনেক সময় নিজেই শত্রুতামূলক আচরণ করতো এবং সেটাই হতো তার ধ্বংসের কারণ। এর আগে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে এসব রাজ্যের অবস্থা সম্পর্কে অল্পবিস্তর অবহিত হওয়া যায়।

---

১. চাগরী বেগ দাউদের মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাদ তার মৃত্যুর সন ৪৫০ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন। হামদাল্লাহ মুসতাউফা ৪৫৩ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন এবং কোনো কোনো ঐতিহাসিক ৪৫৩ হিজরীর সফর মাস বলে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু ইবনে আসীর ও আবুল ফিদা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ৪৫১ হিজরীর রযব মাসে ইনতিকাল করেন এবং এটিই মত।

www.bjilibrary.com

তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল সেইসব অঞ্চল যা সরাসরি সুলতান তুগরীলের শাসনাধীন ছিল। নিশাপুর, উত্তর কুহিস্তান, রায়, হামদান, যানজান এবং বাগদাদ ও মুসেলের শাসকগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ছাড়াও হয়তো আরো কিছু প্রদেশের শাসক এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত থেকে থাকবে। সুলতানের পক্ষ থেকে এসব প্রদেশে সামরিক ও দেওয়ানী কর্মকর্তা নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন এবং প্রজাদের নিকট থেকে ভূমিকর আদায় করা হতো।

---

www.bjilibrary.com

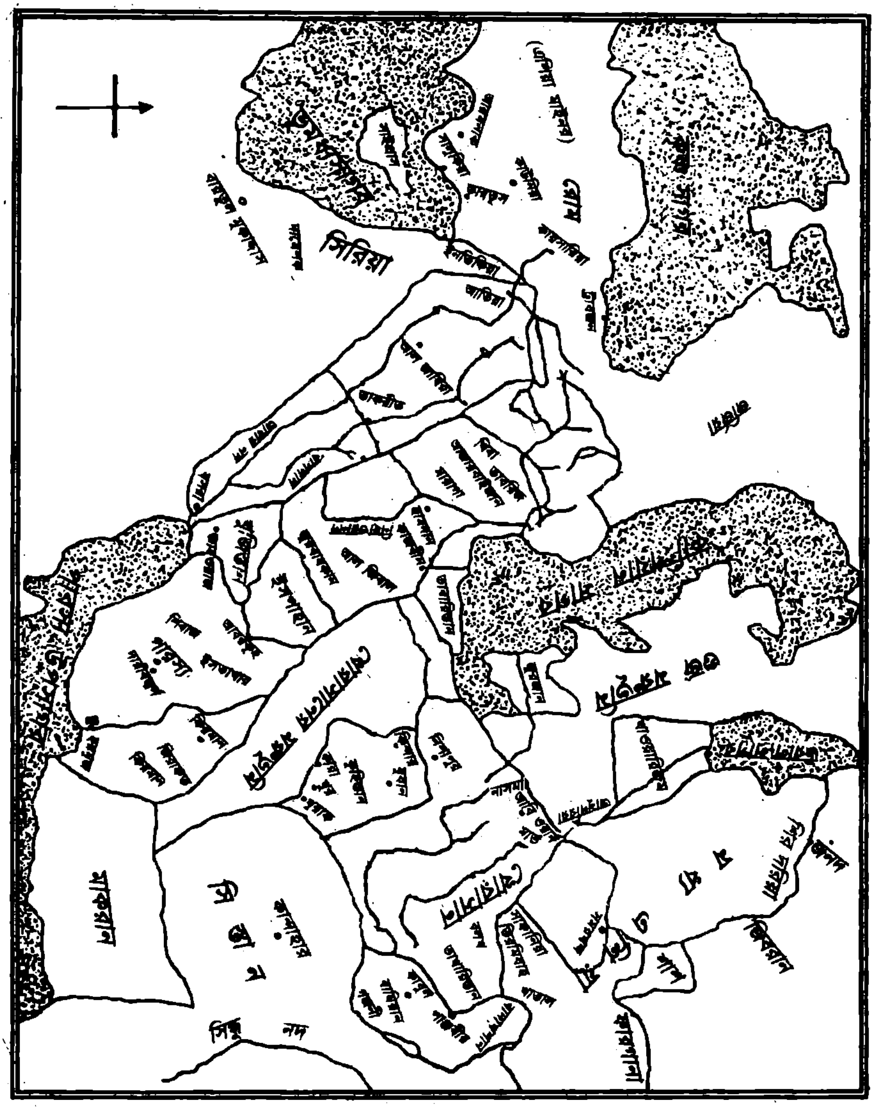

তুগরিল বেগ ও আল্‌প আরসালানের বিজিত অঞ্চলসমূহ

www.bjilibrary.com

তৃতীয় অধ্যায়

উত্থান যুগ

আল্‌প আরসালান

৪৫৫ হিজরী থেকে ৪৬৫ হিজরী

১০৬৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১০৭২ খৃষ্টাব্দ

তুগরীল বেগ ছিলেন নিসন্তান। তাই অনিবার্যরূপে তাঁকে তার ভাই চাগরী বেগ দাউদের সন্তানদের মধ্যে থেকে কাউকে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে হয়। দাউদের কয়েকজন পুত্র ছিল। তাদের মধ্যে থেকে আল্‌প আরসালান, ইয়াকূতী, কাওয়ার্ত বেগ ও সুলায়মান প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছিল। সম্ভবত তুগরীলের আকাংখা ছিল এই যে, মার্ভ রাজ্যটি যথারীতি আলাদাই থাক। এ কারণে তিনি আল্‌প আরসালানের যোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও তাকে তার স্থলাভিষিক্ত করার জন্য মনোনীত করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। অবশিষ্ট সন্তানদের মধ্যে তার সবচেয়ে বেশী সম্পর্ক ছিল সুলায়মানের সাথে। কারণ, চাগরী বেগের মৃত্যুর পর তুগরীল সুলায়মানের মাকে বিয়ে করেছিলেন। অতএব, মৃত্যুর সময় তিনি সুলায়মানের অনুকূলে অসীয়ত করে যান এবং সেই অনুসারে উযীর আমীদুল মালেক তাকে রায়-এর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন।[১] কিন্তু কতিপয় আমীর-উমরা তার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তাদের মধ্যে থেকে বাগিসিয়ান ও আরওয়ান কাজবীনে (কাস্পিয়ান অঞ্চল) গিয়ে আলপ আরসালানের নামে খুতবা চালু করেন। যেহেতু অধিকাংশ মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট ছিল এবং তিনি খুরাসানে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ফলে আমীদুল মালেকও তার প্রথম কৃতকর্মের প্রতিবিধানের প্রয়োজন অনুভব করেন। সুতরাং তিনি খুতবায় সুলায়মানের নামের পূর্বে আল্‌প আরসালানের নাম উল্লেখ করতে শুরু করেন।[২]

---

১. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩ ও ১১; আবুল ফিদা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮০; যুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-২৬, ২৭; তারীখে গুযীদা, পৃষ্ঠা-৪৩৮, ৪৩৯; ইবনে খাল্লিকান, মীম বর্ণ, আল্‌প আরসালানের জীবনী রাওদাতুস সাফার গ্রন্থকার লিখেছেন যে, তুগরীল আল্‌প আরসালানের অনুকূলে অসীয়ত করেছিলেন, একথা ভুল। রাহাতুস সুদূরের গ্রন্থকার ভুলবশত সুলায়মানকে তুগরীলের পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ উপরোক্ত চারজন ঐতিহাসিকের সুস্পষ্ট বর্ণনানুসারে সে ছিল তার স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত সন্তান।

২. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১, ১২; যুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-২৮; ইবনে খাল্লিকান, আল্‌প আরসালানের জীবনী।

www.bjilibrary.com

বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধের মূলোৎপাটন

একদিকে সালতানাতের মধ্যে এই দ্বৈত শাসকের অভ্যুদয় হলো অন্যদিকে তুগরীল বেগের মৃত্যুর খবর শোনামাত্র সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দিল। খুতযান এবং সাগানিয়ান অথবা চাগানিয়ানের আমীর-উমরাগণ আনুগত্যের শৃঙ্খল ছুঁড়ে ফেললো। হিরাতে মূসা বেগু সিংহাসনের দাবিদার হয়ে বসলো এবং খোরকোহে কুতলুমুশ ইবনে ইসরাঈল (দাউদের চাচাতো ভাই এবং আল্‌প আরসালানের চাচা) তুর্কমানদের সংঘবদ্ধ করে তার নিজের বাদশাহীর পতাকা উড্ডীন করলো। আল্‌প আরসালান প্রথমে আমীর খুতলানকে হত্যা করে তার এলাকা দখল করেন এবং তারপর বেগুর মস্তক চূর্ণ করার জন্য অগ্রসর হন এবং তাকে পরাস্ত করে হিরাত রাজ্যের শাসক হিসেবে বহাল থাকেন। অতপর ফিরে এসে আমীর সাগারিনয়ানের ওপর আক্রমণ করেন এবং তাকে হত্যা করে তার সমগ্র এলাকা সরাসরি নিজের কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসেন।[১] পূর্বদিক থেকে অবসর নিয়ে তিনি পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন যাতে এই দ্বৈত শাসন উৎখাত করে সালজুক সালতানাতের অধিকৃত সকল অঞ্চলকে একটি কেন্দ্রের অধীনে নিয়ে আসতে পারেন। সবেমাত্র তিনি নিশাপুরে উপস্থিত হয়েছেন এমন সময় কুতলুমুশের বিদ্রোহের খবর এসে পৌঁছে এবং জানা যায় যে, সে একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে রায় দখলের জন্য অগ্রসর হচ্ছে। এ খবর পাওয়া মাত্র আল্‌প আরসালান তার সেনাবাহিনীর একটি অংশকে অবিলম্বে প্রেরণ করেন যারা দ্রুত মরুভূমি অতিক্রম করে কুতলুমুশের পূর্বেই রায় গিয়ে উপনীত হয়। অপরদিকে ৪৫৬ হিজরীর মুহাররম মাসে তিনি নিজে কুম হয়ে রায়-এর দিকে অগ্রসর হন এবং দামেগানে পৌছার পর চিঠি পত্রের মাধ্যমে তাকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে তার তুর্কমান সেনাদের গর্বে এসব কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপই করে না এবং রায়-এর নিকটবর্তী একটি পাহাড়ী নদীর পানি কৃত্রিমভাবে প্রবাহিত করে নিজের সম্মুখভাগে একটি প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা লাইন সৃষ্টি করেন। আল্‌প আরসালান যখন যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর দেখলেন না, তখন তিনি অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করলেন এবং অতি সহজেই পানি অতিক্রম করে কুতলুমুশের দোরগোড়ায় গিয়ে হাজির হন। যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে তুর্কমানরা পরাজিত হয়ে গার্ডকোহের দিকে পালিয়ে যায় এবং কুতলুমুশ নিহত হয়। তার মৃত্যুতে আল্‌প আরসালান খুবই ব্যথিত হন। তিনি খুব কাঁদেন এবং তার জন্য শোকসভা করেন।[২]

---

১. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩, ১৪; আবুল ফিদা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৪।

২. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪, ১৫; আবুল ফিদা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৪, ১৮৫ ; ইবনে খাল্লিকান, আল্‌প আরসালান সম্পর্কিত আলোচনা; যুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-২৮, ২৯; তারীখে গুযীদা, পৃষ্ঠা-৪৩৯। পরবর্তীকালে এ কুতলুমুশের সন্তানরাই রোম সাম্রাজ্যের মালিক হন এবং রোমে সালজুক নামে খ্যাতি লাভ করে।

www.bjilibrary.com

রায় অধিকার এবং আমীদুল মালেকের গ্রেফতারী

মুহাররমের শেষভাগে আল্‌প আরসালান বিজয়ীর বেশে রায়-এ প্রবেশ করেন এবং সুলায়মানকে অপসারণ করে নিজে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এ সময় আমীদুল মালেক তার সাথে একটা আপোষ রফা করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন এবং সুলায়মানকে সিংহাসনে বসানোর কারণে তার মনে যে সন্দেহ সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করতে সচেষ্ট হন। তাই তিনি আল্‌প আরসালানের কাছে (সেই সময় পর্যন্ত যিনি শুধু হাসান ইবনে আলী তূসী নামে পরিচিত ছিলেন) সুপারিশ কামনার জন্য যান এবং আল্‌প আরসালানের অন্যান্য আমীর-উমরাদেরকেও অর্থের বিনিময়ে পরিতৃপ্ত করতে ও পক্ষে আনতে চেষ্টা চালাতে থাকেন। কিন্তু তার এ কর্মপদ্ধতি তার বিপদ লাঘব করার পরিবর্তে তার সাথে আরো রূঢ় ও নির্দয় আচরণের কারণ হয়। এ গোপন যোগসাজশের কারণে তার প্রতি আল্‌প আরসালানের খারাপ ধারণা আরো বৃদ্ধি পায়। তিনি ৪৫৬ হিজরী সনের মুহাররমের শেষভাগে অথবা সফরের প্রথমভাগে তাকে গ্রেফতার করে মারবুররুদে পাঠিয়ে দেন। বছরের শেষভাগ পর্যন্ত তিনি এখানেই বন্দী থাকেন। ৪৫৬ হিজরীর ১৬ই যিলহাজ্জ তাকে হত্যা করা হয়।[১]

বাগদাদে খুতবা পাঠ

এই ব্যবস্থাপনা শেষে সুলতান খলীফা কায়েম বিআমরিল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার ফন্দি করেন। কারণ, তখনো পর্যন্ত বাগদাদে তার সালতানাতকে স্বীকার করা

---

১. হত্যার সময় আমীদুল মালেকের বয়স ৪০ বছরের কিছু বেশী ছিল। তিনি আট বছর পর্যন্ত তুগরীল বেগের মন্ত্রী ছিলেন। অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। তার সম্পর্কে ইবনে খাল্লিকান বলেন ঃ كان من رجل الدهر جواد وسخاء وكتابه وشهادة "বদান্যতা, ঔদার্য, মহত্ব ও লেখনীর দিক থেকে তিনি ছিলেন যুগ মানব।" কিন্তু নিজের ভ্রান্ত কৌশল ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা অনেককেই তার বিরোধী বানিয়ে নিয়েছিলেন। তাই প্রথমে তিনি তুগরীল বেগের নিকট থেকে খুতবায় শিয়া মতাবলম্বীদের ওপর অভিসম্পাত করার ফরমান লিখিয়ে নেন। এরপর শাফেয়ী ও আশআরী মযহাবকেও এই অভিসম্পাতের অন্তর্ভুক্ত করেন। এতে ইমাম আবুল কাসেম কুশাইরী ও ইমামুল হারামাইন আবুল মাআলী আল জুয়াইনীর মত লোকও হিজরত করে খুরাসান চলে যান। এসব কারণে বড় একদল লোক তার বিরোধী হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত এ বিরোধিতাই তার পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কথিত আছে যে, তাকে হত্যা করার জন্য দু'জন ক্রীতদাস তার কক্ষে প্রবেশ করলে তিনি অসীয়ত করেন ঃ সুলতানকে আমার এই অন্তিম কথা পৌঁছিয়ে দিও যে, আপনার খান্দানের সেবা করে আমি দ্বিবিধ কল্যাণ লাভ করেছি। আপনার চাচা দিয়েছেন আমাকে দুনিয়া। আর আপনার কারণে আমি লাভ করছি দীন। অনুরূপ তিনি নিজামুল মুলকের উদ্দেশ্যে এ বাণী প্রদান করেন যে, তুমি এটি অত্যন্ত খারাপ কাজ করেছো যে, এসব তুর্কী বাদশাহদেরকে উযীরদের হত্যা করার শিক্ষা দিয়েছো। যে ব্যক্তি অন্যের জন্য কূপ খনন করে সে নিজেই তাতে পতিত হয়। (ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২, ১৩; যুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-২৯, ৩০; আবুল ফিদা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৪; ইবনে খাল্লিকান, প্রবন্ধ, মুহাম্মাদ ইবনে মনসূর কুনদুরী। এসব ঐতিহাসিক ছাড়াও এ ঘটনা কিছুটা মতভেদ সহ ইবনুর রাওয়ানদী (পৃষ্ঠা-১১৭, ১১৮), মুসতাওফা (পৃষ্ঠা-৪৩৯) এবং মীর খোন্দ (৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৬) ও বর্ণনা করেছেন।

www.bjilibrary.com

হয়নি এবং তার নামে খুতবা চালু হয়নি। সুলতান এ জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি খলীফার কন্যাকে অতীব সম্মান ও মর্যাদার সাথে কতিপয় আমীর-উমরার হিফাযতে বাগদাদে পাঠিয়ে দিলেন এবং রাইসুল ইরাকাইনের মাধ্যমে এ মর্মে বার্তা পাঠালেন যে, আমি আমীদুল মালেককে শুধু এ বিশ্বাসে গ্রেফতার করেছি যে, সে খলীফার অনুমতি ছাড়াই সাইয়েদাকে রায়-এ নিয়ে এসেছিলেন। এতে খলীফা খুব সন্তুষ্ট হলেন এবং ১৭ই জমাদিউল উলায় তিনি আম দরবার তলব করলেন। এই দরবারে আল্প আরসালানের দূত উপস্থিত হলেন। যথারীতি তার সাম্রাজ্যকে স্বীকৃতি প্রদান করা হলো। তাকে আল ওয়ালাদুল মুয়াইয়াদ জিয়াউদ্দীন আয্‌দুদ্দৌলা উপাধি ও খিলাত প্রদান করা হলো এবং তার নামে বাগদাদে খুতবা চালু হলো। এরপর খলীফার পক্ষ থেকে নকীব তাবরাহুয যায়নীকে বাইআত গ্রহণ ও খিলাত পরিধান করানোর জন্য সুলতানের কাছে প্রেরণ করা হলো। তিনি আজারবাইজানের নাখচুওয়ান নামকস্থানে সুলতানের সাথে সাক্ষাত করলেন।[১]

খৃস্টান আর্মেনিয়া এবং গুর্জিস্তানের ওপর আক্রমণ

৪৫৬ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে (১০৬৪ খৃষ্টাব্দ) সুলতান রায় থেকে আজারবাইজান যাত্রা করেন। মারান্দ নামকস্থানে তাগদাসীন নামক এক তুর্কমান আমীর এসে তাকে রোম সাম্রাজ্যের ওপর আক্রমণ করার পরামর্শ দান করলো। উক্ত আমীর রোমের সীমান্তে বসবাস করতেন। তিনি সে দেশের সামরিক অবস্থা সম্পর্কে সবিশেষ অবগত ছিলেন এবং তার সাথে বহুসংখ্যক অভিজ্ঞ সৈনিকও ছিল যারা রোমান যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে ভালভাবে অবগত ছিল। সুলতান তার পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং তার সাথে আরাস (ARAXES) নদী অতিক্রম করে নাখচুওয়ানে গিয়ে উপনীত হলেন। সেখান থেকে তিনি তার পুত্র মালেক শাহ ও উযীর নিজামুল মুলককে আবখাযে (জর্জিয়া) প্রেরণ করলেন। তিনি ক্রমাগত একের পর এক দুর্গ অধিকার করে আবখাযের শাসক বাকরাতর্কে (BOGARTIV) এতটা দুর্বল করে ফেলেন যে, সে নিজেই সন্ধির জন্য প্রস্তাব পেশ করে। বাৎসরিক জিযিয়া দিতে স্বীকৃত হয় এবং নিজের কন্যাকে সুলতানের সাথে বিয়ে দেয়। এরপর সুলতান মালেক শাহ এবং নিজামুল মুলককে ডেকে পাঠান এবং গোটা সেনাবাহিনী নিয়ে খৃষ্টান আর্মেনিয়ায়[২] অভিযান শুরু করেন। তিনি সাপীদ শহর অধিকার করে দু'দিকে

---

১. ইমাদ কাতেব ও হামদাল্লাহ মুসতাওফী বর্ণনা করেছেন যে, গুর্জিস্তানের এই রাজ কুমারীকে আল্প আরসালান পরে তালাক দেন এবং তারই নির্দেশে নিজামুল মুলক তাকে বিয়ে করেন।−(যুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-৩১; তারীখে গুযীদাহ, পৃষ্ঠা-৪৪১)

২. সেই সময় আর্মেনিয়া দু'টি অংশে বিভক্ত ছিল। ইসলামী আর্মেনিয়ার রাজধানী ছিল দিচল এবং খৃস্টান আর্মেনিয়ার রাজধানী ছিল আনী।

www.bjilibrary.com

পাহাড় ও দু'দিকে নদী এবং চারদিকে উঁচু পাহাড়ের ওপর নির্মিত মযবুত দুর্গসমূহ দ্বারা বেষ্টিত আ'আল লাআল অভিমুখে অগ্রসর হন। সুলতান নদীর ওপর পুল নির্মাণ করে নদীর অপর পারে সৈন্য নিয়ে যান এবং শহরের ওপর আক্রমণ করেন। কিছু সময় ধরে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। অতপর শহরবাসীদের পক্ষ থেকে দু' ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নিরাপত্তা প্রার্থনার সংকেত দেন। সুলতান তা বিশ্বাস করেন এবং একদল সৈনিককে শহরের দখল নেয়ার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু সৈন্যরা দুর্গ প্রাচীর অতিক্রম করে ভেতরে প্রবেশ মাত্র তারা ফটক বন্ধ করে দেয় এবং সবাইকে হত্যা করে এবং তারপর দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ সুলতানের সেনাবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুলতানের পক্ষের সবাই সন্ধির ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল। আকস্মিক এই আক্রমণ কিছুক্ষণের জন্য গোটা সেনাবাহিনীর মধ্যে ভীতি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। সুলতান তখন নামাযরত ছিলেন। এই বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও তার হৃদয়ের প্রশান্তিতে কোনো ভাটা পড়লো না। তিনি পূর্ণ প্রশান্তি ও গাম্ভীর্যের সাথে নামায আদায় করতে থাকলেন। অতপর জায়নামায থেকে উঠে ঘোড়ার পিঠে বসলেন এবং তাঁর আগমনের সাথে সাথে যুদ্ধের চিত্র পাল্টে গেল। প্রচণ্ড মোকাবিলার পর শহরবাসীরা পরাস্ত হলো। ক্রুদ্ধ বিজয়ী সৈন্যরা শহরে প্রবেশ করে অগ্নি সংযোগ করলো। এর কারণ ছিল শহরবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং পুরো একটি পল্টনকে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে হত্যা করায় সালজুক সৈন্যরা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ছিল। সুলতান তাদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম ছিলেন। অন্যথায় তিনি সদাসর্বদা বিজিতদের সাথে ভদ্রোচিত ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিলেন।

রযব মাসে আল্প আরসালান পশ্চিম গুর্জিস্তানে অগ্রাভিযান চালিয়ে কার্স (KARS) অঞ্চল অধিকার করেন এবং সেখান থেকে পেছন দিকে অগ্রসর হয়ে রাজধানী আনীতে আগমন করেন এবং আরযানুর রোমের সন্নিকটে আরাস নদীর তীরে অবস্থিত খৃস্টান আর্মেনিয়ার রাজধানী আনী শহরে আগমন করেন। এই শহরের জাঁকজমক ও বিশালত্ব ছিল এমন যে, এখানে গীর্জার সংখ্যাই ছিল প্রায় পাঁচ শ'। এর চারদিকে ছিল পানি এবং শুধু একটি পুলের সাহায্যে পারাপার ও যাতায়াত চলতো। এ কারণে সুলতান কাঠের একটি বিরাট টাওয়ার নির্মাণ করেন এবং তার ওপর মিনজানিক স্থাপন করে প্রাচীরের ওপর পাথর বর্ষণ শুরু করেন। বিরামহীন এই পাথর বর্ষণে ভীত হয়ে রোমানরা প্রাচীরের ওপর থেকে সরে যায়। তারা সরে যাওয়ার সাথে সাথে খনৎকাররা প্রাচীরের মূলে ফাটল সৃষ্টি করে। এসব ফাটল দিয়ে সালজুক সৈন্যরা শহরে প্রবেশ করে এবং এই শক্তিশালী সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি শক্তির মাধ্যমে

www.bjilibrary.com

অধিকারে আসে।[১] এ বিজয় আর্মেনিয়ার প্রাচীন খৃস্টান রাষ্ট্র বাকারিতার (BAGARTIDS) উচ্ছেদ সাধন করে।

এখানে এসে আল্‌প আরসালান যুদ্ধাভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটান এবং ঐ বছরেই ইস্পাহানে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে কিরমান এবং পরে মার্ভে যান। এখানে তিনি তার বড় পুত্র মালিক শাহের বিয়ে দেন মধ্য এশিয়ার বাদশাহ তাফগাজ খানের[২] কন্যার সাথে এবং অপর পুত্র আরসালান শাহের বিয়ে দেন গজনবীর সুলতান ইবরাহীমের কন্যার সাথে।[৩] সালজুক ও গজনবীদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক এটাই প্রথম। এভাবে দু'টি খান্দানের মধ্যেকার বৈরিতা বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়।

মধ্য এশিয়া (ট্রান্স অক্সাইন) ও তুর্কিস্তান

৪৫৭ হিজরীতে আল্‌প আরসালান তার পিতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করতে উদ্যত হন। তিনি শিরদরিয়া অতিক্রম করে সমগ্র ট্রান্স অক্সাইন অঞ্চল সফর করে আমুদরিয়ার তীরে এসে পৌঁছেন। এখানে জান্দের শাসক নিজে এসে আনুগত্য ও নির্দেশ পালনের প্রতিশ্রুতি দেন এবং তাকে আমুদরিয়ার অপর তীরে তার রাজধানীতে নিয়ে যান যেখানে আল্‌প আরসালানের প্রপিতামহ সালজুকের কবর ছিল। প্রপিতামহের কবর মনে করে সুলতান তার প্রতি অতিমাত্রায় সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করেন এবং তার শাসন পূর্ববৎ বহাল রাখেন। এখান থেকে তিনি সাবারাঞ্চ ও গুরগাঞ্জ হয়ে মার্ভে ফিরে আসেন। এই সফরে কোনো যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াই তার সালতানাতের সীমা আমুদরিয়ার অপর তীরে তুর্কিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।[৪]

মালেক শাহের অভিষেক

৪৫৮ হিজরীর প্রারম্ভে আল্‌প আরসালান মার্ভ থেকে রায়েগাঁ (অথবা রাদগাঁ) আগমন করেন এবং এখান থেকে তিনি তার বড় পুত্র মালেক শাহকে যথারীতি পরবর্তী সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। শাহজাদাকে শাহী তখতে আরোহণ করানো হয়। সুলতান নিজে আনন্দ প্রকাশকারী হিসেবে তার সাথে অংশগ্রহণ করেন। তাকে এনে সোনা খোড়া মণি-মুক্তা খচিত সিংহাসনে বসানো হয়। সুলতান উত্তরাধিকারিত্বের ঘোষণা দিয়ে তাকে মূল্যবান উপদেশ প্রদান

১. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫, ১৭; যুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-৩১; তারীখে গুযীদা, পৃষ্ঠা-৪৪১। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এ যুদ্ধে শুধুমাত্র জর্জিয়া ও আর্মেনিয়া বিজয়ের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু গিবন বলেন ঃ এ আক্রমণের মাধ্যমে সালজুক সৈন্যরা কাপাতোসিয়ার (CAPPADOCIA) রাজধানী কায়সারিয়া পর্যন্ত অধিকার করে নেয়।–(৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫৩, ওয়ার্ল্ড ক্লাসিকস)

২. মালেক শাহ সম্পর্কে আলোচনাকালে তাফগাজ খানের আলোচনা আসবে।

৩. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭, রাওদাতুস সাফা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৬।

৪. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০, আবুল ফিদা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৫।

www.bjilibrary.com

করেন। অতপর সালতানাতের সকল আমীর-উমরা থেকে উত্তরাধিকারিত্বের বাইয়াত গ্রহণ করেন। পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রত্যেককে এ খিলাত প্রদান করেন এবং খুতবায় ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হিসেবে মালেক শাহের নাম পাঠ করার জন্য সালতানাতের মধ্যে নির্দেশও জারি করেন।[১] এ সময় তিনি তার খান্দানের অন্য শাহজাদাদেরকে বিভিন্ন দেশের শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করেন যাতে তাদের অসন্তোষ ভবিষ্যতে কোনো বিপদের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। তাই আমীর ইনাঞ্জ বেগুকে মাজেন্দ্রান, সুলায়মান ইবনে দাউদকে বলখ, আরসালান আরগুনকে খাওয়ারিজম, আরসালান শাহকে মার্ভ, আমীর ইলিয়াসকে সাগানিয়ান ও তুখারিস্তান, মাসউদ ইবনে আরতাশকে বাগশোর ও আশপাশের অঞ্চল এবং মওদূদ ইবনে আরতাশকে ইসফিযারের শাসন কর্তৃত্ব দিয়ে নির্দেশ জারি করেন।[২]

একই সনে আল্‌প আরসালান মুসেলের শারফুদ্দৌলা মুসলিম ইবনে কুরাইশকে আম্বার, হিস্ত, হারবা, সিন্ন ও খাওয়ারিজের শাসন কর্তৃত্ব দান করেন এবং তাকে বিশেষ পুরস্কার ও সম্মানজনক উপাধি দান করেন।[৩]

কিরমান ও ফারেসের বিদ্রোহ

৪৫৯ হিজরীতে কিরমানের শাসক ফারা আরসালান তার উযীরের প্ররোচনায় বিদ্রোহ করেন এবং আল্‌প আরসালানের নামে খুতবা পাঠ বন্ধ করে দেন। এ খবর পাওয়া মাত্র সুলতান সেদিকে মনযোগ দেন। কিরমানের সন্নিকটে যুদ্ধ হয় এবং প্রথম আক্রমণেই কিরমানের সেনাবাহিনীর অগ্রগামী দল পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। নিজের মধ্যে প্রতিরোধের ক্ষমতা নেই দেখে ফারা আরসালান জিরুফতের দিকে পালিয়ে যায় এবং সেখান থেকে আনুগত্য প্রকাশ করে আল্‌প আরসালানের কাছে বার্তা প্রেরণ করে। সুলতান ছিলেন অতীব হৃদয়বান ব্যক্তি। তিনি তাকে শুধু ক্ষমাই করলেন না। বরং কিরমানের শাসন ক্ষমতায় পূর্বের ন্যায় বহালও রাখলেন। তাকে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে দরবারে ডেকে নিলেন এবং তার কন্যাদের বিয়ের যৌতুক হিসেবে প্রত্যেককে নগদ এক লাখ দিনার, মূল্যবান পোশাকাদি এবং জায়গীর প্রদান করলেন।

---

১. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০; রাওদাতুস সাফা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০০। মীরখোন্দ বর্ণনা করেন যে, তিনি ইতিপূর্বেও একবার মালেক শাহের অনুকূলে উত্তরাধিকারিত্বের বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয়বার শুধুমাত্র তা নবায়ন করেছিলেন।-(দেখুন, রাওদাতুস সাফা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৯)।

২. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১; মীরখোন্দ এর বর্ণনা কিছুটা ভিন্ন।-(দেখুন, রাওদাতুস সাফা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৯)

৩. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১; যুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-২৯।

www.bjilibrary.com

ঐ সময়েই ফারেসে বিদ্রোহ হয় এবং কতিপয় দুর্গের অধিকর্তারাও বিদ্রোহ করে বসে। আল্প আরসালান কিরমানের যুদ্ধ শেষ করে ফারেসের দিকে অগ্রসর হন এবং সেখানকার বিখ্যাত দুর্গ ইসতাখার অধিকার করেন। দুর্গের অধিকর্তা আনুগত্য প্রকাশ করে বহু মূল্যবান উপহার পেশ করে যার মধ্যে ছিল ইরানের প্রাচীন বাদশাহ জামশেদের নাম ক্ষোদিত নীলকান্ত মনির একটি পানপাত্র। ইসতাখারের পতনের পর অন্যান্য দুর্গসমূহ আনুগত্য প্রকাশ করতে থাকে। এমনকি একটি মযবুত পাহাড়ের ওপরে নির্মিত সুদৃঢ় দুর্গ বুহনানজাদও বিজিত হয়। এ দুর্গ অধিকার এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, নিজামুল মুলক তীরন্দাজদেরকে তাদের প্রতিটি লক্ষ্যভেদী তীরের জন্য পূর্ণ মুষ্টি দিনার এবং প্রতিটি পাথর দ্বারা সঠিক লক্ষ্যে আঘাত হানার বিনিময়ে একখানা উত্তম বস্ত্র প্রদান করেন। এর ফলে ১৬ দিনের সংক্ষিপ্ত সময়ের অবরোধেই এতবড় বিশাল দুর্গ বিজিত হয়।[১]

এ বছরেই জমাদিউল আউয়াল মাসে আল্প আরসালান তার বোন খাদীজা আরসালান খাতুনকে বাগদাদে ফেরত পাঠান। তিনি ইতিপূর্বে খলীফার প্রতি রুষ্ট হয়ে পিত্রালয়ে চলে এসেছিলেন। খলীফার পক্ষ থেকে তার উযীর ফখরুদ্দৌলা ইবনে জাহীর বাগদাদের বাইরে কয়েক ফারশাখ এগিয়ে এসে তাকে স্বাগত জানান।[২]

শাম (সিরিয়া), হিজাজ ও ইয়ামানের ওপর সালজুকদের প্রভাব

৪৬০ হিজরী থেকে ৪৬২ হিজরী সময়কালের মধ্যে এমন কিছু ঘটনা সংঘটিত হয়, যার ফলে মিসরের ফাতেমীয় খিলাফত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং হিজাজ, শাম ও ইয়ামানে সালজুক সালতানাত ও আব্বাসীয় খিলাফত তার স্থান দখল করে। সেই সময় মিসরীয় সরকারের মধ্যেকার বিশৃঙ্খলা ও প্রাকৃতিক কার্যকারণসমূহের প্রভাবে সেখানে এমন এক দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়, যা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের যুগের সাত বছরব্যাপী দুর্ভিক্ষের স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে। মানুষ একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেতে থাকে। এক একটি রুটি পঞ্চাশ দিনার মূল্যে বিক্রি হতে থাকে। পথিকরা পথ চলতে চলতে হীনবল হয়ে পড়ে মরতে থাকে। আরোহণের জন্য মুসতানসির বিল্লাহর কাছে শুধুমাত্র একটি সওয়ারীর জন্তু ছিল। এর পিঠে তিনি সওয়ার হতেন। তার ছাতাবরদার একটি ধার করা খচ্চরের পিঠে আরোহণ করে তার সাথে

১. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩।
২. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫; ইবনে খাল্লিকান মীম বর্ণ, মুসতানসির বিল্লাহর জীবন বৃত্তান্ত।

www.bjilibrary.com

চলতো। এই দারিদ্র এতটাই অসহনীয় হয়ে উঠে যে, মুসতানসির বিল্লাহর মা ও কন্যা কায়রো ত্যাগ করে বাগদাদে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। ব্যসায়ীরা ফাতেমীয় খলীফার দরবারের বহু সাজ-সরঞ্জাম আব্বাসীয় রাজধানীতে এনে বিক্রি করে। এসব জিনিসের মধ্যে ২৮১ হিজরীতে আব্বাসীয় তা'এ লি-আমরিল্লাহর গ্রেফতারীর সময় রাজধানী থেকে লুণ্ঠিত হয়ে মিসরে নীত বহুসংখ্যক জিনিসও ছিল। এছাড়াও ছিল ৮০ হাজার টুকরো স্ফটিক, ৭৫ হাজার টুকরো পুরনো রেশম, ১১ হাজার লৌহবর্ম এবং সুদৃশ্য ২০ হাজার তরবারি।[১] আশপাশের যেসব দেশের ওপর ফাতেমীয়দের প্রভাব ছিল এ পরিস্থিতির সুযোগে তারা স্বাধীন হয়ে যেতে থাকলো। আফরিকিয়া অঞ্চলে মুয়েজ ইবনে বাদীস ফাতেমীয় খলীফা মুসতানসির বিল্লাহর নামে খুতবা পাঠ মওকুফ করে আব্বাসীয় খলীফা কায়েম বি আমরিল্লাহর নামে খুতবা পাঠ শুরু করেন। ৪৫৬ হিজরীর যুলকা'দা মাসে ইয়ামানে ফাতেমীয় খেলাফতের দায়ী আলী ইবনে মুহাম্মদ আসসুলায়হীকে হত্যা করা হয়[২] এবং সেখানে আব্বাসীয় খলীফার নামে খুতবা চালু করা হয়। ৪৬০ হিজরীতে শারফুদ্দৌলা মুসলিম ইবনে কুরাইশ আররাহবার ওপর আক্রমণ করেন এবং মিসরীয় খলীফার অনুগত বনী কিলাবকে পরাজিত করেন।[৩] ৪৬২ হিজরীতে মক্কার আমীর মুহাম্মাদ ইবনে আবী হাশেম আল হাসানী তার পুত্রকে সাথে নিয়ে বাগদাদ আগমন করেন এবং সেখান থেকে আল্‌প আরসালানের সামনে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করেন যে, মক্কায় ফাতেমীয় খলীফার নামে খুতবা পাঠ মওকুফ হয়ে আব্বাসীয় খলীফা ও সালজুক সুলতানের নামে খুতবা চালু হয়েছে। এতে সুলতান তাকে নগদ ৩০ হাজার দিনার প্রদান করেন। উত্তম খিলাত প্রদান করেন এবং খলীফা তার জন্য বাৎসরিক ১০ হাজার দিনার ভাতা মঞ্জুর করে তা কার্যকর করেন।[৪]

পরের বছর হলব (আলেপ্পো)-এর শাসক মাহমুদ ইবনে সালেহ ইবনে মিরদাস ও ফাতেমীয় খলীফার নামে খুতবা পাঠ মওকুফ করে আব্বাসীয় খলীফা ও সালজুক সুলতানের নামে খুতবা চালু করেন। কারণ, রোমানদের ভয়ংকর অগ্রযাত্রা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি আল্‌প আরসালানের আশ্রয় লাভের আকাংখী ছিলেন। কিন্তু এই মৌখিক আনুগত্যে আল্‌প আরসালান

১. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫; ইবনে খাল্লিকান, মীম বর্ণ, আল মুসতানসির বিল্লাহর জীবন বৃত্তান্ত।

২. ইবনে খাল্লিকান আসসুলায়হির হত্যার ঘটনা ৪৭৩ হিজরীতে সংঘটিত হয় বলে বর্ণনা করেছেন। (হা বর্ণ, আসসুলায়হির জীবন বৃত্তান্ত।)

৩. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩।

৪. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫, ইবনে খাল্লিকান ভুলবশত এটিকে ৪৩৯ হিজরীর ঘটনা বলে লিপিবদ্ধ করেছেন।

www.bjilibrary.com

সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। আলজাজিরা ও শামের ঐসব অঞ্চল পুরোপুরি নিজ কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসাই ছিল তার উদ্দেশ্য। তাই তিনি নিজে সেদিকে অগ্রসর হলেন এবং সর্বপ্রথম দিয়ারে বকর এলাকায় পৌঁছলেন। এখানে নাসর ইবনে মারওয়ান তার কাছে এসে আনুগত্য প্রকাশ ও এক লাখ দিনার নজরানা পেশ করলেন। সুলতান তার আনুগত্য গ্রহণ করলেন কিন্তু নজরানা ফেরত দিলেন। কারণ, তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, নজরানার ঐ অর্থ দেশের জনগণের নিকট থেকে জোর করে আদায় করা হয়েছিলো। এরপর তিনি আমেদ আররায়ায় গিয়ে পৌঁছলেন কিন্তু তা অধিকার করতে পারলেন না। অতপর হলব অভিমুখে অগ্রসর হলেন। খলীফার পক্ষ থেকে নাকীবুন নুকাবা তারযাদ ইবনে মুহাম্মদ আয্যায়নাবী উপহার-উপঢৌকন ও খিলাত নিয়ে সেখানে পূর্বেই মাহমুদের কাছে পৌঁছেছিলেন। মাহমুদ তার কাছে এ মর্মে তার আকাংখা ব্যক্ত করলেন যে, তিনি যেন সুলতানকে হলবে প্রবেশ থেকে বিরত রাখেন। এবং অনুপস্থিতির জন্য তার পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সুতরাং নাকীবুন নুকাবা গিয়ে সুলতানের কাছে মাহমুদের সুপারিশ করলেন। জবাবে সুলতান বললেন ঃ সে এখনো পর্যন্ত যখন আযানে "হাইয়া আলা খায়রিল আমাল" বলে তখন আমি তার খুতবা দিয়ে কি করবো ?[১] তাকে অবশ্যই আমার সামনে হাজির হতে হবে। কিন্তু মাহমুদ সুলতানের দাবি মেনে নিল না, ফলে হলব অবরোধের কাজ শুরু হলো। অবরুদ্ধ শহরবাসী কিছুদিন পর্যন্ত পূর্ণ শক্তিতে মোকাবিলা করলো। কিন্তু রসদের ঘাটতি এবং অবরোধের প্রচণ্ডতা তাদেরকে কাবু করে ফেলে। ফলে, তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়। অবশেষে এক রাতে মাহমুদ তার মা মানী'আ বিনতে ওয়াস্সাব আননুমায়রীকে সাথে নিয়ে সুলতানের কাছে গিয়ে হাজির হয়। বৃদ্ধা আরব মহিলা সামনে অগ্রসর হয়ে সুলতানকে বললেন ঃ এইতো আমার বেটা এখানে উপস্থিত, আপনি তাকে যা ইচ্ছা তাই করুন। এই বৃদ্ধা মহিলার সামনে সুলতানের সমস্ত শক্তিমত্তা ও গৌরব যেন নিস্তেজ হয়ে পড়লো। তিনি মাহমুদকে সসম্মানে পাশে বসালেন, তাকে মহামূল্যবান খিলাত দান করলেন এবং তাকে হলবের শাসন কর্তৃত্বে বহাল রাখলেন।[২]

---

১. ফাতেমীয়রা আযানে "হাইয়া আলা খায়রিল আমাল" বলতো। হলবের শাককের পক্ষ থেকে তখনো পর্যন্ত এ নিয়ম চালু থাকার অর্থ ছিল এই যে, তারা তখনো পর্যন্ত মনের দিক দিয়ে মিসরীয় খলীফাদের সমর্থক। শুধু স্বার্থের জন্য সাময়িকভাবে আনুগত্য প্রকাশ করছে।

২. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬; যুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-৩৭, ৩৮; আবুল ফিদা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৭; ইবনে খাল্লিকান, আল্প আরসালানের বৃত্তান্ত।

www.bjilibrary.com

একই সনে সুলতানের খাওয়ারিজমী জেনারেল মালেক আতসিজ ফাতেমীদের দখল থেকে আররামলা ও বায়তুল মাকদিস ছিনিয়ে নেন এবং আসকালান পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করেন। তিনি দামেশকও অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু তা অধিকার করতে সক্ষম হননি।[১]

রোমের কাইজারের সাথে যুদ্ধ

সালজুক সালতানাতের উত্থানের পূর্বে রোমানরা যেসব এলাকা দখল করেছিলো সুলতান তুগরীল ও সুলতান আল্‌প আরসালান রোম সাম্রাজ্যের ওপর অব্যাহতভাবে হামলা চালিয়ে সেসব ভূখণ্ড যেভাবে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। অব্যাহত এসব পরাজয় রোমানদের চোখ খুলে দেয়। ৪৬৮ হিজরীতে কাইজার রাজবংশের উত্তরাধিকারিনী ইউডোসিয়া (EUDOCIA) রোমানাস ডিওজেনেস (ROMANUS DIOGENES) নামক একজন সাহসী জেনারেলকে বিয়ে করে সিংহাসন ও রাজমুকুট তাকে সোপর্দ করেন। সে শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়েই ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতি শুরু করেন। ৪৬২ হিজরীতে সে আলজাজিরা অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং লুটপাট চালাতে চালাতে মামবিজে (HIGRAPOLIS) এসে উপনীত হন।[২] পরের বছরই সে আর্মেনিয়া অভিমুখে অগ্রসর হয়। তার সাথে ছিল মেসিডোনিয়া, বুলগেরিয়া, মালদাভিয়া এবং ইউরোপীয় মিত্রদের (ALLIES OF EUROPE) সৈন্য। ফরাসী ও নরমান সেনাদলও ছিল। এছাড়াও ছিল রুশ, বাজানক, ক্বাফচাক আবখায এবং আর্মেনিয় জাতিসমূহের সেনাদল। ইবনে আসীর তার সেনা সংখ্যা দুই লাখ বলে উল্লেখ করেছেন। যুবদাতুন নাসরা ও রাওদাতুস সাফা গ্রন্থদ্বয়ের লেখক তিন বলে বর্ণনা করেছেন। গিবন বর্ণনা করেছেন যে, তার সাথে কমপক্ষে এক লাখ সৈন্য ছিল। ইবনুর রাওয়ানদী সওয়ারীর সংখ্যা ছয় বলে উল্লেখ করেছেন। এ ধরনের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে তার বিশাল সামরিক শক্তি সম্পর্কে অনুমান করা যেতে পারে। এভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করার পর সে আর্মেনিয়ার আ'মাল খালাতের দিকে অগ্রসর হয় এবং মালাযগির্দে এসে তাঁবু স্থাপন করে। হলব থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আল্‌প আরসালান যে সময় আজারবাইজানে খুবী শহরে অবস্থান করছিলেন ঠিক সেই সময় তিনি এই আকস্মিক হামলার বিষয় জানতে পারেন। শত্রু এভাবে ঘাড়ের ওপর এসে পৌঁছেছে এ খবর শুনে অন্য কেউ হলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যেতো। কিন্তু এতে আল্‌প আরসালানের বীরত্বের আবেগ আরো উদ্দীপিত হয়ে উঠলো। তিনি ভাবলেন যে, এটা বসে অপেক্ষার

---

১. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮; আবুল ফিদা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৭।

২. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪; যুবদা, পৃষ্ঠা-৩৬; রোমান সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতনের ইতিহাস, গিবন; ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫৪, (ওয়ার্লড ক্লাসিকস সংস্করণ)

www.bjilibrary.com

সময় নয়। যদি সৈন্য ও যুদ্ধ সামগ্রী সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করা হয়, তাহলে সময় নষ্ট ও সুযোগ নষ্ট হবে এবং শত্রুর সাফল্যলাভের সম্ভাবনা অধিক বৃদ্ধি পাবে। তাই তিনি ঐ অবস্থায়ই যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। নিজামুল মুলককে রাজ কুমার ও শাহী হেরেমের মহিলাদেরসহ তাবরীজে (ইবনে আসীরের উক্তি অনুসারে হামদান) পাঠিয়ে দিলেন। আমীর-উমরাদের একত্র করে এ মর্মে অসীয়ত করলেন যে, যদি আমি জীবিত থাকি, তাহলে আল্লাহর মেহেরবানী আর যদি নিহত হই তাহলে আমার পুত্র মালেক শাহ আমার স্থলাভিষিক্ত হবে। অতপর তিনি তার সেনাবাহিনীর পনের[১] হাজার বীর যোদ্ধাদের নিয়ে অতিদ্রুত শত্রুদের পানে অগ্রসর হলেন। ৪৬৩ হিজরীর (১০৭১ খৃষ্টাব্দ) যিলকাদ মাসে ৪ তারিখে মঙ্গলবার দিন খালাতের সন্নিকটে রোমানদের অগ্রগামী বাহিনী (যাতে ইবনে আসীরের মতে ১০ হাজার ও ইমাদ কাতেবের মতে ২০ হাজার অশ্বারোহী ছিল) একজন রোমান জেনারেলের নেতৃত্বে অগ্রসর হয়ে তুর্কীদের অগ্রযাত্রা রুখতে চায়। কিন্তু আল্‌প আরসালানের অগ্রগামী বাহিনী একটি আক্রমণের সাহায্যেই তার সেনাবাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে এবং জেনারেলকে বন্দী করে সুলতানের সামনে পেশ করে। ক্রুদ্ধ সুলতান এ ক্ষেত্রে যুদ্ধের সভ্য ইসলামী আইন বিস্মৃত হন এবং তিনি পরাজিত জেনারেলের নাসিকা কর্তন করে তাকে যুদ্ধবন্দী ও যুদ্ধলব্ধ অর্থ-সম্পদসহ খোশখবর হিসেবে নিজামুল মুলকের কাছে পাঠিয়ে দেন। ইত্যবসরে রোমান সৈন্যরা মালাযগির্দ অধিকার করে তার ধ্বংসসাধন করেছিলো এবং খালাত অবরোধ করে অবস্থান করছিলেন। সুলতানের অগ্রাভিযানের খবর শুনেই কাইজার তার এসব বিক্ষিপ্ত সৈন্যদের একত্রিত করেন এবং মালাযগির্দ ও খালাতের মধ্যবর্তী আযযাহরা নামকস্থানে সমাবেশ করেন। বৃহস্পতিবার দিন সুলতানও সেখানে গিয়ে উপনীত হন এবং রোমান সেনাবাহিনী থেকে দুই ক্রোশ দূরে তাঁবু খাটান। এখানে পৌঁছে তিনি প্রথমেই কাইজারের কাছে সন্ধির জন্য পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু কাইজার তার যে জবাব দেন ঐতিহাসিক গিবনের ভাষায় তা হচ্ছে ঃ[২]

---

১. আল্‌প আরসালানের বাহিনীর সৈন্য সংখ্যার ব্যাপারে মতভেদ বিদ্যমান। গিবন চল্লিশ হাজার বলেছেন, অন্যান্য ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ ৩০ হাজার, ১২ হাজার এবং ১৫ হাজার বলে উল্লেখ করেছেন। রোমান ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। ইসলামী ঐতিহাসিকদের মতে ইবনে আসীর ও ইমাদ কাতেব ১৫ হাজার, মীর খোন্দ ১০ হাজার এবং হামদাল্লাহ মুসতাওফী ও ইবনুর রাওয়ানদী ১২ হাজার বলে বর্ণনা করেছেন। এসব ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা থেকে তার বাহিনীর সেনা সংখ্যা সম্পর্কে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণা পাওয়া সম্ভব।

২. ইবনে আসীর ও ইমাদ কাতেব শুধু এতটুকু জবাব উদ্ধৃত করেছেন যে, এখন রায় শহরেই সন্ধির আলোচনা হবে।

www.bjilibrary.com

"যদি সেই বণ্য পশু সন্ধির জন্য লালায়িত হয়ে থাকে, তাহলে এখন সে যেখানে অবস্থান করছে, সে স্থান রোমান সেনাদের তাঁবু খাটানোর জন্য খালি করে দিক এবং তার সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ নিজের শহর রায় ও নিজের রাজপ্রাসাদ আমাদের হাতে তুলে দিক।"

এ জবাবের পর যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু সুলতানের নামাযের ইমাম ও ফকীহ আবু নাসর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল মালেক বুখারী হানাফী পরামর্শ দান করলেন যে, আজ যুদ্ধ মুলতবী রাখুন, আগামীকাল জুমআর দিন যে সময় সারা দুনিয়ার মুসলমান নামায শেষে আপনার সাহায্যের জন্য দোয়া করতে থাকবে সেই সময় হামলা করবেন, যাতে আল্লাহর বান্দাদের দোয়া মুজাহিদদের তরবারির সহযোগী হয়। সুলতান এই পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং জুম'আর জন্য যুদ্ধ মুলতবী করলেন। পরদিন তিনি সকল মুসলমানের সাথে জুম'আর নামায পড়লেন এবং আল্লাহর দরবারে দোয়া করে খুব কান্নাকাটি করলেন। সমস্ত সৈনিকও তার সাথে কাঁদলো। তারপর তিনি সৈন্যদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ যারা শাহাদত কামনা করে তারা থেকে যাক আর যারা ফিরে যেতে চায়, তারা ফিরে যাক। কারণ, এখন আর এখানে কেউ সুলতান বা বাদশাহ নেই। একথা বলে তিনি তীর ধনুক ছুঁড়ে ফেললেন, তরবারি তুলে নিলেন নিজ হাতে ঘোড়ার লেজ বাঁধলেন, সাদা কাপড় পরিধান করলেন এবং শরীরে সুগন্ধি মেখে বললেন ঃ আমি যদি শহীদ হয়ে যাই, তাহলে এটিই হবে আমার কাফন। তার এই উক্তিতে সমস্ত সৈনিকের অন্তর বীরত্বের আবেগ ও শাহাদাতের আকাংখায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং তারা যুদ্ধের জন্য অস্থির হয়ে রোমান সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শত্রু সৈন্যদের মুখোমুখি হওয়ার সময় সুলতানের আবার আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, যার ওপর ভরসা করে তিনি তার চেয়ে দশ গুণ সৈন্যের মোকাবিলা করতে এসেছেন। তিনি অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে পুনরায় মাটির বিছানায় লুটিয়ে পড়ে সিজদা করলেন এবং সাহায্যের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। অতপর সিজদা থেকে মাথা তুলে বিদ্যুৎ গতিতে শত্রু সেনাদের ওপর আক্রমণ করলেন।[১] প্রথম আক্রমণেই বিখ্যাত রোমান জেনারেল বাসিলাসিয়াস (BASILACIUS) পরাজিত হয়ে পশ্চাদাপসারণ করে। তার পাশেই ছিল মালদাভিয়া উযী (UZI) অশ্বারোহী সেনাদল। তারাও ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেল। অপর একটি সেনাদলের নেতৃত্ব

১. সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, রোমান ঐতিহাসিকগণ এই যুদ্ধে সুলতানের উপস্থিতির বিষয়টিই অস্বীকার করেন। তাদের বক্তব্য হলো, কোনো খোজা ব্যক্তি সালজুক সৈন্যদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলো (গিবন ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫৬)। এর কারণ শুধু এই যে, তারা বিজয়ের কৃতিত্ব সুলতানকে দিতে চান না। অথচ এ কৃতিত্ব সুলতানকে না দিয়ে একজন খোজাকে দিলে তাতে রোমের কাইজারের গলের অপমানের মালা আরো অধিক ভারী হওয়া ছাড়া আর কিছু হয় না।

www.bjilibrary.com

দিচ্ছিলো শাহজাদা এণ্ডুনিকাস (ANDRONICUS)। তার সাথে কাইজারের মনোমালিন্য ছিল। তুমুল যুদ্ধের সময় সে এমন বিশৃঙ্খলভাবে পরাভূত হলো যে, গোটা ব্যুহই তছনছ হয়ে গেল। ঘটনাক্রমে ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রচণ্ড গরমে অস্থির কাইজার কিছু সময় ছায়ায় আরাম করার জন্য তার তাঁবুর দিকে ফিরে চললেন। শাহী ঝাণ্ডাকে এভাবে পশ্চাদপসারিত হতে দেখে সেনাবাহিনী সাহস হারিয়ে ফেললো এবং তারা পালাতে শুরু করলো। বাধ্য হয়ে কাইজার পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হলেন এবং মূল অংশের সেরা সেনাদলসমূহ নিয়ে তুর্কীদের মোকাবিলায় দৃঢ়পদে অবস্থান গ্রহণ করলেন। কিন্তু তখন হাওয়ার গতি পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সেনাবাহিনীর বেশীর ভাগ পালিয়ে যাচ্ছিলো এবং অশ্বারোহী তুর্কী সৈন্যরা তাদেরকে মারতে মারতে অগ্রসর হচ্ছিলো। অবশিষ্ট সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে ফেলেছিলো এবং শক্তিশালী শত্রুরা তাদেরকে সবদিক থেকে ঘিরে ফেলেছিলো। এ অবস্থায় ডিওজানিসের বীরত্ব আর কতক্ষণ মোকাবিলা করতে পারতো? শেষ পর্যন্ত তার আশপাশের সৈন্যরা কেটে পড়লে সে আহত হলো এবং তার ঘোড়াও মারা গেল তখন সে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু এক বালক অগ্রসর হয়ে তার পায়ে ফাঁস পরিয়ে দিল এবং এভাবে তাকে বন্দী করে সেনাবাহিনীর মধ্যে নিয়ে আসলো। অথচ সে নিজেও জানতো না যে, সে কাকে বন্দী করেছে।[১] সে তাকে হত্যা করতে চাচ্ছিলো কিন্তু জীবনের ভয়ে সে নিজে (অথবা ইবনে আসীরের মতে অন্য একজন রোমান বন্দী) প্রকাশ করে দেয় যে, সে কাইজার।[২] অবশেষে তাকে সুলতানের সেনাবাহিনীর মধ্যে নিয়ে আসা হয়। সে অন্যসব সৈন্যদের সাথেই রাত কাটায় এবং সকাল বেলা সুলতানের সামনে পেশ করা হয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন যে, তাকে সুলতানের সিংহাসনের বেদি চুম্বন করার নির্দেশ দেয়া হয় যা সে বাধ্য হয়ে পালন করে। এরপর সুলতান উঠে দাঁড়ান এবং বন্দী বাদশাহর ঘাড়ের ওপর পা রাখেন। কিন্তু গিবন এ বর্ণনাকে সন্দেহযুক্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, যদিও জাতীয় রীতি অনুসারে তিনি বেদি

---

১. কথিত আছে যে, ঐ বালক ছিল সা'দ আদ্দৌলা গাওহার আইনের ক্রীতদাস। যে সময় সুলতানের সাথে প্রেরণের জন্য সৈন্যদের বাছাই করা হচ্ছিলো তখন সা'দ আদ্দৌলা তাকে নিজামুল মুলকের সামনে পেশ করেন। নিজামুল মুলক প্রথমে এই দুর্বল ও ক্ষীণদেহী বালককে নিতে ইতস্তত করেন। কিন্তু সা'দ আদ্দৌলা অত্যধিক সুপারিশ করলে তিনি তাকে বললেন ঃ ঠিক আছে ! নিয়ে নাও। হয়তো সে-ই রোমান বাদশাহকে বন্দী করবে। ব্যঙ্গাত্মক রসিকতা করে এ উক্তি করা হয়েছিলো। কিন্তু উযীরের মুখ থেকে যে কথা উক্ত হয়েছিলো তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়।

২. গিবন বর্ণনা করেন যে, গ্রেফতার করার সময় তাকে সনাক্ত করা যায়নি। ফলে, তিনি সাধারণ বন্দীদের সাথে রাত্রিযাপন করেন। পরদিন সকাল বেলা বন্দীদেরকে সুলতানের সামনে পেশ করা হলে যেসব সালজুক দূত ইতিপূর্বে রোমের শাহী দরবারে গিয়েছিলেন, তারা তাকে চিনে ফেলেন এবং রোমান জেনারেল বাসিলাসিভাস অগ্রসর হয়ে তার পদচুম্বন করলে বিষয়টি প্রকাশ পায়।–(গিবন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫৮)

www.bjilibrary.com

চুম্বন অবশ্যই করেছিলেন। কিন্তু এছাড়া আর কোনো লাঞ্ছনাকর কাজ করেননি, বরং তার ব্যবহার এমন ভদ্রোচিত ছিল যে, তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী দুশমনকেও তার প্রশংসা করতে হয়েছে এবং আধুনিককালের সভ্য লোকদের জন্যও তার মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।[১] ইবনে আসীর ঘাড়ের ওপর পা রাখার কথা উল্লেখ করেননি। তবে বলেছেন যে, সুলতান নিজ হাতে তাকে তিনটি বেত্রাঘাত করেন এবং বলেন যে, আমি কি তোমাকে সন্ধির প্রস্তাব দিয়েছিলাম না, যা তুমি প্রত্যাখ্যান করেছিলে ? মীরখোন্দ বেত্রাঘাত করার কথাও বলেননি। তিনি বলেছেন ঃ সুলতান প্রথমে কেবল তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করেন। কিন্তু পরে কাইজার ক্ষমা আবেদন জানালে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন এবং খুবই সম্মানজনক আচরণ করেন। ঐতিহাসিক ইমাদ কাতেব তিরস্কার ও ভর্ৎসনার কথাও উল্লেখ করেননি। বরং তিনি বলেছেন যে, ثم تعطف عليه السلطان واحضره بين يديه। অতপর সুলতান তার প্রতি দয়াপরবশ হন এবং তাকে সামনে ডেকে নেন। সকল মতভেদ কেবল একটি বিষয়ে অর্থাৎ বন্দী বাদশাহর সাথে সুলতান প্রথমে কি আচরণ করেছিলেন ? এরপর থাকে পরবর্তী আচরণ। এ বিষয়ে সকল ঐতিহাসিক বলেছেন যে, তার পরবর্তী আচরণ ছিল অতীব সৌজন্য ও বদান্যতামূলক। সুলতান কাইজারকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে নিজের কাছে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তুমি আমার কাছে কেমন ব্যবহার আশা করো ? তিনি বললেন ঃ হয় আপনি আমাকে হত্যা করবেন কিংবা ইসলামী দেশসমূহে আমাকে প্রদর্শন করবেন অথবা একটি ক্ষীণ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, হয়তো আমাকে ক্ষমা করবেন। সুলতান জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি যদি বিজয়ী হতে আর আমি বন্দী হয়ে তোমার কাছে নীত হতাম তাহলে তুমি আমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে ? জবাবে কাইজার বললে ঃ আমি আপনার সাথে খুবই খারাপ ব্যবহার করতাম।[২] সুলতান বললেন ঃ এখন তো আমি তোমার খারাপ নিয়ত সম্পর্কে জেনে নিলাম। তাই আমার উচিত তোমার সাথে একই রূপ আচরণ করা। কাইজার বললেন ঃ আপনি তো আমার বদনিয়তের পরিণতি দেখতে পাচ্ছেনা। এ কথাবার্তার পর সুলতান কাইজারকে সসম্মানে একটি স্বতন্ত্র তাঁবুতে রাখলেন। তার সেনাবাহিনীর বহুসংখ্যক প্যাট্রিশিয়ানকে[৩] তার সাথে রাখলেন, ব্যয় নির্বাহের জন্য তাকে দশ

---

১. গিবন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫৮। ইংরেজ ঐতিহাসিকের একথাটি যথার্থ। গত শতাব্দীর ঘটনা, গিবনের নিজের জাতি দিল্লীর বাদশাহকে বন্দী করে অত্যন্ত অপমানজনক অবস্থায় তাকে সামরিক আদালতে পেশ করে এবং মামলা চালিয়ে তাকে যাবজ্জীবনে কারাদণ্ডের শাস্তি দেয়।

২. গিবন কাইজারের এ জবাব উদ্ধৃত করেছেন যে, আমি যদি বিজয়ী হতাম তাহলে আপনার দেহে বহু বেত্রাঘাত করতাম।

৩. প্যাট্রিশিয়ান (PATRICIAN) ছিল রোমান সেনাবাহিনীর একটি বড় পদবী, যার অধীনে দশ হাজার সৈন্য থাকতো।-(কিতাবুল খেরাজ, কুদামা ইবনে জা'ফর, পৃষ্ঠা-২৫৫)

www.bjilibrary.com

হাজার দিনার দিলেন এবং আট দিন পর্যন্ত তার সাথে বন্ধুত্বসুলভ সৌজন্য সাক্ষাত করতে থাকলেন। গিবন বলেন ঃ এসব সাক্ষাতকারে সুলতান কাইজার তার সামরিক ত্রুটিসমূহ সম্পর্কে অবহিত করেন এবং কি কি ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে তিনি এত বিশাল শক্তি থাকা সত্ত্বেও এত ক্ষুদ্র একটা সেনাবাহিনীর হাতে পরাজিত হয়েছেন। তাছাড়া তিনি সেইসব জেনারেলদেরকেও তিরস্কার করেন, যারা তাদের বাদশাহর খেদমত করতে গাফিলতি করেছে। এসব সাক্ষাতকারের সময়ই উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধির বিষয় নিয়েও আলোচনা হতে থাকে এবং পরে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে সমাধান হয়।

(১) পনের লাখ দিনার মুক্তিপণ।[১]
(২) বাৎসরিক তিন লাখ ষাট হাজার দিনার খেরাজ।[২]
(৩) প্রয়োজনের মুহূর্তে সামরিক সাহায্য।[৩]
(৪) রোমানদের হাতে বন্দী সকল মুসলমানকে মুক্তিদান।[৪]
(৫) রোমান শাহজাদীর সাথে সুলতানের পুত্রের বিয়ে।[৫]

ইবনে আসীরের বর্ণনা অনুসারে ৫০ বছরের জন্য এই সন্ধি হয়েছিলো। এরপর সুলতান কাইজারকে শাহী খিলাত দান করেন এবং উভয় শাসক পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন। কাইজার বাগদাদের দিকে মাথা নুইয়ে খলীফার প্রতি সম্মান প্রকাশ করেন। সুলতান নিজে তাকে বিদায় জানাতে এক ক্রোশ পর্যন্ত পথ সাথে চলেন এবং সুলতানের সৈন্যরা নিজেদের হিফাজতে তাকে রোমান সীমান্ত পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছিয়ে দেয়। কিন্তু রোমান ভূখণ্ডে প্রবেশের পর তিনি জানতে পারেন যে, এ পরাজয়ের খবর শোনামাত্রই তার সাম্রাজ্যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে এবং মিকাঈল সিংহাসন দখল করেছে। এ খবর রোমানদেরকে ভগ্নহৃদয় করে ফেলে। তিনি সুলতানকে এ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন এবং দুই লাখ দিনার ও একটি স্বর্নের নৌকা—যাতে ৯০ হাজার মণি-মুক্তা ছিল—পাঠিয়ে এই মর্মে সুলতানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন যে, আমি এর চেয়ে অধিক কিছু দিতে অক্ষম। গিবন বলেন, সুলতান

---

১. এটি ইবনে আসীরের বর্ণনা। কিন্তু গিবন দশ লাখ বলে উল্লেখ করেছেন।
২. ইবনে আসীর খেরাজের বিষয় উল্লেখ করেননি। ইবনুর রাওয়ান্দী উল্লেখ করেছেন এবং গিবন তা সমর্থন করেছেন। কিন্তু রোমান ঐতিহাসিকরা খেরাজ ও মুক্তিপণের বিষয়ে একেবারে নিশ্চুপ।
৩. এটা শুধু ইবনে আসীরের বর্ণনা।
৪. এটা ইবনে আসীরের বর্ণনা। গিবন এ বর্ণনা সমর্থন করেছেন।
৫. গিবন শুধু এ শর্তের উল্লেখ করেছেন কিন্তু এর ওপর খুব বেশী নির্ভর করেননি। ঐতিহাসিক মীর শুধু এতটা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন যে, উক্ত রাজকুমারী ছিল কাইজার রোমানিয়াসেরই কন্যা। সুলতানের পুত্র মালেক আরসালানের সাথে তার বিয়ে হয়েছিলো। কিন্তু অন্য কোনো ঐতিহাসিক বিষয়টি উল্লেখ করেননি বা ইতিহাস থেকেও ঐ রাজ কুমারীর বিষয়ে কিছু জানা যায় না।

www.bjilibrary.com

সাহায্য প্রদান করে তাকে সিংহাসনে বসাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরপরই তিনি জানতে পারেন যে, তিনি পরাজিত হয়ে বন্দী হয়েছেন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন। অন্যদিকে ঐতিহাসিক ইবনে আসীর বলেন, রোমানাস তার সাম্রাজ্যের বিপ্লবের খবর শুনে বৈরাগ্যবাদ গ্রহণ করেন এবং মিকাঈলকে জানিয়ে দেন যে, সালজুক সুলতানের সাথে এসব শর্ত নির্ধারিত হয়েছে। ইচ্ছা করলে তা বহাল রাখ কিংবা প্রত্যাখ্যান কর। মিকাঈল তা বহাল রাখেন এবং তিনি রোমানসকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন মধ্যস্থতা করে তার ও সুলতানের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন।[১]

এ যুদ্ধে সালজুক সালতানাতের সীমান্ত সম্প্রসারিত হয়নি বটে, তবে এদিকটি ছাড়া অন্য বহুবিধ কল্যাণ লাভ ও সুযোগ-সুবিধা অর্জিত হয়েছে। গনীমতের যে মাল হস্তগত হয়, তার বিপুলতার অনুমান এ থেকেই করা যেতে পারে যে, পরিবহনের গাড়ীই ছিল তিন হাজার, বহুসংখ্যক মিনজানিক ছিল যার মধ্যে একটি এতো বিশালকার ছিল যে, ১২ শত লোক এটি চালাতো এবং তা ১২০ রতল (প্রায় তিন মণ) ওজনের পাথর নিক্ষেপ করতো। এছাড়া অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম এতো বিপুল পরিমাণে হস্তগত হয় যে, সৈনিকরা এক দিনারের বিনিময়ে ৭২টি শিরস্ত্রাণ বিক্রি করে এবং তিন তিনটি বর্ম এক দিনারে বিক্রি হয়।[২] এসব বস্তুগত লাভ ছাড়াও ইসলামী দুনিয়ায় সালতানাতের যে সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রতিবেশী সাম্রাজ্যসমূহে যে প্রভাব বৃদ্ধি পায় তার মূল্য পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

খলীফার খান্দানের সাথে আত্মীয়তা

যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে সুলতান নিশাপুর থেকে খলীফাকে বিজয়ের সুসংবাদ পাঠালেন এবং তার কাছে মালেক শাহের উত্তরাধিকারিত্বের যথারীতি স্বীকৃতি দান করতে আবেদন জানালেন। জবাবে খলীফা ৪৬৪ হিজরীর সফর মাসে তাঁর উযীর আমীদুদ্দৌলা ইবনে জাহীরের মাধ্যমে সুলতানের জন্য খিলাত পাঠালেন এবং মালেক শাহের উত্তরাধিকারিত্বের স্বীকৃতি দিয়ে তাকেও খিলাত দান করে ধন্য করলেন। এর সাথেই তিনি আমীদুদ্দৌলার মাধ্যমে তার উত্তরাধিকারী আল মুকতাদী বি আমরিল্লাহর সাথে সুলতানের কন্যা সাফরী খাতুনের বিয়ের পয়গাম প্রেরণ করলেন। সুলতান এ প্রস্তাব সন্তুষ্টচিত্তে মঞ্জুর করেন এবং নিশাপুরে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়। মুকতাদির পক্ষ থেকে আমীদুদ্দৌলা এবং কন্যার পক্ষ

১. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬, ২৮; যুবদাতুন নাসরা, ৩৮, ৪৪; রাওদাতুস সাফা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৬, ৯৭; রাহাতুস সুদূর, পৃষ্ঠা-১১৯, ১২০; তারীখে গুযীদা, পৃষ্ঠা-৪৪১; গিবন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫৪ ও ২৬৩।

২. যুবদা, পৃষ্ঠা-৪২, ৪৩।

www.bjilibrary.com

থেকে নিজামুল মুলক বিয়ের উকীল নিযুক্ত হন। উভয়ে ইজাব ও কবুলের মাধ্যমে বিয়ের আক্‌দ্‌ সম্পন্ন করেন এবং তার পরে মণি-মুক্তা ও অর্থ-সম্পদ দান করা হয়।[১]

বাগদাদে নতুন রেসিডেন্ট নিয়োগ

এ বছর খিলাফত ও সালতানাতের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। কিন্তু খিলাফতের মর্যাদার প্রতি আল্‌প আরসালানের মর্যাদাবোধ এবং নিজামুল মুলকের বুদ্ধিমত্তা ও সুকৌশল ব্যবস্থাপনা অতি সহজেই তা মীমাংসা করতে সক্ষম হয়। ঘটনা ছিল এই যে, সালজুক সুলতানগণ বাগদাদকে তাদের রাজধানী বানিয়েছিলেন না। তারা রায় শহরে থাকতেন এবং তাদের পক্ষ থেকে বাগদাদে একজন রাজপ্রতিনিধি (রেসিডেন্ট) থাকতেন। ৪৬৪ হিজরীতে সুলতান আয়তগীন সুলায়মান নামক একজন আমীরকে রাজ প্রতিনিধি বানিয়ে প্রেরণ করেন। রবিউল আউয়াল মাসে তিনি বাগদাদ পৌঁছেন। কিন্তু খলীফা তাকে গ্রহণ করেননি। কারণ, তার পুত্র খলীফার বিশেষ গোলামদের একজনকে হত্যা করেছিলো। খলীফা সুলতানের কাছে নিহত ব্যক্তির পরিচয় পাঠিয়ে দেন এবং তাকে লিখেন যে, এ রাজ্য প্রতিনিধিকে পদচ্যুত কর। নিজামুল মুলক ঐ ব্যক্তিকে জায়গীর হিসেবে ক্রীটস এলাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু খলীফার পক্ষ থেকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, এই জায়গীরও তাকে দেয়া যাবে না। সুলতান ও তার উযীর এ বিষয় দু'টি জানার পর খলীফার মন রক্ষার জন্য দু'টি বিষয়ই মেনে নেন এবং আয়তগীনকে অপসারণ করে তার পরিবর্তে সা'দ আদ্দৌলা গাওহার আইনকে রাজ প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। তাকে বিপুল জাঁকজমকের মাধ্যমে বাগদাদে স্বাগত জানানো হয় এবং তার সম্মানে খলীফা দরবার আহ্বান করেন।

একই বছর ফারেসে বিদ্রোহ হয়। ফাদলাওয়াই নামক এক আমীর সে অঞ্চলের অত্যন্ত মযবুত ও উঁচু পার্বত্য দুর্গ অধিকার করে আশপাশের অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। তাকে দমন করার জন্য সুলতান মালেক শাহও নিজামুল মুলককে প্রেরণ করেন। তারা ঐ দুর্গ দখল করে ফাদলাওয়াইকে গ্রেফতার করেন। কিন্তু সুলতান তার চিরাচরিত স্বভাব অনুসারে তাকে সাবধান করে ছেড়ে দেন।[২]

---

১. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯; যুবদা, পৃষ্ঠা-৪৫।

২. ইবনে আসীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯। হামদাল্লাহ মুসতাওফী লিখেছেন যে, এই অভিযানে সুলতান তার ভাই কাওয়ার্তকে পাঠিয়ে ছিলেন। সে বিদ্রোহ দমন করে কিন্তু পরে নিজেই বিদ্রোহ করে বসে। কিন্তু এ বর্ণনা আদৌ, সঠিক বলে মনে হয় না। দাসতুরুল উযারায় নিজামুল মুলক কর্তৃক যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা ইবনে আসীরের বর্ণনা সমর্থন করে।

www.bjilibrary.com

সুলতানের শাহাদাত

৪৬৫ হিজরীর প্রারম্ভে সুলতান মধ্য এশিয়া বা ট্রান্স অক্সাইন অঞ্চলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে মনস্থ করেন। সেই সময় সেখানকার শাসক ছিলেন শামসুল মালেক তগীন বিন তুফতাহ্ খান। সুলতানের এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র তুর্কিস্তান অঞ্চল নিজের কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসা। সুতরাং তিনি দুই লাখ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী সাথে নিয়ে যাত্রা করেন এবং সফর মাসের প্রথম দিকে আমুদরিয়ার তীরে পৌছে নদীতে পুল নির্মাণ করালেন। সুলতানের বাহিনীও সৈন্য ও সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে এ নদী পার হতে প্রায় এক মাস সময় লেগে যায়। রবিউল আউয়ালের প্রারম্ভিক দিনগুলোর কোনো একদিনে সুলতান নিজে নদী পার হয়ে অপর তীরে পৌছলে কারীর নামক এক গ্রাম সংলগ্ন এক দুর্গের কোতোয়াল বা তত্ত্বাবধায়কের মামলা তাঁর সামনে পেশ করা হয়।[১] উক্ত দুর্গের তত্ত্বাবধায়কের নাম ছিল ইউসুফ খাওয়ারিজমী।[২] দূর্গের ব্যাপারে সে কোনো অপরাধ করেছিলো। ৬ই রবিউল আউয়াল ইউসুফকে দু'জন ক্রীতদাসের পাহারায় সুলতানের সামনে পেশ করা হয়। সুলতান তার থেকে বিষয়টি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সে অশালীন ভাষায় তার জবাব দেয়। এতে সুলতান ক্রুদ্ধ হয়ে চারটি খুঁটি পুঁতে তার সাথে তার চার হাত-পা বাঁধার এবং শাস্তি দিয়ে হত্যার নির্দেশ দেন। এতে ইউসুফের বেআদবী আরো বৃদ্ধি পায়। সে সুলতানকে সম্বোধন করে বলে ঃ হে নপুংশক, আমার মত লোক কি এভাবেই মৃত্যুবরণ করবে? এ উক্তি শোনামাত্র সুলতান ক্রোধে ফেটে পড়েন। তিনি ক্রীতদাসদেরকে তাকে মুক্ত করে দেয়ার নির্দেশ দেন। এবং নিজে তীর ও কামান তুলে তাকে লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়েন কিন্তু তা লক্ষভ্রষ্ট হয়। অথচ সুলতান ছিলেন এমন অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী তীরন্দাজ যে তার তীর কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো না। ওদিকে ইউসুফ তার বগল থেকে ছুরি বের করে সুলতানের দিকে ছুটে গেল। সুলতান সিংহাসন থেকে নেমে তার দিকে অগ্রসর হতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু অকস্মাত তার পরিধেয় বস্ত্রের প্রান্তভাগ পায়ের নীচে পড়ে যায় এবং তিনি হুমড়ি খেয়ে নীচে পড়ে যান। ইতিমধ্যে ইউসুফ একেবারে কাছে পৌছে গিয়েছিলো। সে সুলতানের কোমরে ছুরি বসিয়ে দেয় এবং তারপর ঘুরে সুলতানের পেছনে দণ্ডায়মান সা'দ আদ্দৌলা গাওয়ার আইনকে আহত করে। অকস্মাত এই আক্রমণে সারা দরবার হতভম্ব হয়ে যায়। ইউসুফ চাচ্ছিলো, এই গোলযোগের সুযোগে আঘাত করতে করতে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু একজন

১. হামদাল্লাহ মুসতাওফী ঐ দুর্গের নাম 'কুযম' এবং ইবনুর রাওয়ানদী বরযম বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আবুল ফিদা ও ইবনে খাল্লিকান শুধু এতটুকু লিখেছেন যে, ঐ দূর্গ কারীর নামক এক গ্রামের পাশে অবস্থিত ছিল।

২. ইবনুর রাওয়ানদী লিখেছেন 'বরযমী'।

www.bjilibrary.com

আর্মেনীয় ফাররাশ[১] অগ্রসর হয়ে একখানা কাষ্ঠদণ্ড দিয়ে তার মাথার ওপর এমন জোরে আঘাত করে যে, সে ঘুরপাক খেয়ে নীচে পড়ে যায়। তৎক্ষণাৎ তুর্কী সৈন্যরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে। আহত সুলতানকে তৎক্ষণাৎ অন্য তাঁবুতে পৌঁছিয়ে দিয়ে চিকিৎসা শুরু করা হয়। জখম ছিল মারাত্মক। কোনো তদবীরই ফলবতী হয় না। অবশেষে রবিউল আউয়ালের দশ তারিখে ৪০ বছর কয়েক মাস বয়সে সুলতান ইনতিকাল করেন এবং মার্ভে এনে তাকে দাফন করা হয়।[২] শেষ মুহূর্তে তিনি নিজামুল মুলককে ডেকে এই মর্মে অসীয়ত করেন যে, তুমি যথারীতি রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী পরিচালনা করতে থাকবে এবং আমার স্থলে আমার পুত্র মালেক শাহকে সিংহাসনে বসাবে। এছাড়া তিনি তার পুত্র আয়াযকে বলখের নেতৃত্বদান করলেন। তুগরীলের শাসনকালে বলখ তার পিতা দাউদের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। কিন্তু আয়ায যাতে বিদ্রোহ করতে না পারে, সে জন্য বলখের দুর্গের কর্তৃত্ব মালেক শাহকে দান করেন। তিনি আয়াযের জন্য ২৫ লাখ দিনার ভাতা নির্ধারণ করেন এবং তাকে জোর দিয়ে বলেন যে, সবসময় নিজের ভাই মালেক শাহকে সাহায্য করবে। তিনি নিজের ভাই কাওয়ার্তকে ফারেস ও কিরমানের শাসন কর্তৃত্বে বহাল রেখে অসীয়ত করেন যে, সে যেন তার স্ত্রীকে বিয়ে করে।[৩]

কথিত আছে যে, অসুস্থ অবস্থায় সুলতান বলেন ঃ আমি সারাজীবন আমার মনে গর্ব, অংহকার ও আত্মশ্লাঘাকে জায়গা দেইনি। কিন্তু গতকাল যখন আমি টিলার ওপর থেকে আমার বিশাল সেনাবাহিনীর ওপর দৃষ্টিপাত করলাম তখন আমার মনে হলো, আজ পৃথিবী পৃষ্ঠে কোনো শক্তিই আমার মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়। এরপর ইউসুফকে যখন আমার সামনে আনা হলো তখন আমি

---

১. ইবনুর রাওয়ানদী ও হামদাল্লাহ মুসতাওফী তার নাম জামে নিশাবুরী বলে উল্লেখ করেছেন। তার বর্ণনা মতে সে ছিল 'ফাররাশ' বা তাঁবু রক্ষক ও তাঁবু খাটানোর দায়িত্বশীল অফিসার। ইবনুর রাওয়ানদী বলেছেন, কিছুকাল পরে মালেক শাহের যুগে সেই ফাররাশের পুত্রকে খলীফার বিশেষ দাসদের একজন হত্যা করে এবং অন্দর মহলে আশ্রয় গ্রহণ করে যেখানে তাকে কেউ-ই গ্রেফতার করতে সক্ষম ছিল না। এ অবস্থা দেখে ফাররাশ মালেক শাহের কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করে যে, আপনি আমার পুত্রের হত্যাকারীর সাথে ঠিক তেমনি আচরণ করুন, যেমনটি আমি আপনার পিতার হত্যাকারীর সাথে করেছিলাম। তার এরূপ আবেদনকে মালেক শাহ এমন প্রভাবিত হয়ে পড়েন যে, তিনি তার দ্বাররক্ষীকে নির্দেশ দেন ঃ হত্যাকারীকে যেখানে পাওয়া যাবে, সেখান থেকে গ্রেফতার করো। খলীফা মুক্তাদী দশ হাজার দিনার পর্যন্ত মুক্তিপণ দিতে বললেন, কিন্তু হত্যাকারীকে গ্রেফতার করে কিসাস গ্রহণ করা হয়।–(পৃষ্ঠা-৮২২)

২. তার এই বয়সের কথা উল্লেখ করেছেন ইবনে খাল্লিকান, ইবনে আসীর, ইমাদ কাতেব ও আবুল ফিদা। কিন্তু ইবনুর রাওয়ানদী মীর খোন্দ ও হামদাল্লাহ মুসতাওফী তার বয়স ৪৪ বছর হয়েছিলো বলে উল্লেখ করেছেন।

৩. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩১; যুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-৪৭।

www.bjilibrary.com

আল্লাহর ওপর ভরসা না করে আমার বাহুবলের ওপর ভরসা করেছিলাম এবং তাকে তুচ্ছ ভেবেছিলাম। এর পরিণাম হলো এই যে, আল্লাহ একজন নগণ্য বন্দীর হাতে আমাকে মৃত্যুর দরযায় পৌঁছিয়ে দিলেন।[১]

আল্‌প আরসালানের চরিত্র

আল্‌প আরসালানের নাম ছিল মুহাম্মাদ। উপনাম ছিল আবু শুজা'। খলীফার দরবার থেকে তিনি আলওয়ালাদুল মুয়াইয়াদ জিয়াউদ্দীন আযদুদ্দৌলা উপাধিসমূহ লাভ করেছিলেন। কিন্তু তার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নাম ছিল "আল্‌প আরসালান" যা তার ব্যক্তিগত ও জন্মগত গুণাবলীর দিক থেকে ছিল সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।[২]

তার জন্ম তারিখের ক্ষেত্রে মতভেদ আছে। ইবনে আসীর ইমাদ কাতেব ও ইবনে খাল্লিকানের মতে ৪২৪ হিজরী তার জন্ম সন এবং ইবনে আসীরের অপর একটি বর্ণনা অনুসারে ৪২০ হিজরী সন। কিন্তু তিনি قيل (কীলা) অর্থাৎ কথিত আছে যে, বলে এ মতটি উল্লেখ করেছেন যার অর্থ হচ্ছে—এ মতটিকে তিনি মোটেই নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন না। পক্ষান্তরে ইবনুর রাওয়ানদী, হামদাল্লাহ মুসতাওফী মীর খোন্দ, প্রমূখ ঐতিহাসিক ৪২১ হিজরীর ২রা মুহাররাম তার জন্ম তারিখ বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রাথমিক জীবন পিতা ও চাচার সাথে লুটপাট করে অতিবাহিত হয়েছে। পিতার জীবদ্দশায় কখনো তার রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নরীতে আদিষ্ট হয়েছেন আবার কখনো গজনী প্রভৃতি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরিত হতেন। ৪৫১ হিজরীর রযব (কিংবা ৪৫৩ হিজরীর সফর) মাসে যখন চাগরী বেগ দাউদ ইনতিকাল করেন, তখন তিনি তদস্থলে খুরাসান রাষ্ট্রের মালিক হন এবং তুগরীল বেগের মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। ৪৫৫ হিজরীতে তুগরীল বেগও যখন ইনতিকাল করেন, তখন তার যোগ্যতা ও সাহসিকতা তাকে গোটা সালজুক সালতানাতের শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এভাবে তিনি তিন চার বছর পর্যন্ত খুরাসানের শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন এবং প্রায় দশ বছর পর্যন্ত মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন। সেই সময়ের মধ্যে তিনি তার সালতানাতকে আমুদরিয়ার পূর্ব তীর থেকে ভূমধ্য সাগরের বেলাভূমি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন। আলজাযিরা ও শামের ছোট ছোট

১. আল্‌প আরসালানের মৃত্যুর সময়ের অবস্থা জানার জন্য দেখুন, ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০; যুবদা ৪৫, ৪৭; আবুল ফিদা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৯; রাহাতুস সুদূর, পৃষ্ঠা-১২০, ১২১; তারীখে গুযীদা, পৃষ্ঠা-৪৪১, ৪৪২; রাওদাতুস সাফা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০০ ; ইবনে খাল্লিকান, আল্‌প আরসালানের জীবন বৃত্তান্ত।

২. তুর্কী ভাষায় আল্‌প অর্থ অসীম সাহসী এবং আরসালান অর্থ বাঘ।

www.bjilibrary.com

রাজ্যগুলোকে বিলীন করে একটি সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেন। হিজায ও শামকে ফাতেমীয় সালতানাতের কর্তৃত্বাধীন থেকে বের করে আনেন এবং রোমান ও গুর্জিস্তানের শক্তিকে পরাভূত করে গোটা দুনিয়ায় নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। নিজের সামরিক শক্তি, সামরিক ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্বের যোগ্যতা এবং গৌরব ও শান-শওকতের দিক থেকে তিনি তদানীন্তন বিশ্বের সবচেয়ে বড় সুলতান ছিলেন। তাছাড়া তিনি এমন একটি বিশাল ও শক্তিশালী সালতানাতের মালিক ছিলেন তৎকালীন বিশ্বে যার সাথে সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার মত আর কোনো সালতানাত ছিল না।

বীরত্ব, খোদাভীরুতা ও আল্লাহর ওপর নির্ভরতা ছিল তার চরিত্রের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য যার প্রভাব তার জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীতে সুস্পষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হয়। বদান্যতা অতীব সাহসিকতা এবং ক্ষমা ছিল তার এমন সব বৈশিষ্ট্য যা তার চরিত্রে সর্বদা প্রকাশ পেতো। আমীর-উমরা ও সালতানাতের গভর্নরগণ একের পর এক বিদ্রোহ করেছে, কিন্তু সর্বদাই তিনি তাদের ক্ষমা করেছেন। তার আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনেরা শত্রু হয়ে তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছে কিন্তু তারা নিহত হলে তিনি ঐসব শত্রুর জন্য কেঁদেছেন। বিধর্মীয় ও বিজাতীয় শত্রু তার ওপর আক্রমণ চালিয়েছে কিন্তু বিজয় লাভ করার পর তিনি সসম্মানে তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন এবং তাদের সাথে দয়াদ্র আচরণ করেছেন। এসব বিষয় ছাড়াও ঐতিহাসিকগণ তার আরো অনেক গুণ বর্ণনা করেছেন। তার বাবুর্চিখানায় প্রতিদিন পঞ্চাশটা করে বকরী জবাই করা হতো এবং ফকীর-মিসকীনদেরকে তার খাবার খাওয়ানো হতো। তার রেজিষ্টারে অসংখ্য দরিদ্র ও অভাবী লোকের নাম লিখিত ছিল। তার কোষাগার থেকে তাদের জন্য ভাতা নির্ধারিত ছিল। এসব সত্ত্বেও যদি কোনো জীর্ণদশা দরিদ্রের ওপর তার দৃষ্টি পড়তো, তাহলে তার অবস্থা দেখে তিনি কাঁদতেন এবং তাকে সাহায্য করতেন। প্রতি বছর রমযান মাসে ১৫ হাজার দিনার দান করতেন। প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং তাদের প্রতি ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের ব্যাপারে তার বিশেষ অবদান ছিল। তিনি এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, প্রজাদের ওপর মূল ভূমিকর ছাড়া আর কোনো ধরনের কর বা মাশুলের বোঝা যেন চাপিয়ে দেয়া না হয়। ভূমিকরও আদায় করতে হবে বছরে দুই কিস্তিতে যাতে তারা সহজেই তা আদায় করতে পারে। একবার তিনি জানতে পারেন যে, তার ক্রীতদাসদের একজন কোনো গ্রাম্য লোকের নিকট থেকে কাপড় ছিনিয়ে নিয়েছে। এতে তিনি সেই অপরাধীকে গ্রেফতার করেন এবং জনসমক্ষে শূলিতে চড়ান যাতে ভবিষ্যতে কেউ প্রজাদেরকে কষ্ট দিতে সাহস না পায়।

সালতানাতের কাজকর্ম তিনি তার সুযোগ্য উযীর নিজামুল মুলক তুসীর ওপর ন্যস্ত করেছিলেন এবং তার কর্মে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করতেন না।

www.bjilibrary.com

নিজামুল মুলকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরা একবার তার কাছে লিখিতভাবে বহুবিধ অভিযোগ করে। তিনি অভিযোগনামা পড়ে তা উযীরকে দিয়ে বললেন, অভিযোগকারীদের কথা যদি সত্য হয়, তাহলে তুমি তোমার আচরণ সংশোধন করে নাও। আর যদি মিথ্যা হয়, তাহলে ক্ষমা করে দাও এবং তাদেরকে কাজে লাগিয়ে দাও যাতে অভিযোগ করার অবকাশ না থাকে।

তিনি অনেক সন্তান রেখে যান যাদের মধ্যে মালেক শাহ সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেন। মালেক শাহ ছাড়াও আয়ায, বাকশ, তুতুশ, আরসালান শাহ, আরসালান আরগুন, আতিয়াসু এবং বুরীবাব্স্ও ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কন্যাদের মধ্যে সারা, আয়েশা এবং আরো এক কন্যার কথা ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্য থেকে খলীফা মুকতাদীর সাথে একজনের বিয়ে হয় যার উপাধি ছিল সাফরী খাতুন। অন্য মেয়েদের সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।[১]

আলপ আরসালানের সময় সালতানাতের সমস্ত ব্যবস্থাপনা যেহেতু নিজামুল মুলকের হাতে ছিল এবং মালেক শাহের গোটা শাসনকালেও তিনিই ছিলেন ক্ষমতার অধিকারী। তাই প্রশাসনিক দিক দিয়ে গোটা এই সময়কাল ছিল নিজামুল মুলকের যুগ।

---

১. এসব তথ্যের বেশীর ভাগ ইবনে আসীর ও যুবদাতুন নাসরা থেকে গৃহীত।

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

চতুর্থ অধ্যায়

উন্নতি যুগ (ক্রমাগত)

মালেক শাহ

৪৬৫ হিজরী থেকে ৪৮৫ হিজরী
১০৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১০৯২ খৃষ্টাব্দ

আল্‌প আরসালানের ইনতিকালের সময় মালেক শাহ্ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সুলতানের চোখ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসার এবং সালতানাতের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের থেকে তার জন্য বাইয়াত গ্রহণ করেন। খলীফাকে তার সিংহাসনের আরোহণের খবর জানিয়ে তার নামে খুতবা পাঠের আবেদন জানান এবং প্রদেশসমূহের গভর্নরদের এবং আশেপাশের রাজা-বাদশাহদের এ ব্যাপারে অবহিত করেন। তাছাড়া সেনাবাহিনীর আস্থা ও আনুগত্যলাভের জন্য তাদের বেতনে সাত লাখ দিনার বৃদ্ধি করেন। সেই যুগের সাধারণ রীতি ছিল, এক বাদশাহর মৃত্যুর পর অন্য বাদশাহ্ তার স্থলাভিষিক্ত বলে সেনাবাহিনীকে ইনাম দিয়ে ও বেতন বৃদ্ধি করে তাদেরকে সন্তুষ্ট করা হতো। সুলতান ছিলেন খুবই অল্প বয়সী। তার বয়স আঠার বছরের বেশী ছিল না। আল্‌প আরসালানের মত গুরু-গম্ভীর ব্যক্তিত্বের অধিকারী শাসকের পর একজন স্বল্প বয়সী বালকের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আশংকা ছিল যে, সবখান থেকে সিংহাসনের দাবিদার সৃষ্টি হবে। অধীনস্ত রাষ্ট্রসমূহ বিদ্রোহী হয়ে যাবে এবং বহির্শক্র আক্রমণ করতে দুঃসাহসী হবে। এরূপ নাজুক পরিস্থিতিতে বাদশাহর দেশের দূরবর্তী কোনো এলাকায় অবস্থান সমীচীন নয়। এসব কারণে নিজামুল মুলক তাকে নিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে খুরাসান অভিমুখে রওয়ানা হলেন এবং মাত্র তিন দিনে শিরদরিয়া পার হন। অথচ আল্‌প আরসালানের সাথে ট্রান্স অক্সাইন এলাকায় আসার সময় এ বাহিনী উক্ত নদী পার হতে প্রায় এক মাস সময় লাগিয়েছিলো। খুরাসানে পৌঁছে তিনি শাহজাদা আয়াযকে বলখে রেখে গেলেন এবং নিজে নিশাপুর হয়ে রায় অভিমুখে যাত্রা করলেন।

খানে সমরখন্দের বিদ্রোহ

মালেক শাহ্ বিদায় হওয়া মাত্র খানে সমরখন্দ ইলতগীন বিদ্রোহ করে বসেন এবং ৪৬৫ হিজরীর রবিউস সানী মাসের প্রথম দিকে তিনি অগ্রসর হয়ে তিরমিয অধিকার করে নেন। যুবক শাহজাদা আয়ায দশ হাজার সৈন্য নিয়ে

তার মোকাবিলা করেন, কিন্তু পরাজিত হন এবং শিরদরিয়ায় তার বহু সৈন্য খুইয়ে বলখে ফিরে আসেন।[১]

গজনবীদের বিদ্রোহ

জমাদিউল আউয়াল মাসে গজনবীরা তুখারিস্তানের ওপর হামলা চালিয়ে সাকলাকান্দার দখল করে নেয়।[২] আমীরুল উমারা উপাধিতে ভূষিত মালেক শাহের চাচা আমীর উসমান তাদের হাতে বন্দী হন। তারা তাকে তার সকল অর্থ-সম্পদ ও সাজ-সরঞ্জামসহ গজনীতে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু এর পরপরই উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন আমীরদের অন্যতম আমীর গুমুশতগীন মালকা বেগ তুখারিস্তান পৌঁছেন এবং গজনীর ঐসব এলাকা পুনরুদ্ধার করেন।[৩]

কাওয়ার্দ বেগের বিদ্রোহ ও তার মূলোৎপাটন

ওদিকে ফারেস ও কিরমানের শাসক কাওয়ার্দ বেগ[৪] তার ভাই সুলতানের মৃত্যুর খবর শোনার পর ভাতিজার মোকাবিলায় তার মনে সালতানাতলাভের লোভ সৃষ্টি হয়। তাই সে মালেক শাহের আগেই রায় পৌঁছার জন্য যাত্রা করে। কিন্তু মালেক শাহ ও নিজামুল মুলক তার পূর্বেই রায়-এ উপনীত হন এবং সেখান থেকে একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে তার মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হন। শা'বানের ৪ তারিখে হামদানের নিকটস্থ কুরজ[৫] নামকস্থানে যুদ্ধ হয়।[৬] মালেক শাহের তুর্কী সৈন্যদের বেশীর ভাগ কাওয়ার্দের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। ফলে কিরমানী সৈন্যদের প্রথম আক্রমণেই তার বাহিনীর দক্ষিণ বাহু পরাজিত হয়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আরব ও কুর্দীদের একটি শক্তিশালী বাহিনী শারফুদ্দৌলা মুসলিম ইবনে কুরাইশ এবং বাহাউদ্দৌলা মনসূর ইবনে দুবাইস ইবনে মাযিয়াদের নেতৃত্বে এসে মালেক শাহের সাথে যোগ দিয়েছিলো। তারা বাম বাহুতে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করে এবং কাওয়ার্দের দক্ষিণ বাহুকে

---

১. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩১, ৩২।

২. তুখারিস্তানের জনবহুল ও শস্য-শ্যামল একটি জেলা।-(মু'জামুল বুলদান, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৮)

৩. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২।

৪. তার নামের ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইবনে আসীর লিখেছেন কাওয়ার্ত এবং আবুল ফিদা কারূত। কিন্তু ইমাদ কাতেব মুসতাওফী ইবনুর রাওয়ানদী, ইবনে ইবরাহীম ও মীরখোন্দ লিখেছেন কাওয়ার্দ।

৫. এ স্থানটি হামদান ও ইস্পাহানের মাঝে অবস্থিত। এর দূরত্ব হামদান থেকে ৩০ ক্রোশ এবং ইস্পাহান থেকে ৫২ ক্রোশ (ইয়াকূত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩০) মীরখোন্দ ভুলক্রমে স্থানটির নাম কার্খ বলে উল্লেখ করেছেন।

৬. ইবনে আসীর, ইবনে খাল্লিকান, ইমাদ কাতেব ও আবুল ফিদা যুদ্ধ ক্ষেত্রের নামই উল্লেখ করেননি এবং শুধু বলেছেন যে, হামদানের নিকটে যুদ্ধ হয়েছিলো। কিন্তু ইবনুর রাওয়ানদী, হামদাল্লাহ মুসতাওফী ও মীরখোন্দ সুস্পষ্টভাবে যুদ্ধ ক্ষেত্রের নাম উল্লেখ করেছেন।

www.bjilibrary.com

তছনছ করে পরাজিত করে। নবাগতদের এ সাফল্য মালেক শাহের সৈন্যরা মোটেই সুনজরে দেখলো না। তারা শারফুদ্দৌলা ও বাহাউদ্দৌলার শিবিরে হামলা চালিয়ে সেখানে লুটপাট করলো। কিন্তু তাদের ক্রোধ ও বিদ্বেষ নিষ্ফল প্রমাণিত হলো। তারা না চাইলেও কাওয়ার্দ পরাজিত হলো এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলো। পরে তাকে তার পুত্রসহ নিকটবর্তী একটি গ্রাম থেকে পাকড়াও করা হয়। সে মালেক শাহের সামনে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং নিজের নির্দোষিতার সপক্ষে রাজকীয় সেনাবাহিনীর অফিসারদের লিখিত একগাদা পত্র তার সামনে পেশ করে। ঐসব পত্রে তারা তাকে নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতার নিশ্চয়তা প্রদান এবং হামলা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলো। মালেক শাহ চিঠিগুলো উচ্চস্বরে পাঠ করার জন্য নিজামুল মুলককে দিলেন। সম্ভবত তার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যেসব উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এই বিশ্বাসঘাতকতার সাথে জড়িত ছিল নিজের লেখা পত্র দ্বারা তাদের স্বীকৃতি আদায় করে কঠিন শাস্তি দেয়া। কিন্তু উযীর নিজামুল মুলক ভাবলেন যে, এ কাজ করলে সালতানাতের বড় বড় কর্তাদেরকে এ বিশ্বাসঘাতকতার সাথে জড়িত পাওয়া যাবে এবং তার অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর অনিবার্যরূপে দু'টি ক্ষতির একটি বরদাশত করতে হবে। অর্থাৎ হয় তাদের সবাইকে হত্যা করতে হবে—যে ক্ষেত্রে সালাতানাত তার দক্ষ ও সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গের থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে, নয়তো তাদের অপরাধ উপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তারা সদাসর্বদা ষড়যন্ত্র ও যোগসাজশে লেগে থাকতে সাহস পাবে। তাই তিনি বিষয়টি গোপন রাখাই যথোপযুক্ত মনে করলেন এবং বাদশাহর সামনেই পত্রগুলো আতশদানের মধ্যে নিপেক্ষ করলেন।[১] কিন্তু কাওয়ার্দতো তখনো জীবিত ছিল। রাজকীয় বাহিনীতে তার সমর্থক পুরোপুরি দমিত হয়নি। তারা এবার ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করলো এবং নিজামুল মুলকের কাছে দাবি করতে থাকলো যে, তাদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। শেষ পর্যন্ত এ বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য বাদশাহর নির্দেশে কাওয়ার্দকে বন্দীশালায়ই হত্যা করা হলো এবং তার দুই পুত্র আমীরান শাহ ও কিরমানকে চোখ ফুঁড়ে দেয়া হলো। এ খবর শুনে সেনাবাহিনী হতবাক হয়ে যায় এবং তারা বাকশক্তিও হারিয়ে ফেলে।[২]

নিজামুল মুলকের ক্ষমতা বৃদ্ধি

এ বিজয় মালেক শাহের রাজত্বকে বিপদমুক্ত করে দেয়। কিন্তু দেশের ব্যবস্থাপনায় তখনো বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান ছিল এবং বিশৃঙ্খলা প্রিয় সৈন্যরা আরো

১. এ ঘটনার বর্ণনাকারী ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান।

২. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২; যুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-৪৮; ইবনে খাল্লিকান, মালেক শাহের জীবন বৃত্তান্ত, 'মীম' বর্ণ। কিরমানের সালজুকদের ইতিহাস। কৃত মুহাম্মাদ ইবরাহীম, পৃষ্ঠা-১৩; আবুল ফিদা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৯; রাহাতুস সুদূর, পৃষ্ঠা-১২৬, ১২৭; তারিখে গুযীদা, পৃষ্ঠা-৪৪৩; রাওদাতুস সাফা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০১।

www.bjilibrary.com

বৃদ্ধি করেছিলো। কারণ, এখন তারা কাওয়ার্দের ব্যাপারে তাদের ব্যর্থতার জন্য নিরীহ প্রজাকুলকে তাদের ক্রোধের শিকার বানাচ্ছিলো এবং সর্বত্রই তারা একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রেখেছিলো। নিজামুল মুলক মালেক শাহের সামনে গোটা এই উপস্থাপন করে, এভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যে মন্দ প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে—তা বর্ণনা করলেন। মালেক শাহ্ বললেন ঃ আপনিই সবকিছুর দায়িত্বশীল, যেভাবে সঠিক মনে করেন এ বিশৃঙ্খলা দমন করুন। তিনি বললেন ঃ আমি আপনার আদেশ ছাড়া কিছুই করতে পারি না। এতে মালেক শাহ রাষ্ট্রের ছোট বড় সব ব্যাপার তার ওপর ন্যস্ত করলেন এবং তাকে 'আতা বেগ'[১] এর মত মহান উপাধি দান করলেন এবং জায়গীর হিসেবে একটি বিরাট এলাকা দান করলেন। এর এলাকার মধ্যে তার নিজের জন্মভূমি তূসও অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২] যদিও আল্প আরসালানের যুগেও নিজামুল মুলক পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী উযীর ছিলেন কিন্তু এবার তিনি একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে গেলেন এবং নিজের সিদ্ধান্ত অনুসারেই রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর পরিচালনার ক্ষেত্রে সীমাহীন ক্ষমতা লাভ করলেন।

খলীফার দরবার থেকে সালতানাতের পরোয়ানা

এসব অভিযান শেষে মালেক শাহর পক্ষ থেকে সা'দুদ্দৌলা গাওহার আইনকে বাগদাদ প্রেরণ করা হয়, যাতে তিনি খলীফার নিকট থেকে নতুন সুলতানের জন্য সালতানাতের পরোয়ানা হাসিল করেন। তিনি ৪৬৬ হিজরীর সফর মাসে বাগদাদ পৌছেন। তার সম্মানে দরবারে আম ডাকা হয়। এ দরবার দেখার জন্য বাগদাদের আপামর জনসাধারণ যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে। খলীফা নিজে খিলাফতের আসনে বসেন। খিলাফতের উত্তরাধিকারী 'উদাতুদ্ দীন আল মুক্তাদী বি আমরিল্লাহ্ তার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হন। সালতানাতের ফরমানের প্রাথমিক অংশ পাঠ করে শোনান খলীফার উযীর। অতপর তা সা'দুদ্দৌলার হাতে সোপর্দ করা হয়। এরপর খলীফা নিজ হাতে সালতানাতের পতাকা তার কাছে অর্পণ করেন।[৩]

তিরমিয অধিকার এবং খানে সমরখন্দের আনুগত্য প্রকাশ

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, মধ্য এশিয়া বা ট্রান্সঅক্সাইন অঞ্চলের সমস্যার সমাধান প্রয়োজন ছিল। মালেক শাহ্ প্রত্যাবর্তন করা মাত্র খানে সমরখন্দ

১. এ উপাধিটি পরবর্তীকালে ব্যাপকতা লাভ করে। কিন্তু তৎকালে তুর্কীদের কাছে এটা ছিল একটা অসাধারণ উপাধি। তুর্কী ভাষায় এর অর্থ আমীর পিতা বা সর্দার পিতা। এমন সব পুরনো বিশ্বস্ত ও মহাসম্মানিত আমীরকে এ খেতাব দেয়া হতো বাদশাহ যাকে তার জন্য পিতার সমতুল্য মনে করতেন।

২. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২, ৩৩; আবুল ফিদা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৯; যুবদা, পৃষ্ঠা-৪৮।

৩. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২, ৩৩; আবুল ফিদা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৯; যুবদা, পৃষ্ঠা-৪৮।

www.bjilibrary.com

সেখানে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিলো এবং আয়াযকে পরাজিত করে তিরমিয দখল করে নিয়েছিলো। এ কারণে সালতানাতের কেন্দ্র থেকে নিশ্চিত হওয়ার সাথে সাথে মালেক শাহের উযীর সেদিকে দৃষ্টি দেন এবং তিরমিয অবরোধ করেন। শাহী ফৌজ শহর রক্ষা খাল ভরাট করে ফেলে এবং মিনজানিকের সাহায্যে এত প্রবলভাবে পাথর বর্ষণ করে যে, অবরুদ্ধ সৈন্যরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। দুর্গের অধিকর্তা ও সেনাবাহিনীর অধিনায়ক খানের ভাই নিজে সন্ধি ও নিরাপত্তার প্রস্তাব নিয়ে বাইরে আসে। সুলতান সম্মান ও মর্যাদার সাথে তাকে স্বাগত জানান, তাকে নিরাপত্তা ও খিলাত প্রদান করেন এবং শহরকে আমীর মাদতগীনে সোপর্দ করে নতুন করে নিরাপত্তা জোরদার করান। এরপর তিনি সমরখন্দ অভিমুখে যাত্রা করেন। এবার আর খানের প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল না। তিনি তার রাজধানী পরিত্যাগ করে চলে যান, সুলতানের কাছে আপোষের প্রস্তাব প্রেরণ করেন এবং নিজামুল মুলকের কাছে এ মর্মে প্রার্থনা করেন যে, তিনি যেন মধ্যস্থতা করে ক্ষমা মঞ্জুর করার ব্যবস্থা করেন। তার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয় এবং তার সাথে সন্ধি করে মালেক শাহ রায় প্রত্যাবর্তন করেন।[১] ৪৬৬ হিজরীতে এসব ঘটনা সংঘটিত হয়।

এ বছরেই সুলতানের ভাই আয়ায ইনতিকাল করেন। তার স্থানে বলখ ও তুখারিস্তানের শাসন ক্ষমতা দেয়া হয় আল্‌প আরসালানের এক পুত্র আমীর শিহাবুদ্দীন তাকেশকে।[২]

দামেশক বিজয়

আল্‌প আরসালানের জীবদ্দশায়ই শাম ও ফিলিস্তিনের একটি বড় অংশ মিসরের ফাতেমীয় সালতানাতের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিলো এবং শুধু দামেশকই তাদের দখলে অবশিষ্ট ছিল যা ৪৬৩ হিজরীতে এক দীর্ঘ অবরোধের পরও দখল করা সম্ভব হয়নি। ৪৬৭ হিজরীর (১০৭৫ খৃষ্টাব্দ) রমযান মাসে মালেক আতসিজ[৩] পুনরায় এর ওপর আক্রমণ করে এবং এক মাস কাল অবরুদ্ধ করে রাখার পর পিছু হটে আসেন। কিন্তু এর পর পর দামেশকে বিশৃঙ্খলা ও দুর্ভিক্ষ ব্যাপকভাবে শুরু হয়। ফাতেমীয়দের দুশ্চরিত্র গভর্নর মু'আল্লা বিন হায়দারাকে শহরবাসীরা বহিষ্কার করে। একদিকে মাছমুদী

১. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৮।

২. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৮; যুবদার লেখক শুধুমাত্র আয়াযের ইনতিকালের ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু তার স্থানে কাকে শাসন ক্ষমতা দেয়া হয়েছিলো তা লিপিবদ্ধ করেননি।-(যুবদা, পৃষ্ঠা-৪৯)

৩. ইবনে আসীর তার নাম আতসিজ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেন যে, তার প্রকৃত নাম ছিল আতসিজ যা বিকৃত করে শামবাসীরা আকসিস বানিয়ে দেয়। আবুল ফিদাও এর নাম আতসিজ বলেছেন।

www.bjilibrary.com

ও শহরের উঠতি ভাগ্যবানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, অপর দিকে ফসল উৎপাদন খারাপ হওয়ায় দামেশক ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মানুষের জীবন ধারণ কঠিন হয়ে ওঠে। এসব সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ৪৬৮ হিজরীর শা'বান মাসে আতসিজ তৃতীয়বারের মত দামেশকের ওপর আক্রমণ করেন এবং দীর্ঘ সময় অবরোধের পর ফাতেমীয় গভর্নর ইনতিসার ইবনে ইয়াহইয়া আল মাছমুদী বানিয়াস দুর্গ ও জাফা শহরের বিনিময়ে শহর তার হাতে তুলে দেয়। ২৫শে যিলকা'দাহ্ দামেশকের জামে মসজিদে আব্বাসীয় খলীফা আল মুকতাদী বিআমরিল্লাহর[১] নামে খুতবা পাঠ করা হয় এবং মিসরের খলীফার নামে খুতবা পাঠ বন্ধ হয়ে যায়।[২]

মিসরের ওপর ব্যর্থ আক্রমণ

পরবর্তী বছর ৪৬৯ হিজরীতে আতসিজ অগ্রসর হয়ে মিসরের ওপর আক্রমণ করেন এবং কায়রো পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে যান। ঐ সময় ফাতেমীয় সালতানাত বিশৃঙ্খলার শিকার ছিল। সবেমাত্র সরকার সাত বছর ব্যাপী দুর্ভিক্ষের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলো এবং সেনা অধিনায়ক বদর 'জামালী নতুন করে এর সবকিছু শৃঙ্খলাবদ্ধ করছিলেন। এ পরিস্থিতিতে আতসিজের বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করা মিসরীয়দের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আক্রমণকারীরা নিজের হাতে এমন একটি শক্তি সৃষ্টি করে দেয় যা মিসরীয়দের পক্ষ থেকে তাদের মোকাবিলা করে এবং তাদের পরাজিত করে তাড়িয়ে দেয়। তারা কায়রোর সামনে তাঁবু স্থাপনের পর যখন দেখলো যে, দেশের লোকেরা দুর্বলা ও উদ্দীপনাহীন তখন সামরিক নিয়ম-শৃঙ্খলা ভংগ করে লুটপাটের জন্য আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে এবং এমনভাবে যুলুম-নির্যাতন করতে থাকে যে, গোটা দেশবাসীই তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। আশেপাশের জমিদার ও প্রভাবশালী লোকেরা ফাতেমীয় খলীফা আল-মুসতানসির বিল্লাহর কাছে গিয়ে অভিযোগ করে। কিন্তু তিনি এই বলে তার অক্ষমতা প্রকাশ করেন যে, তাদের মোকাবিলা করার মত শক্তি তার নেই। তারা বললো ঃ আমরা আপনাকে সৈন্য দিচ্ছি। একদিকে আপনি আতসিজের ওপর আক্রমণ করুন তার কাছে বর্তমানে খুব কম সংখ্যক সেনা আছে। অন্যদিকে আমরা তার বিক্ষিপ্ত সৈন্যদের ওপর একযোগে আক্রমণ করবো যারা এখন গ্রামে-গঞ্জে লুটপাট চালিয়ে যাচ্ছে। অতএব, এই কৌশলই অবলম্বন করা হলো। আর এই দ্বিমাত্রিক হামলায় পরাভূত হয়ে আতসিজ বিধ্বস্ত হয়ে এমনভাবে পলায়ন করলো যে,

১. তিনি ৪৬৭ হিজরীতে তার দাদা আল কায়েম বি আমরিল্লাহর স্থলে খলীফা হন।
২. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪১, আবুল ফিদা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯২।

www.bjilibrary.com

তার সৈন্যদের বেশীর ভাগই নিহত কিংবা বন্দী হলো। তার এক ভাইও নিহত হলো এবং অন্যরা মারাত্মকভাবে আহত হলো।[১]

এই ধ্বংসাত্মক ও নিবুর্দ্ধিতামূলক কাজকর্ম আতসিজের অযোগ্যতা প্রমাণ করে দেয়। এর ফল দাঁড়ায় এই যে, ইতিপূর্বে যে মিসরীয়রা দেশ রক্ষা করার যোগ্য ছিল না তাদের মধ্যে এখন সালজুকদের থেকে শাম পুনরুদ্দার করার সাহস ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। সুতরাং তারা ৪৭০ হিজরীতে আক্রমণ চালিয়ে আতসিজকে দামেশকে অবরুদ্ধ করে ফেলে। অপরদিকে মালেক শাহ যখন তার গভর্নরের এসব ভুল-ক্রটি সম্পর্কে অবহিত হন তখন তিনি আতসিজকে পদচ্যুত করে নিজের ভাই তাজুদ্দৌলা তুতুশ বিন আল্‌প আরসালানকে[২] এই ফরমান দিয়ে শামের গভর্নর নিয়োগ করে পাঠান যে, শাম ছাড়াও আরো যেসব অঞ্চল তিনি অধিকার করবেন তা সবই তার শাসনাধীন হবে। তিনি দামেশক পৌঁছামাত্র মিসরীয় সৈন্য অবরোধ প্রত্যাহার করে ফিরে যান। তিনি দামেশকে অধিকার করেন (৪৭১ হিজরী) এবং আতসিজকে কঠোর জবাবদিহি করতে বাধ্য করেন। কিন্তু সন্তোষজনক কোনো জবাব দিতে না পারায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।[৩]

তাকেশের বিদ্রোহ

৪৭৩ হিজরীর শা'বান মাসে মালেক শাহ কিরমান প্রভৃতি প্রদেশ সফর ব্যাপদেশে এখানে আসেন এবং সেনাবাহিনী পর্যবেক্ষণের পর জনশক্তি ৭ হাজার হ্রাস করার নির্দেশ দেন। এরা ছিল তার মতে দুর্বল সৈনিক। নিজামুল মুলক তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, এরা শিক্ষিত কিংবা ব্যবসায়ী বা দর্জি নয়, এদের অন্য কোনো পেশা নেই। এরা শুধু সৈনিক। আমরা যদি তাদেরকে ছাঁটাই করি তাহলে এরা অন্য কোনো রাজা বা বাদশাহর সমর্থক হয়ে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ও তৎপর হয়ে ওঠা অসম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে আমাদেরকে আলাদা একটা ঝামেলায় পড়তে হবে এবং আমরা বর্তমানে তাদের জন্য যে অর্থ ব্যয় করছি, সে ক্ষেত্রে হয়তো তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী ব্যয় করতে হবে। সুলতান তার উযীরের এই জ্ঞানগর্ভ পরামর্শ

---

১. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪১ ও ৪৩; আবুল ফিদা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯২; এ ঘটনা সম্পর্কে ইবনে আসীর ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা উপস্থাপন করেছেন এবং আবুল ফিদা সংক্ষেপে দু'টি পরস্পর বিরোধী বর্ণনা উদ্বৃত করেছেন। এসব বর্ণনা সামনে রেখে আমি ঘটনার সর্বাধিক যুক্তিসংগত রূপটিই গ্রহণ করেছি।

২. এ ব্যক্তিই সিরিয়ায় সালজুক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। আবুল ফিদা তার নাম তুনুশ বলে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু ইবনে আসীর, ইমাদ কাতেব, ইবনুর রাওয়ান্দী ও হামদাল্লাহ মুসতাওফী তুতুশ বলে উল্লেখ করেছেন।

৩. ইবনে আসীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৫; আবুল ফিদা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯৩, ১৯৪; যুবদাতুন নাসরার লেখকও সংক্ষেপে এ ঘটনার প্রতি ইংগিত দিয়েছেন।-(পৃষ্ঠা-৭১)

www.bjilibrary.com

গ্রহণ করলেন না, বরং তার নিজের নির্দেশ কার্যকরী করলেন। ফল দাঁড়ালো এই যে, সবাই তার ভাই তাকেশের সাথে যোগ দিল। তাদেরকে পেয়ে তার মাথায় বিদ্রোহ করার ও সালতানাত লাভের আকাংখা জেগে উঠলো। সে বুশানাজ থেকে বহির্গত হয়ে খুরাসানের ওপর আক্রমণ করে বসলো এবং মার্ভ আর রুয, মার্ভ আশা শাবজান ও তিরমিয দখল করে খুরাসানের রাজধানী নিশাপুরের দিকে অগ্রসর হলো। সে যদি এ অভিযানে সফল হতো তাহলে নিশ্চিতভাবেই এ বিদ্রোহ ভয়ংকর রূপ ধারণ করতো। কিন্তু মালেক শাহ ঠিক সময় মত পূর্ণ শক্তিসহ সেখানে এসে হাজির হন এবং নিশাপুরকে নিরাপদ করে দ্রুত সামনে অগ্রসর হন। তাকেশ বাধ্য হয়ে পশ্চাদপসারণ করে তিরমিযে আশ্রয় নেয় এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভাইয়ের সাথে সন্ধি করে। কিন্তু এ সন্ধি ছিল সাময়িক। সে অপেক্ষা করতে থাকে যে, মালেক শাহ যখন সালতানাতের দূর-দূরান্তে কোনো এলাকায় সফরে যাবে, তখন সে পুনরায় খুরাসানের ওপর আক্রমণ করবে। অতএব, ৪৭৭ হিজরীতে সুলতান যে সময় আলজাযিরা সফর করছিলেন তখন সে পুনরায় আক্রমণ করে এবং সারাখস পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এবার পরিস্থিতি এমন ছিল যে, সে রায় দখল না করে থেমে থাকতো না। কিন্তু নিজামুল মুলকের বন্ধু আবুল ফুতূহ তূসী একটি রাজনৈতিক চালের মাধ্যমে তাকে এ মর্মে ধোঁকা দেয় যে, মালেক শাহ রায় এ প্রত্যাবর্তন করেছেন। ফলে সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দানাজে ফিরে যায়।[১]

তিন মাস পরে মালেক শাহ ফিরে আসেন এবং ফিরে এসেই তিনি তাকেশকে উৎখাতের সংকল্প করেন। তিনি 'হলফ' করে তাকেশকে বিশ্বাস করান যে, আমি তোমাকে কোনো শাস্তিই দেব না। ফলে সে অনুগত হয়ে তার কাছে চলে আসে। কিন্তু লোকজন পরামর্শ দান করে এখন তাকে স্বাধীনভাবে চলতে দেয়া ঠিক নয়। অবশেষে তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য একটি পন্থা উদ্ভাবন করেন এবং তাকে শাহজাদা আহমদের হাতে সোপর্দ করা হয়। আহমদ ছিলেন মালেক শাহের পুত্র। তিনি তাকে অন্ধ করে বন্দী করেন।২ নিজের বুদ্ধিমান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উযীরের মত গ্রহণ না করে সুলতান এভাবে চার বছর পর্যন্ত দুর্ভোগ পোহাতে থাকেন। উযীরের কথা সত্যে পরিণত হয় যে, ঐসব সৈনিককে বহাল রেখে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে, তাদেরকে ছাঁটাই করার ফলে তার চেয়ে কয়েকগুণ অধিক ব্যয় করতে হবে।

---

১. এটি নাসাফ এলাকায় অবস্থিত একটি দুর্গ।–(ইয়াকূত, বর্ণ, 'দাল')

২. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৮ ও ৫৫; যুবদাতুন নাসরা, পৃষ্ঠা-৭১ ; হামদাল্লাহ মুসতাওফী এ বিদ্রোহের উল্লেখ করেছেন। তবে ভুল সন লিপিবদ্ধ করেছেন। তাকেশ নিশাপুর অবরোধ করেছিলো তার এ বর্ণনাও ভুল।

www.bjilibrary.com

খলীফা ও সুলতানের মধ্যে বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা

৪৭৪ হিজরীর শাওয়াল মাসে সুলতানের কন্যার সাথে খলীফার বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে খলীফার পক্ষ থেকে ফখরুদ্দৌলা আবু নসর ইবনে জাহীরকে ইস্পাহান সুলতানের কাছে পাঠানো হয়। সুলতান তাকে নিজামুল মুলকের সাথে তুরকান খাতুনের কাছে প্রেরণ করেন। তারা উভয়ে তার কাছে খলীফার প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করেন। জবাবে তুরকান খাতুন বলেন ঃ গজনীর বাদশাহ এবং মধ্য এশিয়ার কতিপয় মহিলা তাদের পুত্রের সাথে রাজ কুমারীর বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। তারা চার লাখ দিনারে বিবাহ পূর্ব উপহার দেয়ার প্রস্তাবও দিয়েছেন। খলীফা যদি এ পরিমাণ অর্থ দিতে সম্মত থাকেন, তাহলে তিনিই এ প্রস্তাবের অধিক হকদার। এতে সুলতানের ফুফু আরসালান খাতুন —যার খলীফার সাথে বিয়ে হয়েছিলো—খাতুনকে এ মর্মে বুঝালেন যে, খলীফার খান্দানের সাথে আত্মীয়তায় আমাদের যে মর্যাদা হবে, ঐসব লোকের সাথে আত্মীয়তা সে মর্যাদা নেই। তারা খলীফার সেবক ও দাস। খলীফার সাথে তাদের কোনো তুলনাই হয় না। খলীফার মত ব্যক্তিত্বের কাছে অর্থের প্রশ্ন উত্থাপন উচিত নয়। এতে খাতুন সম্মত হলেন। কিন্তু শর্ত জুড়ে দিলেন যে, মহরানা পঞ্চাশ হাজার দিনার নগদ দিতে হবে। আমার কন্যা ছাড়া খলীফার আর কোন স্ত্রী বা দাসী থাকবে না এবং খলীফা তার শয়নকক্ষ ছাড়া আর কোথাও রাত্রিযাপন করবেন না। তার এসব শর্ত মেনে নেয়া হলো। মালেক শাহ ফখরুদ্দৌলার হাতে হাত মিলিয়ে কথা চূড়ান্ত করলেন এবং ৪৭৫ হিজরীর সফর মাসে ফখরুদ্দৌলা বাগদাদ ফিরে গেলেন।

পাঁচ বছর পর ৪৮০ হিজরীর মুহাররম মাসে কন্যাকে বিদায় দিয়ে রাজধানীতে পাঠিয়ে দেয়া হলো। তার যৌতুকের সামগ্রী ১৩০টি উট, ৭৪০টি খচ্চর ও ৩০টি ঘোড়া বহন করছিলো। উটের পিঠে লটকানো ছিল রোমে প্রস্তুত বুটিদার রেশমি বস্ত্রের বা মখমলের ঝালর এবং তার ওপর চাপানো ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্যের সামগ্রী। তিনটি উটের পিঠে চন্দ্রাতপের নীচে ছিল বসার আসন। খচ্চরগুলো দেশী মখমলের ঝালর, স্বর্ণ রৌপ্যের ঘুঙুর ও মালা দিয়ে সজ্জিত ছিল এবং ছয়টি খচ্চরের পিঠে ছিল মণি-মুক্তা ও অলংকারে ভরা রৌপ্যের সিন্ধুক। ঘোড়ার পিঠে ছিল মূল্যবান মণিমুক্তা খচিত সোনালি জরির কারুকার্যময় জিন। এই বধূযাত্রি দলের অগ্রভাগে ছিলেন সা'দুদ্দৌলা গাওহার আইন ও আমীর বুরসুক প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ। এই শোভাযাত্রা যখন নাহরে মু'আল্লাহ অতিক্রম করে তখন সেখানকার জনগণ দিনার ও মূল্যবান বস্ত্র ছড়িয়ে দেয়। এই বধূযাত্রি দল যখন রাজধানীতে পৌছে তখন খলীফা তার উযীর আবু শূজাকে একটি অতীব সুদৃশ্য ও মহামূল্যবান পালকি এবং তিন শ' মশাল

www.bjilibrary.com

বরদার খাদেমসহ তুরকান খাতুনের কাছে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে হাজির হয়ে সুলতানার কাছে আরজ করেন যে, আমাদের মাওলা আমীরুল মু'মিনীন বলছেনঃ ان الله يامركم ان تودوا الامانات الى اهلها (আল্লাহ আমানতসমূহ তার মালিকের হাতে সোপর্দ করার আদেশ দান করেছেন) জবাবে সুলতানা বলেন ঃ হাঁ, তা শিরধার্য। অতপর কন্যা একটি জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রার সাথে রওয়ানা হন। বিদায়ী অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পূর্বেই মালেক শাহ্ শিকার করার অজুহাতে বাগদাদের বাইরে চলে যান। তার অনুপস্থিতিতে তার পক্ষ থেকে নিজামুল মুলক সকল কাজ আঞ্জাম দেন। বিদায়ী শোভাযাত্রায় তিনি নিজে সালতানাতের গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের সনুখভাগে ছিলেন। প্রত্যেক আমীরের সাথে বহুসংখ্যক শামা' ও মশাল ছিল। তাদের পেছনেই ছিল রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের স্ত্রীদের বহনকারী পালকিসমূহ। তারা প্রত্যেকেই পূর্ণ সাজসজ্জার সাথে খাদেম ও দাসী পরিবেষ্টিত হয়ে মশাল বরদারদের দলের সাথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তার পেছনে মণি-মুক্তা খচিত সোনার পালকিতে ছিল নববধূ, যার চারদিকে দুই শত তুর্কী দাসী বিস্ময়কর ও সুদৃশ্য সওয়ারীতে উপবিষ্ট ছিল। এই শোভাযাত্রা এমনই জমকালো ছিল যে, বাগদাদের অধিবাসীরা বছরের পর বছর তা বিস্মৃত হতে পারেনি। বাসর রাত্রি যাপনের পরদিন খলীফা তুরকান খাতুন ও সকল মহিলাদের জন্য খিলাত প্রেরণ করেন এবং সালতানাতের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে ওয়ালিমার দাওয়াত দেন। এতে সালতানাতের ছোট বড় সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের খাবার পরিবেশন ও খিলাত প্রদান করা হয়। কথিত আছে যে, এই ভোজে শুধুমাত্র চিনিই খরচ হয়েছিলো চল্লিশ হাজার মণ। বাগদাদ নগরী বহুসংখ্যক রাজকীয় বিয়ের অনুষ্ঠান অবলোকন করেছিলো। কিন্তু ইবনে আসীর বলেন যে, এরূপ জাঁকজমকের বিয়ের অনুষ্ঠান একটিও দেখেনি।[১]

বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার রাজনৈতিক ফলাফল

এই বৈবাহিক আত্মীয়তা যতটা আনন্দ-উল্লাসের মধ্যে দিয়ে করা হয়েছিলো এর ফলাফল ততটাই তিক্ত হয়েছিলো। শাহজাদীর গর্ভে খলীফার ঘরে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে যার নাম ছিল আবুল ফযল জা'ফর। এই পুত্রের অস্তিত্ব কিছু অত্যন্ত জটিল রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করে যার ফলে খলীফা ও সুলতানের মধ্যে মতানৈক্যের পরিসর ক্রমেই ব্যাপকতর হয়ে ওঠে এবং পারিবারিক জীবনের ওপর এই রাজনৈতিক মতানৈক্যের প্রভাব পড়ে। খলীফা

১. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৮, ৪৯, ৬৫ ও ৬৬; যুবদা, পৃষ্ঠা-৭২ ও ৭৩; ইবনে খাল্লিকান, মীম বর্ণ, মালেক শাহের জীবন বৃত্তান্ত, রাওদাতুস সাফা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৯, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০২।

www.bjilibrary.com

ও শাহজাদীর সম্পর্ক দিনে দিনে খারাপ হতে থাকে। এমনকি শাহজাদী শেষ পর্যন্ত তার পিতার কাছে খলীফার অবহেলার অভিযোগ উত্থাপন করেন। অবশেষে ৪৮২ হিজরীর রবিউল আউয়াল শাসক পিতা তার কন্যাকে শশুরালয় থেকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসেন এবং ইস্পাহানে আসার পর ঐ বছর যিলকা'দা মাসে তার ইনতিকাল হয়।[১]

এতদিন যে বিরোধ প্রচ্ছন্ন ছিল এখন তার প্রকাশ পেতে থাকে। এমনকি তুর্কী এলাকায় সুলতানের বিজয়সমূহের যে সুখবর বাগদাদ এসে পৌছলে খলীফার উযীর আবু সুজা সে সম্পর্কে ভরা দরবারে মন্তব্য করেন যে, তাতে এমন কি সুখবর আছে? এটা রোম সাম্রাজ্য অধিকার করা যে, আমরা তাতে খুশী হবো? অবশেষে ৪৮৪ হিজরীতে খলীফা ও সুলতানের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়। প্রথমে সুলতানের পক্ষ থেকে কঠোরভাবে খলীফার উযীর আবু সুজার পদচ্যুতি দাবি করা হয় যা কার্যকরী করতে খলীফা বাধ্য হন।[২] এরপর সুলতান মালেক শাহ দাবি করেন যে, খলীফা যেন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র আল মুসতায্হির বি আমরিল্লাহর উত্তরাধিকারিত্ব বাতিল করে তার দৌহিত্র আবুল ফযল জা'ফরকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু খলীফার পক্ষ থেকে তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হলো। ওদিক থেকে পীড়াপীড়ি চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ঘটনা এতদূর গড়ায় যে, সুলতান মুকতাদীকে বাগদাদ থেকে বহিষ্কার করার সংকল্প করেন এবং তাকে জানিয়ে দেন যে, বাগদাদ জা'ফরের হাতে তুলে দিয়ে বসরা, দামেশক কিংবা হিজাযের কোনো জায়গায় চলে যাও। কিন্তু এ ঘটনা বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌছার পূর্বেই সুলতানের ইনতিকাল হয় এবং খলীফা ও সুলতানের মধ্যে সংঘাতের উপক্রম হয়েও তা আর হয়নি। পরে লোকজন এ ঘটনাকে খলীফার 'কারামত' বলে মনে করতে থাকে এবং এ কাহিনী প্রচার পায় যে, সুলতান খলীফার বদদোয়ার শিকার হয়েছেন।

সমাপ্ত

১. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭২; রাওদাতুস সাফা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৬, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০২।
২. ইবনে আসীর, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭২, রাওদাতুস সাফা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৬, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০২।

www.bjilibrary.com

সিরিয়া
রোম
(এশিয়া মাইনর)
কাইসারিয়া
ইনতিকিয়া
আল জাযিরা
তাকরীত
পারস্য
শিরাজ
কিরমান
শাকস্থান
কান্দাহার
কাবুল
বামিয়ান
গজনী
সিন্ধু নদ